আনন্দনিকেতন

শিশির সেন

আনন্দ পাবলিশার্স ॥ কলকাতা • ১২

আনন্দনিকেতন

(উপন্যাস)

প্রেমের - সঙ্গে সমাজকল্যাণবোধ এবং রঙের
সঙ্গে মঙ্গল এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু

প্রথম প্রকাশ : ২০শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, দোল-পূর্ণিমা,
(ইং ১৩ই মার্চ, ১৯৬০)

চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রচ্ছদপট অঙ্কন : গণেশ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে এস, সেন কর্তৃক প্রকাশিত ও শশী প্রেস, ১৬ মার্কাস
লেন, কলিকাতা-৭ হইতে জে, কে, কর কর্তৃক মুদ্রিত।

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক

—লেখক

আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি ॥ উপনিষদ্ ॥

‘যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার
আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ’

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"'বই লিখে মানুষকে কি কথা শোনাতে চাও, জানাতে চাও? শুধু কি সৌন্দর্য সৃষ্টি, আর্টের খাতিরে আর্ট—না জনসমাজেরও কিছু কল্যাণ করতে চাও?

'সুন্দরের সৃষ্টি করতে গিয়ে বৃহত্তর সমাজকল্যাণের কথা উপেক্ষা করা চলে না। চিরন্তনকে নতুনরূপে প্রকাশ করাই নবীনত্ব। চিরন্তনকে আমিত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করাই সাহিত্য সৃষ্টি।

'নতুন মানুষ তৈরী করবার দায় সাহিত্যিকের। তাঁরাই দেবে পথনির্দেশ"

এ পুস্তক সে দাবী রাখে।

সকলের চোখে দেখা পৃথিবীটার কথাই আবার নতুন করে ভাবছিলাম আমার একান্ত নিজস্ব বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে। কত লোকই কত কিছু ভেবে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত রেখে গেলেন লিপির আঁচড়ে তাঁদের অনুভূতি ও চিন্তাধারার স্বাক্ষর।

অতীতের জ্ঞানী ও গুণীকে আমরা বিচার করি তাঁদের কর্ম দিয়ে। কর্মের পরিচয় পাই কতকগুলো সাজান আক্ষরিক শব্দবিন্যাসে। শোনা কথার পরিচয় কখনও দীর্ঘ হয় না। তাদের আয়ু বড় কম।

যাঁরা সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবন এমনি স্বল্পায়ু। কারণ তাঁদের কর্মের কোন লিপিবদ্ধ পরিচয় নেই এবং সেজন্য নামহীন সমাজ জীবনের পরিচয় অতি সহজেই তলিয়ে যায়। আমাদের সাধারণ পারিপার্শ্বিক জীবনে এ-ধরনের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যাই বেশি। আপামর জনসাধারণ জাতশিল্পী হলে ইতিহাসের বড় বিড়ম্বনা।

আমরা হয়ত অনেক সময় একই কথা শুনি বিভিন্ন শিল্পীর কাছ থেকে বহুদিন ধরে—শুধু ঢং-টি তাঁদের বিভিন্ন, ঢং অর্থাৎ টেকনিক বা বলবার কলাকৌশল। কিন্তু বিষয়বস্তু গৌণ হলেও গৌণ নয়। ঢং যদি শিল্পের সৌন্দর্য বাড়ায়—বিষয়-বস্তু তবে বিস্তার করবে প্রভাব। তাহলে তর্ক উঠতে পারে ঢং-কে বেশি ভালবাসব, না বিষয়বস্তুকে ভালবাসব? মাত্রা রেখে দুটোই চাই—তবেই শিল্প পাবে প্রাণ।

আরও সহজ হবে নারীপুরুষের সম্বন্ধবোধ বিচারের দৃষ্টিতে দেখলে। পুরুষ বড়, না নারী বড়? পুরুষ বা নারীর একত্র সম্মিলন না হলে যেমন সংসার গড়ে

উঠতে পারে না—ঠিক তেমনি টেকনিক বা বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু মিলন না ঘটলে শিল্পের প্রাণধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়। রসের জন্য যেমন চাই নারী ও পুরুষকে—শিল্প-সৃষ্টির জন্য তেমনি চাই টেকনিক আর বিষয়বস্তুকে। তবেই শিল্প হবে রসশিল্প। কোন স্থায়ী কাজেই হাত দেওয়া হয়নি।

সময় চলেছে হাওয়ায় উড়ে। স্বাস্থ্য আর আলস্য দুটোই আর চলতে পারে না। যদি বা স্বাস্থ্য আর আলস্যকে উপেক্ষা করে পথ চলতে চাই অমনি টুঁটি চেপে ধরে আমার সমাজ, পরিবেশ ও কর্তব্যবোধ।

সময় সময় মনে হয় প্রতিভার কণ্ঠরোধ করে তীক্ষ্ণ কর্তব্যবোধ। সন্দেহ নেই এটা আক্ষেপের উক্তি, দুর্বলের উক্তি। যিনি সবল, যাঁর ভিতর সত্যিকারের পদার্থ আছে—তিনি তুচ্ছ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অতি অনায়াসে নিজের সত্যিকারের রাজপথ তৈরী করে নিতে পারেন। অপটু যাঁরা, ওজর আপত্তি তাঁদেরই একচেটে।

নতুন কথা কি বলতে চাই, কি নতুন আলো জ্বালতে চাই—তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে সেইটেই প্রশ্ন।

নরনারীর সম্বন্ধবোধ?

সমাজে যেন এরই বিচার হয় নি। যেটুকু বিচার হয়েছে তা-ও যেন এক তরফা।

জ্ঞানী, গুণী ও বিদগ্ধজন এ-পৃথিবীতে দুর্লভ নয়। তাঁদের কাছ থেকে অনেক জেনেছি, শুনেছি—কিন্তু নরনারীর সঠিক সম্বন্ধের শেষ রায় যেন আজও পাইনি। আজও এর নিত্য-নতুন সত্যের সংজ্ঞা পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন পদ্ধতিতে বিচার চলেছে, পরীক্ষা চলেছে। তার সীমা কতটুকু, পরিধি কতটুকু?

মানুষ ক্রমশঃ বস্তুতান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। আকাশের চাঁদ নিয়ে আর তার বিলাস করতে মন চায় না। সংস্কৃতির পটভূমিকা নেই বলেই মানুষের প্রতি মানুষের এত অবিশ্বাস এবং স্বার্থসংঘাত।

কোন্ আনন্দলোককে কেন্দ্র করে আমরা ঘুরছি। কি চাই আমাদের তাই যেন হারিয়ে ফেলেছি। আছে শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাস।

চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, অকারণ নাম-না-জানা বেদনা আর চলবে না……তবু মানুষ এর প্রভাব অস্বীকার করতে পারলে কোথায়?

পৃথিবীটাকে নতুন ছাঁচে দেখতে চাই। আর্ট আর টেকনিক-কে বাঁচাতে গিয়ে লেখক যেন নিজে অনেক কথাই বলতে পারেন না। এ-দুটো যেন শিল্পের নাগপাশ।

এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কার জন্য মনের সমৃদ্ধ চিন্তাধারার স্বাক্ষর রেখে যেতে চাই? পৃথিবীর মানুষ যদি আজ আমাকে কিছুটা মান-মর্যাদা দেয়-ই কিন্তু কালের প্রভাবে একদিন আমাকে সবাই ভুলে যাবে। মহাকালের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হতেই হবে একদিন। মৃত্যুকে মানুষ আজও আবিষ্কার করতে পারে নি। রিসার্চ—এ্যান্টিরিসার্চের মহারথীগণ সূক্ষ্ম পরমাণুতত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা চালিয়েছেন। এই মানুষই আবার মেরু অভিযানের দুর্গমতার দিকে ভ্রূকুটি হেনে নিঃসংকোচে পথ এগিয়ে গেছেন। বেবী মুন বা খোকা চাঁদ আকাশে তুলে মানুষকে মানুষ আবার বিভ্রান্ত করেছে। তা' নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা। মঙ্গল গ্রহের দেশে ঘর বাঁধবে বলে সংবাদ-পত্র মারফৎ জমি সংগ্রহের আর্জি পেশ করেছেন। নতুনত্ব আর চমক দিয়ে মানুষ মানুষকে সেই আদিম কাল হতে হাতছানি দিয়েছে। কিন্তু মৃত্যু? মৃত্যু সম্বন্ধে কে গবেষণা করেছেন? পৃথিবীর এ-পারের সঙ্গে ও-পারের বৈজ্ঞানিক নির্ভরযোগ্য সেতু যে আজও তৈরী হলো না। অলৌকিক বা আধিভৌতিক বইগুলোর কথা ভুলে যান। সেই চিরকেলে প্রহেলিকা আজও রহস্যময় কুহেলিকায় আবৃত। ক'দিনই বা মানুষ বাঁচে, তারই মধ্যে তার দম্ভ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, আত্মপ্রকাশ……তারপর সবশেষ……এই তো জীবন….

ছেলেবেলা থেকেই আমি কিছুটা কল্পনাবিলাসী। কিন্তু তাই বলে মোটেও অসংযমী নই। দূরদৃষ্টি আমার আছে। বর্তমানের শৈথিল্য যে আগামীদিনের পথ সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে না সেকথা আমি জানি। তবু রক্তমাংসের মানুষ, সময় সময় দুর্বলতা এসে বাধা দেয় বৈ কি!

আমি বুঝতে চেয়েছিলাম জীবনকে।

সেজন্য আমার ষ্টাডি হচ্ছে জীবন!

মনুষ্যজীবন কী গভীর রহস্যে ভরা!

কত বিচিত্র, কত অপূর্ব, কত সুন্দর!

সংসারে এসে কি শুধু নীরস ও শুষ্ক কর্তব্যবোধ অথবা গ্লানিকর জীবন যাপন এবং ষাট, সত্তর বা আশিটি শীতের সাক্ষাৎ করেই পরিসমাপ্তি

ঘটাব, না অন্য কিছুও করব! স্থায়ী কাজ চাই। ইংরেজীতে যাকে বলে প্রডাকটিভ্ ওয়ার্ক। মানুষ বাঁচতে চায়। সাধারণ মানুষ বাঁচতে চায় সন্তানসন্ততির ভিতর দিয়ে—কিন্তু যাঁরা আরও প্রগতিশীল তাঁরা বাঁচতে চায় কর্মের ব্যাপ্তিতে ; আনন্দলোকের সৃজনী প্রতিভায়।

বর্তমানের সংগ্রামশীল জীবনে সবকিছু নির্ভর করে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে। অর্থনৈতিক সাম্য না এলে জীবনে কোন কিছু বড় জিনিস গড়ে উঠতে পারে না। ললিতকলা বল, শিল্প বল, সাংস্কৃতিক আবহাওয়া বল, কোন কিছুই গড়ে উঠতে পারে না। জীবনের মানদণ্ড এত নীচুতে আর বর্তমানের মধ্যবিত্তের বিত্ত এত স্বল্প যে জীবনের বড় কিছু কল্পনা দানা বাঁধতে প্রতিপদে সে বাঁধা পায়।

হাতী-ঘোড়া কী করব জানা নেই। সমষ্টির জীবনকে সহজ সুন্দর করে গড়ে তুলবার একটা দুর্লভ প্রচেষ্টা মনের কোনে উঁকি দেয়। উত্তরকালে যা রাজনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও দলগত রেশারেশির রূপ নেয়, তার মূলে আছে এই জনকল্যাণ ব্রত। কিন্তু কুরুচি ও দৈন্যের তুলনা নেই। সুন্দরকে সুন্দরতর করে তুলবার ব্রত বানচাল হয়ে পড়ে। আমাদের জাতির ঘুণ ধরেছে এইখানে।

আমরা অনেকেই অনেক সময় বড় বড কথা বলি, বক্তৃতা করি। ড্রয়িং রুম বা চায়ের টেবিলে সাংস্কৃতিক বুলি কপচাই। কিন্তু আমাদের বাড়িতে চল। লক্ষ্য করবে আমাদের জীবনযাত্রা। দেখতে পাবে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ছেড়ে আমরা এক পা-ও এগোই নি। বিজ্ঞানের বিষয়ে এম, এস-সি-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে বসে হাত দেখাতে বসি। চন্দ্রগ্রহণ লাগলে খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম হতে বিরত হই। ঘরের পরিচয় আমাদের এই। আর বাইরের জীবনের কথা যদি ধর অর্থাৎ রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনের কথা বলছি। সেখানে আছে দলাদলি, মারামারি, কাটাকাটি আর অহেতুক স্বার্থসংঘাত। তুমি যদি হঠাৎ কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়ে পড়, তবে তোমার লক্ষ্য থাকবে কি করে তুমি তোমার ব্যক্তিগত তহবিল গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়তে পার। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে-ওতঃপ্রোতভাবে যে জনকল্যাণ বোধ জড়িত তা' চাপা পড়ে যাবে। এই আমাদের পরিচয়।

জীবন নিয়ে পরীক্ষা সহজ কথা নয়। লেখনী চালিয়েই আমাকে সেই পরীক্ষায় অগ্রসর হতে হবে। কারণ লেখনী ছাড়া আর আমার কোন মূলধন নেই।

তথাকথিত ছাত্রজীবনে ছাত্র হিসেবেও মাঝারি মেধার ছাত্র বলে গণ্য হলাম। আর অর্থনৈতিক কাঠামোতে আগে থেকেই মধ্যবিত্ত ছিলাম। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মার খায় মধ্যবিত্ত। সেই মধ্যবিত্ত মাধ্যমিক বৃত্তিরই প্রহসন সুরু হলো জীবনে।

যে দরজা দিয়েই প্রবেশের আবেদন জানাই না কেন, শক্তিশেলের মত নির্মম আঘাত আসে। সময় সময় নিজের কর্মক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের উপর সন্দিহান হয়ে উঠি। আমি কি? সেই প্রশ্ন জাগে মনে। সত্যি সত্যি কি আমি সমাজের কিছু—না আমি কেউ নই?

এই তো জীবন?

পুরুষের জীবনে একটা সুন্দর অস্‌টেনসিবল্ ডিসেণ্ট ইন্‌কাম্ অর্থাৎ সুন্দর দেখা আয়ের পথ থাকলে জীবনটা আরও সহজ সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা যাদের, তাদের কাছে এসব কাল্পনিক বিলাস ছাড়া আর কি! সেই ইকনমিক্ স্ট্রাকচার যাকে বলে অর্থ নৈতিক কাঠামো।

অকেজো মানুষ আমি।

অকাজই আমার কাজ! অর্থগৃধ্নু তাও আমার নেই। তবে মানুষের বাঁচবার জন্য যে প্রাথমিক চাহিদা পরিপূরণের প্রয়োজন, তার কোনটাই তো সফল হয়নি। সামান্য অর্থের অন্বেষণে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানারকম কৌশল ফিকির করছি, কিন্তু কোনটাই সফল হচ্ছে না। না চাকরী, না ব্যবসা, কোন কিছুরই আমি উপযুক্ত নই। আমার আছে শুধু কাল্পনিক বিলাস, ডিকোয়েন-সীর অপিয়ম ইটারের মত বা বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের মত।

আমি জীবনকে দেখেছি এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। এই পৃথিবীতে এলাম, কিন্তু কী পেলাম? একটা বস্তুতান্ত্রিক বাস্তব হিসেব নিকেশের বোঝাপড়া। এ হিসেবে সময় সময় মনে মনে হাঁপিয়ে উঠি।

এ পর্যন্ত লিখে অমিতাভ কলম উঠিয়ে বসে ছিল। তারপর কি লেখা যায় সে কথাই সে ভাবছিল।

বিকেলের আকাশ সূর্যাস্তের রঙে রঙে ছেয়ে গেছে। সাহিত্যিকরা এই সূর্যাস্তের রঙকেই নায়িকার মুখ, অলকগুচ্ছ ও দেহের ওপর ফেলে কত বর্ণাঢ্যের সৃষ্টি করে। এই সব কল্পলোক-বিহারী জীব কল্পনার আকাশে কত সুন্দর সুন্দর ছবির আঁচর কাটেন রেখায়, তুলিতে ও মনে মনে। অবশ্য আধুনিক কালের গেভাকলার ছবি আরও দ্রুত রং বদলায়।

বাস্তব আর কল্পনা—কতই না তফাৎ? বাস্তব যেন বড় স্থূল। কল্পনায় সেখানে সাঁতার কাটা যায়। মনে মনে অবগাহন কর যতক্ষণ তোমার ইচ্ছে, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। তা নইলে সামাজিক আইন সতর্ক প্রহরীর মত তোমাকে সব সময় অনুসরণ করবে।

এ সময় ইলীনা যদি আসতো, বেশ হতো। খানিকটা নদীর ধারে বেড়িয়ে আসা যেতো। মুক্ত বাতাসে কিছুক্ষণ বেড়াতে পারলে মাথাটাও ঠাণ্ডা হতো।

এই বলে অমিতাভ কলম ছেড়ে দিয়ে ইলীনার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। মেণ্টাল টেলিপ্যাথি বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে ইলীনাকে এই মুহূর্তে আসতে হবে। শিবের মত পার্বতীর তপস্তায় অমিতাভ ইলীনার তপস্তায় ধ্যানমগ্ন হলো।

কিন্তু বেশীক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকতে হলোনা। দুটি হিয়ার যেখানে অদ্ভুত আকর্ষণ সেখানে সামান্য বিরহও ক্লান্তিকর।

অমিতাভ চোখ বুজে বসে আছে।

ইলীনা অমিতাভকে দেখে মুখ টিপে হেসে বলে: কার তপস্যা করা হচ্ছে, শুনি?

চমকে ওঠে অমিতাভ। দেহের জড়তা দূর করবার জন্য একবার ফ্রী হ্যাণ্ড ব্যায়াম করে নিয়ে বলে: বিশ্বেস করবে কিনা জানিনা, তোমারই তপস্যা করছিলুম।

তাহলে সৌভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু এ কি করছ তুমি? আবার উপন্যাস লিখতে বসেছ! তোমাকে ত' কতদিন বলেছি চল্লিশ না পেরুলে উপন্যাস লিখতে চেষ্টা করবে না।

কিন্তু চল্লিশ পেরুলে ত হৃদয়াবেগের সব কথা থেমে যাবে। তখন আর উপন্যাস লিখব না, লিখব থট্ প্রোভোকিং প্রবন্ধ।

তোমার তো তিরিশ বছরও পেরুল না। প্রস্তুতি আর অভিজ্ঞতা এ দুটোই

হচ্ছে লেখকের হাতিয়ার। তা নইলে বিকৃতবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে অনেক শুভ জিনিসে আমরা কল্যাণ হারিয়ে ফেলি।

প্রস্তুতিকাল ও অভিজ্ঞতাকে আমি অস্বীকার করছি নে।

একটু একটু করছ বৈ কি!

কেমন?

যথা—মরিস্ কর্নফোর্থের মেটিরিয়্যালিজম্ এণ্ড ডায়ালেকটিক্যাল মেথড, হিসটোরিক্যাল মেটিরিয়্যালিজম্ এবং থিওরি অফ্ নলেজ এই তিন খণ্ড তোমাকে পড়তে বলেছিলুম। পড়েছ তুমি?

অমিতাভ হেসে বলে: বেশ তো পড়ে নেবো এখন।

ইলীনা একটু কপট রাগ করেই বলে: সাহিত্য সাহিত্য কর অথচ ডায়ালেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম্ জানবে না।

জানব না কেন? কিন্তু বেশী পড়লে তর্কের কচকচি অজান্তেই এসে পড়ে। উপন্যাসের প্রাণরস তাতে শুকিয়ে যায়।

জীবনকে অস্বীকার করে কি তোমার উপন্যাস—না তোমার রচনা? বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগহীন রচনা অতীতে চলতো, এখন আর চলে না। জীবনবেদের পূজারী যারা, জীবনকে অস্বীকার করলে তাঁদের চলবে কেন?

তোমার এ ধারণা আমার সম্বন্ধে কি করে জন্মালো তুমিই জান। কাল্পনিক বা অলৌকিক কোন কাহিনীর পেছনে আমি ছুটবো না। সত্য আর বাস্তবের ভেলা নিয়েই আমার তরণী চলবে।

দেখ অমিতাভ, আজকালকার লেখকদের দেখেছ তো জীবনের ডিটেলিংসের ভেতর ওঁরা ঢুকে পড়েছেন। জীবনের যত ছোট খাট ঘটনা তার কত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ—বিচার, বিশ্লেষণ। ওই সব ঘটনার মধ্যে পাঠক পায় নিজের জীবনের প্রতিবিম্ব আর তখনই লেখকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। এ থেকেই বোঝা যায় লেখকের পাওয়ার অফ্ অবজারভেশন। সুতরাং জীবনকে জানতে শেখো, বুঝতে শেখো, দেখতে শেখো—তবে ত' হবে ঔপন্যাসিক। উপন্যাস লেখা কি সত্যিকারের হয়? সমারসেট মম্ বলেছেন: বেষ্ট ফিক্‌শন্ হচ্ছে লেখকের অটোবায়োগ্রাফি। কথাটা কত সুন্দর একবার ভেবে দেখো দেখি। লেখকের অভিজ্ঞতার পুঁজি চাই। কতকগুলো ছন্দবদ্ধ ভাষার কচকচি দিয়ে রচনাসৃষ্টির সার্থকতা কি? রসও চাই, ঘটনাও চাই। সাহিত্য

...মই, তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা গভীর জীবনবোধের অনিবার্য আকর্ষণীয় সুদূরের আহ্বান জানায়—নারী চলে তখন অভিসারে।

অমিতাভ একটু হেসে জবাব দেয়ঃ আমার মনে হয় তুমি নিজেই জান না, তুমি নিজে কি চাও। দেখছ, সমাজের ভাঙ্গন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দশ বৎসরের মধ্যে সমাজের অদ্ভুত পরিবর্তন। উঁচু শ্রেণী নীচুতে চলে যাচ্ছে, আবার নীচু শ্রেণী ক্রমশঃ উঁচুতে উঠে আসছে। একেই বলে বিবর্তন। ভূমিনির্ভর সমাজজীবন শিল্পনির্ভর হবার জন্য যে দ্রুত প্রয়াশ তাকে তুমি অস্বীকার করবে কি করে?

অস্বীকার করি নে! তবে মহাকাল এসে সবকিছু গ্রাস করবে। একদিন হয়ত সৃষ্টি ডুবে যাবে রহস্যের অতলে। সাহিত্য বল, ললিতকলা বল, আর্ট বল সবকিছু আবার নতুন আলোকসম্পাতে আর নতুন টেকনিকে বিচার করতে বসে মানুষ বাতিল করবে পুরাতনকে। শিল্প সাহিত্যের বিচারে সময়ের কাঠামো প্রধান ভূমিকা নেবে। আবার জন্ম নেবে নতুন। কিন্তু একমাত্র সত্য, মানুষ বেঁচে থাকবে, কারণ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

মার্কস সাহেবও মানুষকেই পূজো করেছেন। সেজন্যই বলেছেনঃ আমি ঈশ্বরকে অস্বীকার করি যেহেতু আমি মানুষের ভিতরে তার সুপ্ত মহত্ত্বকে দেখতে পেয়েছি। মানুষের ভিতরেই লুকিয়ে আছে দেবতা। ঈশ্বর পৃথিবীর কোথাও নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে স্বভাবজাত ক্ষমতা আছে তার বিকাশেই মানুষের মহত্ব প্রকাশ পায়। সুতরাং মানুষ আর দেবতার মধ্যে বিভেদ রাখা সমীচীন হবে না। যখন মানব প্রকৃতির সর্বোচ্চ সম্ভাবনার উপলব্ধি হয় তখন মানুষ এমনিতেই স্বর্গীয় ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

ইলীনা বলেঃ আমাদের বিবেকানন্দও এ জাতীয় কথা বলেছেনঃ জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তিনিও মানুষের ভিতরেই ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন।

মানুষ আজ মানুষকে বুঝতে চায়। আজকের জগতে এইটেই সবচেয়ে বড় আশার কথা।

বুঝতে আর চাইলে কোথায়? বুঝলে তো এক কথায় সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।

তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ : সেই সব মানুষই সবচেয়ে সুখী জীবন থেকে অনেক কিছু আশা করে না।

প্রাণীর মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। অথচ মানুষ আশা করবে না—আশা করবে পশু চমৎকার যুক্তি। আশাকে বাদ দিলে মানুষের রইল কি! প্যানডোরার বাকসের 'আশা' মানুষকে আর কিছু দিতে না পারলেও শান্তি দেয়, তৃপ্তি দেয়।

তুমি এখনও ছেলেমানুষ। রূপকথার জাল নিয়ে এখনও স্বপ্ন বোন।

স্বপ্নটুকু আছে বলেই এখনও বেঁচে আছি। রূঢ় বাস্তবের কঠোর আঘাতে যখন সংকুচিত, জর্জরিত, স্বপ্ন তখন তার কোমল পরশ দিয়ে সুদূরের আহ্বান জানায়। এটুকু নিয়েই বেঁচে আছি। মর্ত্যের মানুষ গোপনে স্বর্গের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায় ওই নীল আকাশে। সেখানে স্বার্থের সংঘাত নেই। রেষারেষি নেই, দ্বন্দ্ব নেই।

তুমি স্বর্গের সিঁড়ি দিয়ে নীলাকাশে উঠে যাও আর আমি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করি, কেমন?

নিজের জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য। মানুষের কতকগুলো প্রাথমিক চাহিদা আছে, তা' না মিটলে তো কোন কিছু গড়ে উঠতে পারে না।

বটে! তাহলে এই বেলা একটা বিয়ে করে নাও।

সো নিয়ার ইয়েট সো ফার। এতো কাছে তবু কতদূরে!

কান্নাটা একটা আর্ট!

নিষ্ঠুর। এই অবিস্মরনীয় মুহূর্তগুলোকে হেলায় তুমি কোথায় ছুঁড়ে দিচ্ছ তুমিই কি জান?

'ঘরের মঙ্গল শংখ নহে তোর তরে।

নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক, নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।'

দেশে বহু ভাল ছেলে পাবে যারা সংসারধর্ম পালন করবেন। মিষ্টি কথা আর মিষ্টি রস দিয়ে যাঁরা তোমার জীবন মন ভুলিয়ে রাখবেন।

তা আমি জানি। প্রেমের ছলাকলায় পুরুষকে দেখেছি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার ধারণা পালটাতে বাধ্য হ'লেম।

সত্যি বলছ? কি ধারণা ছিল তোমার?

নারীকে হাতের মুঠোয় পেলে নারী-বন্দনা করাই তার স্বভাবধর্ম। এইটেই রীতি, এইটেই প্রথা বা নিয়ম।

কিন্তু সে নারী যদি কুৎসিৎ হয়, সে নারী যদি পুরুষের হৃদয়ে তুফান তুলতে না পারে?

মিথ্যুক, অতি বড় নিন্দুকও আমার চেহারার এতবড় কঠোর সমালোচনা করতে পারবে না?

নিজের চেহারা সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস ও দম্ভ তো বেশ।

আত্মবিশ্বাস বা দম্ভের কথা নয়। এ-কথা তোমাদের পুরুষদের মুখ থেকেই শোনা। কাজেই ভয়ের কিছু নেই। আমি কিছু বানিয়ে বলছি নে।

রূপ সম্বন্ধে অহংকার থাকা ভাল। রূপ আমারও ভাল লাগে। তবে পুরুষ রূপ সম্বন্ধে বললেই যাচাইয়ের কষ্টিপাথরে জোরদার হবে, নইলে সে রূপ হবে মূল্যহীন এ ধারণা ঠিক নয়।

তুমি বেশ মজার মজার কথা বল। নারীর রূপের কথা পুরুষ বলবে না তো কে বলবে?

পুরুষের স্তুতিতে নারীর রূপ হয়ে ওঠে অপরূপ। চমৎকার যুক্তি।

তা' কিছুটা সত্যি বৈ কি!

এই সাম্যের যুগে ছেলে মেয়ে সব সমান। কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়, খাটো নয়। অফিস বল, সভাসমিতি বল, সংস্কৃতি সঙ্ঘ বল—কোনখানেই নয়। অবিশ্যি কলকাতার ট্রাম বাস বাদ দিয়ে।

দুজনেই ট্রাম বাসের কথা শুনে হেসে ওঠে।

চল এবারে উঠে পড়ি। ঘরের ভিতর আর নয়।

অমিতাভ আর ইলীনা দুজনেই গঙ্গার ধারে বেড়াতে আসে। একধারে ফোর্ট উইলিয়ামের সীমানা। তারপর পীচ বাধানো পথ। রাস্তা পার হয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে দুজনে রেল লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে। প্রায় হেষ্টিংসের সীমানার কাছে এসে পড়ে। গঙ্গার কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে নিয়ে দুজনেই বসে।

রাত্রি প্রায় ন'টা বাজে। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ নির্মল আকাশে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। সব কিছু জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। আমাদের কবি

বর্ষার সমারোহকে উপলক্ষ করে বলেছেন: 'এমন দিনে তারে বলা যায়।'' কিন্তু এদিকে আজ জ্যোৎস্না প্লাবন বিধৌত পৃথিবী, গঙ্গার জলে চাঁদের চকমকানি, সর্বত্র প্রতিভাত হচ্ছে একটি রূপালী আমেজ। এখন আর পৃথিবীর কোন সমস্যা নয়, অভাব অভিযোগ নয় বা কোন খেদোক্তিও নয়। এই মুহূর্তটিতে যেন জীবনের সযত্নে লালিত দুর্লভ জিনিসটিকেও বিলিয়ে দেওয়া যায়। যা কোনদিন কাকেও দেওয়া যায় না বা দেওয়া চলে না। এমন জিনিসও যুক্তিতর্কের অবকাশ না রেখে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। অমিতাভের মনে রঙ্ ধরে যায়। সে যেন কোন এক গভীরে তলিয়ে যায়। সে এমন এক দেশ যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না—সে এক সম্মোহন রাজ্য—যার অস্তিত্ব আছে অথচ সীমারেখা নেই। 'দুজনে মুখোমুখি গভীর দুঃখে দুঃখী।' দুজনেই চুপচাপ। কতক্ষণ তা বলা যায় না। তবে অনেকক্ষণ দুজনে মনে মনে কথা বলে চলে। যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে মনের সঙ্গে কথা বলে চলেছে।

ইলীনাই শেষ পর্যন্ত মুখ খুললে। নারী যদি অভিসারিকা নিজে হয় তবে বহু ক্ষেত্রেই কমেডির বীজ বুনতে পারে। ইলীনা বললে: এমন সুন্দর আকাশ বাতাস, গঙ্গার জলে চিকচিক্ করছে চাঁদের রূপালি রেখা, আকাশে ওই সুন্দর চাঁদ—তোমার কি এমন পরিবেশেও আমাকে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না? তুমি কি পুরুষ না আর কিছু?

ঠিকই বলেছ। তোমাদের নাটক নভেল বলে: দেখেছ আকাশে ওই সুন্দর চাঁদ, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি তার চেয়েও সুন্দর একটি জিনিস যার তুলনা নেই—তক্ষুনি নায়িকা বলবে: কি সেই সুন্দর বস্তু? বল, আমাকে বল? নায়ক তখন নায়িকার মুখটি আলতো করে তুলে ধরে বলবে: এই বস্তুটির কথাই বলছিলুম—জগতে যার তুলনা নেই।

কিন্তু তার ভেতরে কি সত্যি নেই?

সত্য জিনিষটা বড় গোলমেলে ব্যাপার। জগতে যত মহাপুরুষ এলেন গেলেন সকলেই সত্যের রিসার্চ—এন্টিরিসার্চের চুলচেরা বিচার করলেন। প্রতিষ্ঠিত সত্যের ভুল বের করে আবার নতুন সত্যবিচারে ব্রতী হলেন। এই-তো নিয়ম। চিরকাল চলে আসছে এই ব্যাপার।

দার্শনিকতার সময় এ নয়।

সত্যি, আমারই ভুল। এটা ভাবাবেগের সময়।

তবে ভাবাবেগের কথাই বল ছুটি যাহোক্। হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীতে যে সুর বেজে ওঠে তার কি কোন মূল্যই নেই।

তুমি ঠিক বুঝতে পারছনা লীনা আমি কি চাই? হয়ত আমি তোমাকে বোঝাতে পারছি নে। সেটা আমারই অক্ষমতা।

বেশ তো বলনা তুমি কি বলতে চাও?

মহৎ সাহিত্য স্বষ্টি করতে হলে যে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন হয় তার অভাব যেন বড়ই স্পষ্ট। কাজেই বড় কিছু গড়ে উঠছে না আমাদের সাহিত্যে। এত ক্ষণিক চিত্তচাঞ্চল্যকে সাহিত্যে রূপ দিতে গেলে বড় সাধনার প্রয়োজন। আমাদের আত্মসংযম নেই।

সমস্ত ক্ষণিকের জিনিসকেই ধরে রাখবার দুর্বার বাসনা কেন?

আমি যে শিল্পী। ক্ষণিকের জিনিসকে চিরন্তনের কোঠায় না ফেলতে পারলে আমার তৃপ্তি নেই।

একটা কথা তোমাকে বলি ঃ রাগ করো না। তুমি পড়বে কম ভাববে বেশী। নতুবা চিন্তাধারায় মৌলিকতা নষ্ট হয়। শিক্ষার এমনি একটা স্তর আছে যে স্তরে উঠে গেলে প্রকৃত জাতশিল্পীকে জীবন, প্রকৃতি ও সমাজকে নিজের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে বিচার করতে হবে। রাশি রাশি বই পড়লে অপরের চিন্তাস্রোত এসে তোমার মৌলিক চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করবে।

তোমার কথাগুলো খুব ভালো। এতে যথেষ্ট ভাববার আছে।

দেখ, তবু তো তুমি বুঝতে চাইলে না—অথচ ভাল কথাও মাঝে মাঝে আমি বলি।

সাংস্কৃতিক যোগাযোগটুকু আছে বলে তো তুমি এখনও আমার নাগাল পাচ্ছ। নইলে শুধু রূপ দিয়ে আর আমাকে কি করে ভোলাতে পারতে?

তাহলে বল কিছুটা ভোলাতে পেরেছি।

সন্দেহ হয় নাকি?

সে তুমিই ভাল জান?

হ্যাঁ, যে কথা ভাবছিলুম ঃ সাহিত্যিককে সমাজের বর্তমান অবস্থা আর যে সমাজব্যবস্থায় মানুষ খুশী নয়—তার পরিবর্তনের জন্য অংশ নেওয়া উচিত।

বটেই তো, বটেই তো। এই যেমন আমাদের প্রেম, কি করে একে বিধিবদ্ধ করা চলে, তাই না? পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতবর্ষের লোক বিয়ের আগে প্রেম একথা ভাবতেই পারতো না—কারণ এ-বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। অথচ আমরা দেখ বিয়ের আগেই কেমন প্রেম জমিয়ে তুলেছি।

প্রেমটা কোথায় হলো রে বাপু?

এই যেমন তোমার আমাকে ভাল লাগে, আমার তোমাকে ভাল লাগে। রাত দশটায় ভরা জ্যোৎস্নায় গঙ্গার ধারে বকুল গাছের নীচে পাশাপাশি দুটিতে বসে আছি। অথচ বিয়ে আমাদের হয় নি।

তোমার কথা কবি কল্পনাকেও হার মানাবে। প্রথমতঃ হেষ্টিংসের ধারে গঙ্গার পাড়ে কোন বকুল গাছ নেই। সুতরাং 'ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ' কি করে? দ্বিতীয়তঃ একটি ছেলে আর মেয়েতে পরিচয় হলেই বিয়ের কথা উঠবে কেন মনে। তার চাইতে কোন বৃহত্তর বা মহত্তর সম্বন্ধ কি আমরা পাতাতে পারি নে?

সেই মহত্তর বৃহত্তর সম্বন্ধ তুমি অন্য লোকের সঙ্গে পাতিও বাপু। আমার সঙ্গে কখনও নয়। আমি সেরকম কোন সম্বন্ধ পাতাতেই দেবো না।

অমিতাভ হেসে বলে ঃ মেয়েদের পরিচয় হলেই ঘর বাঁধবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে ওঠে! নতুনতর অন্য কোন সম্বন্ধ তারা আমলই দেবে না। এটা ঠিক নয় জাতির জীবনীশক্তি এতে স্থান্নু হয়ে পড়ে।

তা বই কি?

তা নয়তো কি? বিয়ের পরে অন্য কোন সম্বন্ধ পাতাতে গেলে স্ত্রী-ই তখন বাগড়া দেবে। ফলে বিকৃতবুদ্ধি দ্বারা বিচার করে অনেক শুভ জিনিসে আমরা কল্যাণ হারিয়ে ফেলি।

মানুষের স্বাভাবিক সহজাত বৃত্তি যেটা তাকে অস্বীকার করায় কি গৌরব পাও তা তুমিই জান। আমার অভিযোগ, যা সত্য তা তুমি স্বীকার করবে না কেন?

প্রেমের সীমাবদ্ধতা দিয়ে প্রেমকে কিছুতেই তুমি বুঝতে পারবে না। এই সীমাবদ্ধতার গণ্ডী পেরিয়ে মানুষ যখন চলতে শিখবে, তখনই মানুষ প্রেমের সত্যিকারের মাধুর্য ও মহিমার কথা উপলব্ধি করতে পারবে।

তুমি মাঝে মাঝে এতো ফাঁকা বুলির আওয়াজ তোল যার সত্যিকারের কোন অর্থ হয় না।

কি রকম? আরও একটু ভাষ্যের প্রয়োজন।

প্রেম আর যৌবনকে অস্বীকার করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। ওটাই নিয়ম। সহজ, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

অস্বীকার তো আমি করিনি। তবে তা সময় ও পাত্রবিশেষের রুচির ওপর অনেকখানি নির্ভর করে।

বুঝি, তুমি আমাকে আঘাত করে একটা প্রচণ্ড উল্লাস পাও। আমাকে ব্যথা দেবার একটা দুর্জয় লোভ তোমার মনে মনে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর মতে এও এক জাতীয় ভালবাসা।

তাই নাকি?

ভালবাসা কি শুধু ভালবাসার কথা বললেই হয়। ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ মানুষ ও রুচিভেদে বহু রকমের হয়। ক্রোধ, বিস্ময়, অহংকার, গভীর ঔদাসীন্য এ-সব কিছু দিয়েই ভালবাসা প্রকাশ করা চলে। শুধু যাকে ভালবাসা যায় তার ভালবাসা গ্রহণ করবার নৈপুণ্য বা ক্ষমতা যা বল তার ওপরও বহুলাংশে নির্ভর করে।

তবে তুমি মিছেমিছি ভালবাসার কথা শুনতে চাও কেন? যা জান তা নিয়ে আর ঘেঁটে লাভ কি?

ভালবাসা মানবপ্রবৃত্তির এমন একটি মহৎ গুণ যা শুনলেও যার শোনা কখনও শেষ হয় না। এমন একটি কোমলসূক্ষ্ম ভাবাবেগের ওপর দিয়ে ভালবাসা গড়িয়ে চলে যাকে শাদা চোখে দেখা যায় না—গভীরে তলিয়ে অনুভব করতে হয়।

জীবনের উপলব্ধিবোধ অনেক গভীর মূলে বাসা বেঁধেছে তোমার। নিষ্ঠা-বতীর নিষ্ঠা সহজে কেউ বাতিল করতে পারবে বলে ত মনে হয় না!

পেলুমই বা কোথায়? তাও তো জানি নে। অনুভবের জিনিসকে চোথ দিয়ে স্পর্শ করতে চাও—সেখানেই গরমিল।

মোটেও না। মন দিয়েই মাপতে চাই।

গজের ফিতে নিয়ে এসো। মাপটা সঠিক হবে! তোমরা মেয়েরা এত বস্তুতান্ত্রিক যে বলবার নয়। বস্তুর উর্ধেও যে একটি রাজ্য আছে সেকথা ভুলে যাও।

তুমি একটি মস্ত বড় হিপোক্রিট।

কি এত বড় কথা? আমাকে হিপোক্রিট বলছ! ভাল হবে না কিন্তু।

হিপোক্রিট-কে হিপোক্রিট বলবে না তো কি বলবে?

গুম্ হয়ে বসে রইল অমিতাভ। এক ঝাঁক গাঙচিল মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। নিকটের কৃষ্ণচূড়াগুলি 'দখিনা পবনে' মর্মরিত হয়ে এক গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত শোনায়। ইলীনার মনটা যেন মুহূর্তে অমিতাভের জন্য মমতায় ভরে ওঠে। রসিয়ে বলে: কি গো মহাশয়, রাগ হলো নাকি? কিন্তু হিপোক্রিট শব্দের অর্থ জান না এইটেই দুঃখের। হিপোক্রিট শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'অভিনেতা'। কলেজে আমাদের অধ্যাপক একদিন হিপোক্রিট শব্দের এই অর্থটি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন এবং আমরা কেউ-ই বলতে পারিনি। তাই কথাটি বেশ মনে আছে। কথাটি তোমার ওপর আরোপ করে তোমার গোঁসাও দেখলুম।

তোমার অনুমান ঠিক নয়। আমি ভাবছিলুম অন্য কথা।

কি ভাবছিলে গো? আমায় তার একটু ভাগ দেবে না?

শুনলে রাগ করবে না তো?

নির্ভয়ে বল। তুমি আমাকে বল, অমিতাভ!

ভাবছিলুম: পুরুষের জীবনে নারীর ভূমিকা কতটুকু? একটি নারীর অভাবে কি পুরুষের সীমায়িত পৃথিবীর পরিসমাপ্তি ঘটে? মোটেও না। ঠিক রোজকার মতই আকাশে সূর্য উঠবে। আমি আমার কাজ করে যাব—ভাবনার সমুদ্রে অবগাহন করব—হয়ত 'একলা চলরে' বলে ক্ষণে চেঁচিয়ে গান গেয়ে উঠবো। কিন্তু আত্মার মুক্তির জন্য অন্তরের গোঙানিকে প্রলেপ দিতে পুরুষের জীবনে নারীর অভিনয় কি সত্যি প্রয়োজন?

তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই?

আছে গো আছে। সেই নিঃশব্দ একাকীত্বে হয়ত আমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হবে; কিন্তু সেইটেই কি জীবনের সবটুকু, না তারপরেও আছে জীবন।

কোন জিনিসই তুমি সাধারণভাবে দেখতে পার না। সামান্য জিনিসের

মধ্যেও তুমি দার্শনিক তত্ত্ব খুঁজে বের করতে চেষ্টা কর। এইটেই তোমার জীবনে ট্রাজিডি।

সমগ্র জীবনটাই একটা গভীর দর্শন। ট্রাজিডি কমেডির সংজ্ঞা নিরূপণ করা এত সহজ নয়। ট্রাজিডি শুধু পরাজয়ের গণ্ডীর মধ্যেই আটকে নেই। জয়ের ভিতরেও ট্রাজিডি আসে। একটু লক্ষ্য কর: কুরু-পাণ্ডবেরা যখন যুদ্ধে জয়লাভ করলেন, তখনই সত্যিকারের ট্রাজিডি তাদের জীবনে এলো। চারিদিকে হাহাকার, কত লোক গৃহহারা। জয় তো হলো বটে, কিন্তু এই শ্মশান দিয়ে কি হবে? কাজেই দেখতে পাচ্ছ জয়ের ভেতর কমেডির বীজ প্রোথিত হলো।

সুন্দর! অভিনয়ে নেমে যাও, বন্ধু।

অমিতাভ একটু হাসলে।

ইলীনাই আবার পূর্ব কথার সুর ধরে বলে: তোমার সঙ্গে চৌরঙ্গীর 'ডাইনামিক সোসাইটী'তে যেদিন প্রথম দেখা হলো সেদিনটার কথা মনে পড়ে?

না। পড়বার তো কোন কারণ দেখি নে।

হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে বল।

মনে হলো এ-কোন্ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নারী। রূপ ও যৌবনের এক অপরূপ সামঞ্জস্য। এই নারী বহু পুরুষকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখে। লক্ষ্য নারীর ভেতর পুরুষের একে খুঁজে নিতে এতটুকু কষ্ট হবে না।

তারপর?

রূপ ও যৌবনের নিঃস্বার্থ স্তুতি যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ এসথেটিক্ সেনস ছিল—কিন্তু যেমনি প্রয়োজনবোধকে জড়ালুম অমনি সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল।

কিছু মনে করো না। একটা কথা বলি: আর্টের কাজ হবে সহজ ও সরল। দুর্বোধ্য জিনিসের প্রতি লেখকের মোহ থাকলেও আর্টের মোহ নেই। সেজন্য আমার মনে হয়, তোমার লেখাও সকলের জন্য নয়, মুষ্টিমেয়ের জন্য।

সেকথা হয়ত কতকটা ঠিক। পাঠককে একটি লেখকের লেখা বুঝতে হলে পাঠক যদি লেখকের স্তরে উঠতে না পারেন, তবে সে দুর্ভাগ্য কার?

সে দুর্ভাগ্য তোমার, আমার, সকলের।

কেন ?

দু'শো বছরের পরাধীনতা।

তারপরে স্বাধীনতা পেয়েই বা কি করলে ?

সে-সব জিনিস এতো অল্পে বিচার চলে না। ওসব ব্যাপারে সময় লাগে।

কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক বহুর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে একথা যেন মন মানতে চায় না। কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে যায়।

এমন সময় গঙ্গার ঘাটের একটি মাঝি গুটিগুটি এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। বলে : বাবু নৌকো করে চলুন বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

অমিতাভ ইলীনার দিকে তাকাতেই বলে : চল, এবার উঠি। রাত বোধ হয় এগারোটা বাজে।

কেন, চল না একটু গঙ্গায় বেড়িয়ে আসি।

মাঝিও সাহস পেয়ে বলে : চলুন দিদি, এমন দিনের মত ফুটফুটে আলো, একটু বেড়িয়ে আসবেন। ভাল লাগবে।

ইলীনা হেসে বলে : না রে বাপু, জলকে ভালবাসলেও জলকে আমি বড় ভয় করি।

কোন ভয় নেই দিদি ! এ-সময়ই তো বেড়িয়ে আরাম। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে জোয়ার আসবার সম্ভাবনা নেই।

ইলীনা ব্যাগ খুলে মাঝির হাতে একটি টাকা দিয়ে অমিতাভের হাত ধরে টানতে টানতে উঠে দাঁড়ায়।

দুই

অধ্যাপক সোমনাথ গুপ্ত রিজেণ্ট পার্কে মস্ত বড় বাড়ি করেছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন পয়লা নম্বরের ছাত্র। তার জুড়ি মেলা ভার। অক্সফোর্ড কেমব্রিজ চষে সেই দুর্দান্ত ব্রিটিশযুগেও ইণ্ডিয়ান এডুকেশানেল সার্ভিসের চাকরী বাগাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। ভাল হবার জন্য সবকিছু ছকের ঘুঁটির মত জীবনের পদক্ষেপগুলিও যেখানে পড়েছে সেখানেই একটা দৃঢ়তার বলিষ্ঠ ছাপ রেখে গেছে। আত্মপ্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাস বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন আরও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। সুনাম ও সুযশ ব্যক্তিত্বকেও অতিক্রম করে জীবনে একটি নতুন মর্যাদার আসন দিয়েছে।

সবকিছু পেলেও গৃহে অভাব ছিল গৃহিণীর। অধ্যাপক সোমনাথের চল্লিশ না পেরুতেই ইলীনার মা কাবেরী দেবীর মৃত্যু হয়। ইলীনার বয়স তখন মাত্র এক বৎসর।

তারপর দীর্ঘ সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। সোমনাথ ষাটের কোঠা পার হয়ে বাষট্টিতে পড়েছেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। রিজেণ্ট পার্কে বাড়ি তুলেছেন। মেয়েকে মনের মত করে মানুষ করেছেন।

সোমনাথ আর বিয়ে করেননি।

একাধারে পিতা, মাতা ও বন্ধু—সব ভূমিকায় নিজেকেই অভিনয় করতে হয়েছে। ইলীনাও তার জীবনের এই তেইশটি বসন্ত পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ঘরে বাইরে আভিজাত্যের এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি করেছিল। কলকাতার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে সোমনাথ ও ইলীনার অবদানকে আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইলীনার শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু আজও বিবাহ হয়নি। এজন্য সোমনাথেরও তাড়া নেই। মেয়ে পছন্দ করে যার গলায় বরমাল্য দেবে তাকেই তিনি মেনে নেবেন।

এদিকে ইলীনাও শিক্ষা দীক্ষা ও রুচিতে হয়ে ওঠে একজন সোফি-সটিকেটেড্ গার্ল। স্বাধীনতা তার প্রচুর। বহু সুধীজনের সমাবেশ হয় তাদের বাড়িতে। অনেক তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনা প্রতি সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে লেগেই আছে।

এমন এক সন্ধ্যায় অনেকে জমায়েৎ হয়েছে রিজেণ্ট পার্কের হল ঘরে। অধ্যাপক, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, এ্যাডভোকেট, অমিতাভের মত উঠতি লেখক ও সমাজকর্মী সবাই আছেন সেখানে। কারও বয়সই তিরিশের ওপর যায় নি। শুধু সোমনাথই বৃদ্ধ।

অধ্যাপক নীরেন লাহিড়ী উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন : দেখেছেন আজকের খবরটা ?

এফ, আর, সি, এস ডাক্তার অন্নদা মুখার্জি সকলের মুখপাত্র হয়ে বলে : শ্রীলাহিড়ী কোন্ বিশেষ খবরটা মিন্ করছেন ?

বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আচার্য বিনোবা ভাবে অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা ও অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, হালের বাংলা সাহিত্যকে বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলেছেন। আরও বলেছেন রবীন্দ্রনাথের আসন কালিদাসের সঙ্গে।

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে : তাই নাকি ?

অমিতাভ ইলীনাদের বাড়ির সভায় বেশী আসে নি। কাজেই সকলের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ও নেই। এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবারে মুখ খুললে : সবচেয়ে কড়া কথা কিন্তু বলেছেন দিল্লীর 'সাহিত্য একাডেমী' সম্বন্ধে।

সবাই উৎসুকভাবে বললেন : কি কথা ?

ভারতের চোদ্দটি জাতীয় ভাষা এবং এদের অনেকের বয়স এক হাজার বছরের বেশী। তবু দুঃ-খ-খু এই, এ্যাকাডেমী শব্দের উপযুক্ত ভারতীয় প্রতিশব্দ পাওয়া গেল না। বিজ্ঞানের যথাযথ প্রতিশব্দ না পেলে বেদনা বোধ হয়।

এফ, আর, সি, এস মাথা দুলিয়ে বলে : ঠিক ঠিক। খুব সত্যি কথা মশাই। বিজ্ঞানের পরিভাষা পাওয়া মুস্কিল কিন্তু তাই বলে 'এ্যাকাডেমী' শব্দের পরিভাষা পাওয়া যাবে না—এটা ঠিক নয়।

অধ্যাপক লাহিড়ী পূর্ব কথার জের ধরে বলে : সব কথাগুলো ভাববার মত। তারপরেই আবার বলেছেন : প্রত্যেক যুগেরই একটা বিশেষত্ব আছে। এ-যুগে সব জিনিসই অর্থ দিয়ে মাপা হয়। দুনিয়ার পুরস্কারে কি কিছু সৃষ্ট হয় ? তুলসীদাস বা কবীর কোন্ পুরস্কারটা পেয়েছিলেন ? অবশ্য আমাদের রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ? সাহিত্যিকের জীবনধারণের জন্য

কছু অর্থ চাই—একথা ঠিক! কিন্তু আজকাল সব জিনিসের মূল্যই পয়সায় করা হয়, সেজন্যই পুরস্কারের ব্যবস্থা।

সাহিত্যিকরা জানেন জনতার মধ্যে কোন্ বিচার-প্রবাহ চলা প্রয়োজন। তাতেই আপনাদের স্বাভাবিক প্রেরণা আসবে। আপনারা অন্তঃপ্রেরণা হতে লিখুন, তাতেই আপনাদের মঙ্গল, ভারতেরও মঙ্গল। আপনাদের আমি একটি কথা বলতে চাই, আমাদের সতত জীবনশুদ্ধির কাজ করতে হবে।

অধ্যাপক সোমনাথ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি বললেন: কিন্তু বড্ড চিপ লিটারেচারে আজকালকার বাজার ভরে গেছে। এতে মানুষের চিন্তাশীলতা বা গভীর মননের কোন নিদর্শন নেই। তত্ত্বমূলক বা বুদ্ধিদীপ্ত লেখা আজকাল বড় একটা দেখি নে।

লাহিড়ী বললে: বাংলা সাহিত্যকে আজ আর কোন্ঠাসা করে রাখতে পারবেন না। বাংলার মত এমন উঁচু ধরণের সমৃদ্ধ সাহিত্য ভারতবর্ষে আর কটি আছে বলুন।

তা হয়ত ঠিক। আমি বর্তমানের কথাই বলছিলুম।

আপনি যে যুগের মানুষ আপনি যদি সে-যুগকে বিচার করতে বসেন তাহলে ঠিক হবে না। আমাদের কাজকে বিচার করবে আগামীদিনের মানুষ।

তোমার কথায় কিছুটা সত্য আছে অস্বীকার করিনে।

তারপর আপনি চিপ্ লিটারেচারের কথা বললেন। বাঙ্গালী হাসতে জানে না। সব সময়ই গুরুগম্ভীর আলোচনা ভালবাসে। হাসির কথা, মজার কথা বা হালকাসুরের হালকা কথা যদি আজকাল লেখা হয় তাতে দোষের কি? একটা সাধারণ উদাহরণ ধরুন: এই যেমন বিদেশী সিনেমা। অধিকাংশ বই-এর বিষয়বস্তুই এতো চিপ্ যে আমাদের মন মেজাজে অনেক সময় খাপ খায় না। তবু বিদেশী বই-এর প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ। কিন্তু বাংলা সিনেমার বই দেখতে গিয়েই আমরা গুরুগম্ভীর কিছু তত্ত্বরস আশা করে বসি। আর বিশেষ করে বাংলা সিনেমা যদি ইংরেজী সিনেমার মত হালকা হতো তাহলে দেখতেন ও বই এক সপ্তাহের বেশী কোন হাউসে চলতো না।

এবারে অমিতাভ একথার জের ধরে বলে: সাহিত্যিকের কাজ মানুষকে

আনন্দরস পরিবেশন করা। সেই আনন্দের সঙ্গে যদি শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে আমরা যথাযথভাবে মিশিয়ে এমন এক স্তরে উন্নীত করতে পারি, যেখানে মানুষ আনন্দ ও জ্ঞানবিজ্ঞান দু-ই সমানভাবে পাবে—শ্রদ্ধেয় সোমনাথবাবু বোধ হয় সে কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন।

সোমনাথ হেসে মাথা দুলিয়ে বলে: তুমি ঠিক আমার কথার সুরটা বুঝতে পেরেছ।

ইলীনা বেয়ারার হাতে কফি ও অন্যান্য খাবার নিয়ে আসরে আসে। সোমনাথের শেষ কথাটা যা অমিতাভকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তা সে শুনতে পেরেছে। অমিতাভ সোমনাথকে বুঝতে পেরেছে এটা যেন একটা মহা-আশার কথা। ইলীনা সবাইকে ট্রে থেকে একে একে কফি এগিয়ে দিয়ে সোমনাথকে লক্ষ্য করে বলে: বাবা বোধ হয় জান না অমিতাভ একজন সাহিত্যিক; আর তাছাড়া ললিত-কলা মন্দিরম্ এর একজন ইনফ্লুয়েনসিয়াল ডিরেক্টার।

একথা শুনে সকলেই অমিতাভের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

কফি, স্যাণ্ডউইচ ও ক্রীমরোল সহযোগে খেতে খেতে টুকরো টুকরো আলাপ বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।

সোমনাথই আবার সকলকে লক্ষ্য করে বলে: কি হে, তোমাদের সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কতদূর?

অমিতাভই অনেকটা সকলের মুখপাত্র হয়ে জবাবটা দেয়: গণতন্ত্রের যেটি মূল আদর্শ তা আমাদের দেশের নৈতিক ঐতিহ্যের মধ্যেও সন্ধান পাওয়া যায়। একথাই আমাদের সভাপতি মহাশয় বলেছেন। তারপর ধরুন সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা এসব বিষয় থেকেও আমরা মুক্ত নই। সামাজিক প্রগতির প্রয়োজনের সহিত ব্যক্তিবাদের একটা সুষ্ঠু সমন্বয় করেই মানুষ আজ বর্তমানের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য আমরা যদি সামাজিক বিধিনিষেধের নিকট আত্মসমর্পণ করি তাহলে ব্যক্তি ও সমাজ দুইই সমৃদ্ধ হবে। কাজেই গণতন্ত্র একটি নতুন জীবনদর্শন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিচারেও গণতন্ত্র সাহায্য করে।

ব্যারিষ্টার তরুণ সিংহ এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যায়। একথা শুনে যেন কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলে: এবারে জমির প্রকৃত মালিক, কৃষকের অশ্রু, ঘর্ম ও অসাধারণ শ্রমের কথাটাও বলে দিন। যে পরিশ্রম করবে তার দাবীই সবার আগে।

অগ্নিভাভ বলে : তা কথাটা সত্যি বৈ কি!

ব্যারিষ্টার সিংহ অনেকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে : বুঝলেন মশাই, কিছু হবে না। এতো ঢিমে তেতালা কাজ কখনও ফলপ্রসূ হয় না। আজ দশ বছরের উপর দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু কি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটা আপনার নজরে আসছে? যে মধ্যবিত্তরা বুদ্ধিজীবী তাঁদের অবস্থা একবার বিচার করে দেখুন, তাঁরা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন আর দশ বছর আগেই বা কোথায় ছিলেন? প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে আপনি আমি কি পেয়েছি? মনে মনে বিচার করে দেখুন। আর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী শেষ হলেই বা কি পাবেন তা ও ভাববার কথা।

শুধু কথা বললেই ত হয় না। তার রূপ দিতেও সময় লাগে।

স্বাধীনতালাভে দেশের মানুষ আশু পরিবর্তন কিছু দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতো আর দেখতে পেলো না। সরকারী ব্যবহারের পার্থক্যও অঞ্চল বিশেষের মানুষকে গভীর ভাবে পীড়া দিচ্ছে।

কি রকম?

স্বাধীনতা আনতে গিয়ে দেশ বিভাগ মেনে নিতে হলো। ভাল কথা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা যে সব সুযোগ সুবিধে পেলেন পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা তা পেলেন না—এইটেই দুঃখের।

পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পেলেন না কি রকম? আর, এফ, এ, সংস্থার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সমাজকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন বৈ কি?

হাঁ, সে কথাই বলছিলাম। আমাকে বিভিন্ন কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে হয়। প্রকৃত ঘটনা কি সে আমি জানি। যেটুকু সাহায্য পেয়েছে তার প্রকৃতপক্ষে কোন দৃঢ় প্রস্তাব বা পরিকল্পনা নেই আর সেই সামান্য পরিমান সাহায্য দিয়ে কোন কিছু সুষ্ঠু আয়ের পথ এত সহজে গড়ে উঠতে পারে না। ফলে ঋণগ্রহীতারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিস্তির টাকা দিতে পারে না। মামলা হয়। আসলই দিতে পারে না। তার ওপর সুদের চাপও আছে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে ঋণ গ্রহীতারা উদ্বাস্তু সম্পত্তি বিনিময় ব্যাপারে বেকসুর ঋণমুক্তি পত্র পেয়েছে।

আমি এ-বিষয়ে ঠিক জানি না।

জানেন না বলেই ত বলছি। ব্যবহারে পার্থক্যবোধ ভাল লাগে না।

এই ধরুন সরকারী বাসের ব্যবসা; এতে তো আর মূলধন কম নিয়োজিত হয় নি। কিন্তু মুনাফা কোথায়? বিধানসভায় প্রশ্ন ওঠে। উত্তর হয়: একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে সময় লাগে। প্রথম কয়েক বৎসর প'ড়ে বসতে লোকসানই হয়। চট্ করে মুনাফা হয় না। এতো অধিক মূলধন খাটিয়েই যখন এই অবস্থা, তখন স্বল্পমূলধনের ব্যবসায় আয়টা কি হবে? অবস্থা ভেদে ছ' হাজার থেকে দশ হাজার টাকার ব্যবসায় দ্বিতীয় বৎসর থেকেই লাভ করে কিস্তির টাকা সুদে আসলে পরিশোধ করা এইসব সামান্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে কি সম্ভব? সমস্যা মশাই অনেক। এর শেষ নেই। আপনারা বরং গল্প করুন, আমি লনে গিয়ে পায়চারি করি।—এই বলে ব্যারিষ্টার সিংহ উঠে যায়!

এফ্, আর, সি, এস মুখার্জি অমিতাভকে লক্ষ্য করেই বলে: আমরা ডাক্তার মানুষ। আমাদের দেহ নিয়ে কারবার, মন নিয়ে কারবার সাহিত্যিকের সমাজ সেবীর কারবার সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। সুতরাং ও-নিয়ে আমি বেশী মাথা ঘামাই নে। তবে এটুকু বুঝি দেশের শিক্ষাই এজন্য দায়ী, কারণ মানুষ যদি নিজেদের প্রাথমিক চাহিদার মূল উদ্দেশ্যটুকু বুঝতে পারতো, তাহলে অনেক জিনিসের সহজ সমাধান হয়ে যেতো।

সোমনাথ সকলকে উদ্দেশ্য করেই বলে: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যাচ্ছে। বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য আমাদের সামাজিক বিধি-নিষেধের কাছে মাথা নত করতে হবে। তবেই আমরা কল্যাণকে পাব, জীবন-দর্শনও খুঁজে পাব।

তরুণ লনের ওপর একাকী পায়চারী করছিল।

ইলীনা পেছন থেকে এসে বলে: এই যে তরুণ—একা একা চলে এলে যে বড়?

সারাদিন কাজকর্মের পর আর তত্ত্ব আলোচনা ভাল লাগে না।

তাহলে কি ভাল লাগে।

আসি তোমার সঙ্গ পেতে। একটু হালকা সুরে হালকা কথা বলতে। কিন্তু ওরে বাবা, এ যে দেখছি একটি পাঠশালা বানিয়ে রেখেছ? পাঠশালার প্রাণ কই?

কেন, আমি তো আছি ?

তুমি থেকেও নেই। তুমি আছ বহুর ভিতরে। তাছাড়া সব সময়ই ব্যস্ত। অতিথি পরিচর্যা তার মধ্যে প্রধান স্থান পায়। তোমার সঙ্গ পেলুম কতটুকু ?

বুঝেছি, মনটা আজ তোমার ভাল নেই। খুবই উত্তেজিত হয়েছ।

মন ভাল রাখবার ওষুধ যখন জানা আছে, তখন দাও না কেন ?

তরুণ, তুমি তো আমাকে জান। তবে তোমার এই অভিযোগ কেন ?

তোমাকে জানি বলেই তো আসি। নইলে আর আসতুম না।

অবুঝ হয়ো না তরুণ, ধৈর্য ধর।

এই অমিতাভটি আবার কে ? নতুন সংযোজন দেখছি।

কেন, হিংসে হচ্ছে বুঝি ? আমার মনের ওপর তো শাসন করতে কখনও পাবে না। আমার মন থাকবে চিরমুক্ত। সেখানে তার স্বাধীনতা বিখণ্ডিত হবে, লাঞ্ছিত হবে, সে আমি কখনও সইতে পারবো না।

রাগ করলে লীনা! জানি পশুবলের সাহায্যে রাজ্য শাসন করা যায়, নারীর হৃদয় জয় করা যায় না।

তবে ?

আমি ধৈর্য ধরব।

তরুণ চলে যাবার পর ইলীনার সঙ্গে এবারে গেটের সম্মুখে লনের ধারে দেখা হয় এফ্, আর, সি. এস ডাক্তার অন্নদা মুখার্জির।

কারণ ইলীনা সেখানেই ছিল।

এবারে তাহলে আসি ইলীনা। রাতও হলো, হাতেও সময় কম।—বললে মুখার্জি।

ইলীনা হেসে বলে : তোমরা কাজের মানুষ। সেবাব্রতের কাজ নিয়েছ, তোমাদের অকাজ নিয়ে বিলাস করলে চলবে কেন ?

ঠাট্টা করছ বুঝি ?

ঠাট্টা কেন ? ডাক্তারী বিদ্যায় এফ্, আর, সি, এস-এর স্থান কোথায় সেটুকু আমি বুঝি ?

কিন্তু এত বুঝেও তো আমাদের বুঝতে চাইলে না।

বহুবচনে কেন একবচনেই বল।

সে সাহস কি আর আছে ?

হঠাৎ সাহসের অভাব ঘটল কেন ? মুখুজ্জে, তুমি পুরুষমানুষ। এ্যাকটিভ পার্ট তো তোমাকেই নিতে হবে। নারীর কি সরম সংকোচ বলে কিছু নেই।

যদি অভয় দাও তো বলি।

তোমাকে ভয় দেখালুম কবে বলতো ?

ইলীনা, তোমাকে ঠিক্ বুঝে উঠতে পারি না।

গদ্য কবিতার যুগে এ-যে একেবারে মিল কবিতা বন্ধু। গোপনে কাব্যচর্চাও হয় বুঝি ?

কাব্যরসে তোমাদের সঙ্গে পারব কেন ? সে-ক্রটী আমি সবসময় স্বীকার করি।

মুখুজ্জে, তোমাকে আমার ভাল লাগে তোমার সরল অকপট উক্তির জন্য। তুমি এত বড় একটা ডাক্তার, অথচ মনে মনে তুমি শিশু।

শিশুর সারল্য দিয়েও তো তোমার মনের নাগাল পেলুম না।

কি খালি অবুঝের মত মন মন করছ—মনের সেন্টিমেণ্টাল ভ্যালু তোমার কাছে কতটুকু।

কেন ডাক্তাররা কি মানুষ নয় !

স্থূল দেহ নিয়ে কারবার। অথচ মন নিয়ে বড়াই করা। লিমিটেশনস্ সব জিনিসের আছে। যার যেটুকু বিদ্যে সেটুকুতেই সীমায়িত থাকা উচিত। মন নিয়ে কালচার করছ বুঝি আজকাল। শুধু মন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পার ? তা-ও তো পারবে না।

এ কি বলছ তুমি ?

আমার সেদিনকার অসুখে তুমিই আমাকে পরীক্ষা করেছ। তোমাকেই আমি প্রফেশনাল কল দিয়েছিলুম।

পেশার সঙ্গে প্রয়োজনবোধকে জড়িও না। জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছি কাজের সময় রক্ত-মাংসের দেহের অনেক ঊর্ধে থাকে কর্তব্যবোধ, মানুষের কল্যাণ ও তার মঙ্গল।

ধন্য মুখুজ্জে, আমি তোমার কাছে এই উত্তরই আশা করেছিলুম। গুড্ নাইট। আজ এসো বন্ধু।

রিজেণ্ট পার্কের হল ঘর থেকেই অধ্যাপক নীরেন লাহিড়ী ইলীনা ও ডাক্তারকে দেখতে পায়। ডাক্তারের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে লনে।

লাহিড়ী কাছে এসে দাঁড়াতেই ইলীনা বলেন : কি লাহিড়ী, চললে বুঝি ?

হ্যাঁ, এবারে আসি।

মন কেমন আছে এখন ? সেদিন তো ফোনে বলেছিলে মন হয়েছে অথ্‌মী দিল।

সেকথা আর তোমাকে নতুন করে কি বলব, বল ? মনটারই নাগাল পেলুম না। মানুষের জীবনে প্রেম যে কতটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে সে তো আর বুঝলে না। প্রেম যে মানুষের নতুন জন্ম দেয়। প্রেম আর প্রকৃতিতে মিলন ঘটলেই মানুষ অমরত্ব লাভ করে।

এ যে একেবারে দার্শনিক সোপেনাহাওয়েরের তত্ত্ব কথা বন্ধু।

কি রকম ?

ব্যাখ্যা করতে হবে ?

প্রেম আর প্রকৃতির মিলনেই তো মানুষ অমরত্ব লাভ করে। সৃষ্টিতত্ত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে।

শুধু ওইটুকুই দেখলে। আর মানুষের যে আনন্দ তাকে তুমি দেখবে না।

আনন্দকে অস্বীকার করব কেন ? আনন্দের পেছনেই তো সকল মানুষের যাত্রা। নিজ নিজ রুচি অনুসারে সকল মানুষই ছুটে চলে আনন্দের সন্ধানে। তবে আনন্দকে তো দেখা যায় না, অনুভব করতে হয়।

না হয় একটু অনুভব করতেই চেষ্টা করলে।

প্রকৃতি তো ফিরে তাকাবে না কার চেখের জল ব্যর্থ হলো, কার চোখের জল শুকিয়ে গেল, কার হৃদয় হাহাকারে ভরে গেল। প্রকৃতি তার কাজ করে যাবে।

বিনীত অনুরোধ এতটা নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না।

এইবার একটা বিয়ে থা করে নাও। এ জাতীয় কাতর গোঙানি সভ্য সমাজের পক্ষে অশোভন।

তুমি একথা আমাকে বলতে পারলে ?

যদি প্রেম তোমার গভীর হয়ে থাকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যেও মুক্তির সন্ধান খোঁজ।

এ ধরণের উপদেশ না দিলেও পারতে। যদি কিছু সত্য থেকে থাকে আমার প্রেম এমনিতেও বেঁচে থাকবে।

তপস্যা কর তাহলে—কিছু সত্য থাকলে সিদ্ধ হবে!

ভরসা দিলে অপেক্ষা করতে পারি।

অতটা সাহস ভাল নয়। এ পথ বড় দুর্গম।

দুর্গম হলেও দুর্বার নয়।

সে আত্মবিশ্বাস যদি থাকে তবে আর আমার বলবার কিছু নেই।

নবীন এ্যাডভোকেট অমিত আর অমিতাভ এবারে বিদায় নেবার জন্য রওনা হল।

পথে ইলীনার সঙ্গে দেখা হয়।

ইলীনা উভয়কেই স্মিত হাস্যে সম্বর্ধনা করে।

অমিত স্বভাবতই লাজুক। কথা কম বলে ; কিন্তু যেটুকু বলে খুব গোছান কথা বলে। অল্প কথায় বহু কথার যোগান দেয়।

অমিতকে ইলীনারও বেশ লাগে। সুনজরেই আছে বলা চলে। একটু হেসেই বলে : অমিত অমিতাভের বাণীতে কি অমৃত পেয়েছে সেই জানে। সকলে যখন উঠে চলে গেল, তখনও অমিত বসে শুনছে অমিতাভের অমৃত-বচন !

কথা শুনে অমিত একটু হাসলে।

ইলীনা বলে : হাসি নয় অমিত। অমিতাভ তোমাকে যাদু করেছে।

যাদু নয়। আমরা একসঙ্গে ল'কলেজে পড়তুম। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার হয়ত কিছুটা মিল আছে।

তাই নাকি অমিতাভ ? কই আমাকে তো তুমি অমিত সম্বন্ধে আগে কিছু বলনি ?

সময় হয়নি দেখেই বলিনি। আর তাছাড়া তোমার সঙ্গে তো অমিতের পরিচয় আছেই। সে তোমাদের পরিবারের বন্ধু।

তা আছে। তবে তোমার সঙ্গে পরিচয়ের কথা জানতুম না।

তুমি অমিতের সঙ্গে কথা বল। আমি এবারে যাই। কাজ আছে।

তাহলে আমরা সবাই পার্ক ষ্ট্রীটের ললিতকলা মন্দিরমে যাচ্ছি।

যাবার জন্যেই তো অনুরোধ করে গেলুম। এখন যাওয়া না যাওয়া তোমাদের ইচ্ছে।

আচ্ছা এসো।

অমিতাভ চলে গেলে ইলীনা আবার অমিতকে নিয়ে কথা সুরু করে।

অমিত দেখেছ আকাশের ওই সুন্দর চাঁদকে। এসো না আমরা এই বাগানের সুন্দর পরিবেশে বসে কিছুক্ষণ গল্প করি।

বেশ তো, চলো।

আচ্ছা অমিত, অনেকেই তো আমাকে দেখে অনেক কথা বলে। কিন্তু তুমি তো কোনদিন আমাকে দেখে কোন কিছু বললে না।

মুখে বললেই বুঝি বেশী বলা হয়! অনেক জিনিস না বলেও যে বলা হয় সেকথা বুঝি বোঝ না?

সেটি আবার কি রকম? একটু একস্‌প্রেশন্ না থাকলে মানুষকে বোঝা ভার।

যেখানে ইঙ্গিতে চলে সেখানে ভঙ্গীর প্রয়োজন দেখি নে।

একটু একটু ভঙ্গীও মাঝে মাঝে দেখিও, তাতে মানুষ খুশী হয়।

তুমি সুন্দর মানুষ। তোমাকে খুশী করবার জন্য বহু মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ের মাঝে সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি বল?

জনতার মাঝেও মানুষ চেনার ক্ষমতা আমার আছে।

জনতাই দেখি কিন্তু মানুষ কোথায়?

সেই কথাই বল—তুমি মানুষ দেখতে পাও না।

আমিও দেখতে পাই নে, তুমিও দেখতে পাও না।

তাহলে প্রব্লেমটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল?

সেই তো সমস্যা। সময় দিয়ে বিচার করতে হবে।

সময়। সে তো ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু বর্তমান কি মানুষের কিছু নয়?

মানুষ যখন সবকিছু হাতের মুঠোয় পায় তখনই তার সবচেয়ে বড় সংযম প্রয়োজন।

তাহলে তুমি এখন সংযম করছ, বল?

আমি সংযম করব কোন্ দুঃখে?

সব কিছু হাতের মুঠোয় পেয়েছ দেখে।

কি যে পাই নি, সে তুমিও জান আমিও জানি।

বাজে কথা যাক্। এসো আমরা বর্তমানকে উপভোগ করি। একটা গান কর না শুনি। সেই 'একলা চল রে'।

অমিত আর কোন কথা কাটাকাটি না করে বিনা বাক্য ব্যয়ে গানটি গেয়ে যায়। গানটি গায় ও প্রাণের দরদ ঢেলে দিয়ে।

গান শেষ হবার পর একটা সাময়িক স্তব্ধতা দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

ইলীনাই আবার কথা বলে: বুঝলে অমিত, সময় সময় মনে হয় সমাজ সংসার মিছে সব। আমি যেন একা, বড্ড একা। কেউ নেই আমার। সঙ্গী নেই, সাথী নেই—জীবনে কেউ নেই আমার। আমি একাকী।

একাকী কেন লাগবে না? যে বয়সের যে কাজ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছ; সুতরাং জীবন ও যাত্রাপথে কিছুটা অসামঞ্জস্য থাকবে বৈ কি

সাহিত্য বল, ললিতকলা বল—কোন কিছুর মধ্যেই শান্তি নেই। মানুষের সেই চিরন্তন হাহাকারে কতটুকু শান্তির প্রলেপ এসব জিনিসে আমরা পাই।

এতো জেনেশুনে এটা কি কথা বললে তুমি? জীবনের মূল্যবোধ রূপায়ণে সাহিত্যের অবদান অসামান্য। আমাদের অধ্যাপক বলতেন: দুঃখের সময় আমি সেকস্পীয়র পড়ি। তাতে মনে শান্তি পাই।

হয়ত ঠিক।

এই ধর মানুষ যদি সাহিত্য, ললিতকলা না সৃষ্টি করতে পারতো তাহলে মানুষের পাশব জীবনটাই প্রধান হতো; কিন্তু মানুষ এইসব সুকুমারবৃত্তি অনুশীলন করে চিন্তার রাজ্যে মনকে এমন এক স্তরে নিয়ে গেছে যেখানে তার বিচারশক্তি ও রসাঞ্জন অন্য যে কোন প্রাণী জগতের অনেক উর্ধে।

অনেকটা স্কুল ঘেঁষা বক্তৃতা হলো না!

তা হোক, কিন্তু এর ভিতরে সত্য আছে।

একটা কথা কি মনে হয় জান, মানুষ যা পায় না তার জন্যই তার দুর্লভ আকাঙ্খা। কিন্তু সেই দুর্লভ জিনিস যখন হাতের মুঠোয় আসে তখন মনে হয় তাইতো একি হলো—এই কি চেয়েছিলাম?

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।'

এর উত্তর কি জান? কবির কথায় বলি:

'মনের মত খোঁজ যাঁহারে
সে কি আছে ভুবনে
সে তো রয়েছে মনে।'

ঠিক এমনি আমাদের জীবন। অথচ এই প্রেমের জন্য কতই না আমাদের ব্যর্থ অশ্রুধারা!

কিন্তু প্রেম মানুষের জীবনে এক মহৎ সৃষ্টি। প্রেম যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, প্রেম মানুষের এক অদ্ভুত আবিষ্কার। মানুষের পাশব অধ্যায়ের ওপর সাংস্কৃতিক পলেস্তরা হলো প্রেম। নিঃসন্দেহে প্রেম মানুষের সংস্কৃতির এক প্রধান ও অপূর্ব নব সংযোজন।

তুমি বেশ গুছিয়ে কথা বল অমিত। সেজন্যই তোমার কথা শুনতে ভাল লাগে।

ভাল শ্রোতা পেলে আমাদেরও বলতে ভাল লাগে। নারী হচ্ছে শক্তির আধার। শক্তি সাধনা করতে নারীকে পুরুষের সহচরীরূপে তাই চাই। সাধারণ মানুষও তাই নারীর সাহায্য পেযে অমিত বল বিক্রমে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে চলে।

পুরুষের নারীকে চাই। নারীর পুরুষকে চাই। এটা মানুষের জীবনের প্রাথমিক চাহিদা। তারপরেও আছে জীবন। মানুষের সুখ জিনিসটা অন্তরের, ওটা বাইরের জিনিস নয়। শান্তি আর আনন্দ—এ-দুটো নিয়ে মানুষের যে জয়যাত্রা তার সমাধান মানুষ পেলো কোথায়? মিথ্যে তর্ক আর আলোচনায় কত সময়ই না ব্যয় হলো!

সত্যি সাহিত্যিকরা তো আর রাজনৈতিক নন। জীবনের মূল্য বোধ নিরূপণে সাহায্য করবে, না নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবে?

দুটোই চাই বন্ধু। মানুষের জীবনে দুটোরই প্রভাব অপরিসীম। সত্য আর ভালবাসা দুটোর পেছনেই আমাদের অভিযান চালাতে হবে। তাদের কেন্দ্র করেই হবে সাহিত্য। অমিতাভের নতুন বইতে জীবনের মূল্যবোধের এক অপরূপ গুণগুনানি শুনতে পাই। এ-যেন সমগ্র মানবজাতিকে এক নব পান্থশালায় মূল্য বিচারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

অমিতাভের বই আমিও পড়েছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলে হয়! আর অসংহত রচনার কাহিনী পড়তে গিয়ে খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন চিন্তাধারার মূলতত্ত্ব বুঝতে গিয়ে খেই হারিয়ে না ফেলে। ফলে কাগজওয়ালাদের সমালোচনার ওপর নির্ভর করতে হবে। সমালোচনাও যা, বই না পড়ে সমালোচনা। তার ওপর আছে দলাদলি—নিজের দলীয় লোক না হলে সে বাতিল—লেখক কিছু জানে না। যা জানে আমি সমালোচক, সব জানি, সব বুঝি। এই অহং ভাবকে না কমাতে পারলে আমাদের সাহিত্য জীবনে ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হয়েছে বলতে হবে।

সে কথা আমি মানি অমিত। আলডুস হাক্সলি জাতীয় লেখা থট্‌-প্রোভোকিং লোক ছাড়া বুঝতে পারবেন না। তুমি দুটো সাহিত্যিককে আড়ালে বিভিন্ন অবস্থায় আলোচনা করতে দেখ—তুমি দেখতে পাবে দুজনেই দুজনকে পেছন থেকে ছুরি চালাচ্ছেন। আমি একদিন একজন প্রতিষ্ঠিত নামজাদা সাহিত্যিককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলুম। এসব কি? সমাজ ও সাহিত্য-জীবনের পক্ষে এ কখনও সুস্থকর নয়। তিনি আমার কথা শুনে হেসে যা উত্তর দিলেন একটু ধৈর্য ধরে শোন : আমরা সমাজের জীবন্ত মন দিয়ে নাড়াচাড়া করি সুতরাং কিছুটা আত্মম্ভরিতা ও দম্ভ আমাদের থাকবে বৈ কি।

মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে কতটা আন্‌ব্যালেন্সড্‌ হয়ে পড়লে এ ধরণের উক্তি করতে পারে, বলতো? লিমিটেশন্‌স্‌ মানতে হবে বৈ কি! জীবনের সর্বক্ষেত্রেই লিমিটেশন্‌স্‌ আছে। মানুষ অবুঝ হলেই লিমিটেশন্‌সের কথা ভুলে যায়।

ঠিক কথাই বলেছ। একথার আর শেষ নেই। যত বলবে ততই বেড়ে চলবে। রাতও হয়ে এলো, এবারে উঠতে হয়।

উঠবে বৈকি। আর একটা কথা শুনে যাও! এই ধর না কেন অমিতাভের বইটি প্রকাশ পেতে কি কম বেগ পেতে হয়েছে। গতানুগতিক বই নয় বলে

কেউই ছাপতে চায় না। প্রকাশকেরা জেরা করেন : বিশুদ্ধ প্রেম কোথায়? মশায়, প্রবন্ধের বই লিখলেই পারতেন। উপন্যাসে রস না থাকলে চলে! এ ধরণের আরও কত কি কথা। কিন্তু তুমি তো অমিতাভকে জান—নিজের মন থেকে যুক্তি দিয়ে কোন কথা বিচার না করে সে কলম ছোঁবে না। কলম ধরবেই বা কেন—যে লেখায় সমাজের উপকার হয় না—সে লেখায় কি সুখ আছে, না শান্তি আছে!

খুব সত্যি কথা। ফালতু কথা দিয়ে তুমি পাতার পর পাতা ভরাবে, অথচ তার কোন সার্বজনীন আবেদন নেই। শুধু নামের মোহে বা নিছক অর্থের খাতিরে যে ফরমায়েসী সাহিত্য সৃষ্ট হয় তার মূল্য কতটুকু! অবশ্য মহাকালের বিচারের কথা আমি বলছিনে। কালের বিচারে হয়ত অনেক কিছু লোপ পাবে। কেউ দীর্ঘস্থায়ী, কেউ বা ক্ষণস্থায়ী—তফাৎ শুধু এইটুকু।

এই যে আজকালকার বাজারে কতকগুলো বই এর এক মাসে দু মাসে সংস্করণ হয়ে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করেছ। এসব লেখকেরা জনচিত্ত হরণ করবার চাবিকাঠি বা গুপ্তিমন্ত্র জেনে নিয়েছেন, তাঁদের আয়ু যত স্বল্পই হোক সাময়িক-ভাবে তাঁরা লাভবান হচ্ছেন। জনগণও আফিং এর নেশার মত তাঁদের চিন্তাধারার সব কিছু গলাধঃকরণ করছেন। এটা দুঃখের কি সুখের সে বিচারে লাভ নেই।

সে বিচারে যখন লাভ নেই, তখন এবার আমি উঠি। বুঝলে, ভয়ানক দেরী হয়ে যাচ্ছে। মহাকাল তো পরের কথা। যার বর্তমান নেই তার আবার 'ডে অফ্ জাজমেণ্ট' কি? ওসব পোষাকী কথা বই-এর পাতায় তোলা থাক।

তিন

পার্ক ষ্ট্রীটে আর্টিষ্ট্রী হাউসের পাশেই ললিতকলা মন্দিরমের বাড়ি।

অনেক সভ্য অনেক সভ্যা।

বহু ধনী এর আজীবন সভ্য। তাছাড়া আয়েরও বিবিধ পথ আছে।

এদের লক্ষ্য 'মানুষের জীবনে পূর্ণতম বিকাশে' সাহায্য করা।

শুধু মুখে মুখে সমাজতন্ত্র নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন বৈষম্য থাকবে না। অপর দশটি মানুষের শ্রম ভাঙ্গিয়ে কোন একটি বিশেষ লোক যাতে বড় লোক হতে না পারে। যেখানে সকল মানুষেরই সমান অধিকার, তেমন সমাজই আমরা চাই।

জীবন ও যুগের চাহিদা মিটিয়ে গণতন্ত্র আমাদের সকল আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারছে কি না—তা-ও তর্কের বিষয়বস্তু। সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্র শেষ হয়েছে। বণিক ও বুর্জোয়া যুগ অস্তমিত প্রায়।

দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্প-বিপ্লবের আবহাওয়া ঘটিয়ে আমরা ঠিক কোথায় গিয়ে পৌছোব-তাই আমাদের আলোচনার বিষয়। সুতরাং রাষ্ট্রের পরবর্তী ধাপ সমাজতন্ত্রকেই লক্ষ্য করে প্রচার করা হচ্ছে। যেখানে জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-বর্ণ কোন কিছুরই পার্থক্য থাকবে না।

অধ্যাপক সোমনাথ বলেন: উদ্দেশ্য খুবই সাধু। রাষ্ট্রের পরিবর্তে যদি এ-ধরণের প্রাইভেট সেকটার গড়ে ওঠে তাতে দেশের মঙ্গল বলতে হবে।

ইলীনা ও সোমনাথের কল্যাণে ওদের সান্ধ্য আসরের প্রায় সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছিল। কারণ আজ সোফোক্লেশের 'আন্তিগোনে' অভিনীত হবে। এক ইলীনা ছাড়া ওদের দলের সকলেই এক জায়গাতেই বসেছিল। একরকম চুপ করেই ছিল সকলে। মৌন সমর্থন বা কথা বলতে ঔদাসীন্য বা ক্লান্তি সব কিছুই বোঝায়।

এফ্, আর, সি, এস ডাক্তার অন্নদা মুখার্জিই সর্বপ্রথম কথা বলে: বক্তৃতা সভাসমিতি অনেক কিছুই তো হলো। কথা বলতে আমরা বড় ভালবাসি। কাজের চেয়ে কথা বড় হয়ে দাঁড়ায়।

সোমনাথ বলে: এদের প্রোগাম খুবই এ্যামবিশাদ্। তাছাড়া বিবিধ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে অর্থ উপায়ও যথেষ্ট। যেখানে অর্থের অনটন নেই

সেখানে কাজের ইচ্ছে থাকলে যথেষ্ট কাজ করা যায়। তবে অর্থের অসদ্ব্যবহার না হয় বা নিছক ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কিছুতে ঝাঁপিয়ে না পড়লেই কল্যাণ আসতে বাধ্য।

মুখার্জি: কাগজে কলমে যে প্রোগ্রাম সুষ্ঠু, বাস্তবে রূপ দিতে গেলে তাই আবার বানচাল হয়ে যায়। এজন্য প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

সোমনাথ: এদের ভিতর অভিজ্ঞ লোকও আছে হে। তাছাড়া ঠেকে শেখাও অভিজ্ঞতা। ওতে বুনিয়াদ পাকা হয়।

মুখার্জি: বুনিয়াদ পাকা হয় সত্য, কিন্তু তার জন্য খেসারৎ দিতে হয়।

সোমনাথ: তা প্রয়োজন হলে খেসারৎ দেব বৈকি!

চুপ্, চুপ্, চুপ্!

এমনিতেই গ্রীক নাটক ট্রাজিডির রাজা। তারপর আবার মর্মস্পর্শী দুঃখের বিষয়বস্তু। রাজার আদেশ অমান্য করে স্নেহশীলা ভগিনী আন্তিগোনে কিভাবে ভ্রাতা পোলুনেইকেসের মৃতদেহ গ্রীসদেশের প্রথামত শেষকৃত্য সমাপন করলেন—তাই নিয়ে নাটকের মূল কাহিনী।

আন্তিগোনে রাজার আদেশ অমান্য করে মনে মনে শাস্তির জন্য প্রস্তুত।

রাজা ক্রেয়ন সম্পর্কে আন্তিগোনের মামা। কিন্তু রাজাজ্ঞা ও রাজ্যশাসন বড় কঠোর।

রক্ষী আন্তিগোনেকে রাজার সম্মুখে আনবার পর বিনাসংকোচে তাঁর অপরাধ স্বীকার করে বলে: আমি মানুষের বিধান মানি না, দেবতার বিধান মানি।

রাজা ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন।

তিনি আন্তিগোনে ও ভগিনী ইসমেনে দু-বোনকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবার ভয় দেখালেন।

কিন্তু আন্তিগোনে দৃঢ়তায় অচল অটল।

তাঁর আর রাজার সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছে নেই। মৃত্যুই তিনি বরনীয় মনে করেন।

ইসমেনেও আন্তিগোনের কাছে বলে: বোন, যে কাজ করেছ তার দণ্ড মৃত্যু। আমিও রাজার কাছে বলব আমি তোমার কাজে সহায়তা করেছি। তাহলে আমরা দুজনেই মরণের দেশে যেতে পারব।

আন্তিগোনে ইসমেনের এ প্রস্তাব সক্ষোভে বাতিল করে দেয়। তারপর বলে: তোমার পথ জীবনের, আর আমার পথ মৃত্যুর। এক জগৎ তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করবে আর এক জগৎ অভিনন্দন জানাবে আমার বুদ্ধির। মৃত্যুর দেশে যাঁরা গেছেন তাঁদের সেবা করাই আমার ধর্ম। সুতরাং আমার কামনা মৃত্যু। তুমি জীবনে সুখী হও।

এদিকে রাজা ক্রেয়ন বললেন: রাজার আদেশ অমান্য করবার জন্য আন্তিগোনেকে প্রাণ দিতে হবে।

তখন ইসমেনে রাজাকে বললে: আপনার ছেলে হায়মোন দিদি আন্তি-গোনেকে ভালবাসে।

রাজা বলেন: আমার ছেলের ভালবাসার অনেক জায়গা মিলবে বাপু।

কিন্তু আন্তিগোনের মত আপনার ছেলে আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না।

আমার ছেলের জন্য আমি এমন দুষ্টা নারী চাই নে।

একথা শুনে আন্তিগোনে আক্ষেপ করলেন এই বলে: হায় প্রিয়তম হায়মোন, তোমার পিতা তোমার প্রতি সুবিচার করলেন না।

রাজা: থাক্ থাক্ তোমার আর বিয়ের কথা বলতে হবে না।

কোরাস: তাহলে কি আপনার ছেলের কাছ থেকে এই কুমারীকে কেড়ে নেবেন?

ক্রেয়ন: মৃত্যুই ব্যবধান রচনা করবে।

কোরাস: তাহলে মেয়েটির মৃত্যু সম্বন্ধেই আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ!

ক্রেয়ন: হাঁ, মেয়েটিকে মৃত্যু দণ্ডই গ্রহণ করতে হবে। মিথ্যে আর সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন দেখিনে।

এই বলে ভৃত্যদের উদ্দেশে বললেন: এদের অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। নারীদের মত এরা অন্তঃপুরে থাকবে। এদের দিকে নজর রেখো, এরা যেন পালিয়ে না যায়। কারণ মৃত্যু কাছে এলে সাহসী মানুষও পালিয়ে বাঁচতে চায়।

তারপরে কোরাসের একটি গান হয়।

এদিকে গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত্র হায়মোন এসে তার বাবার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়।

রাজা বললেন: আমার পথ ধর্মের পথ। নীতির পথ। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে আমার আর তোমার কাছ থেকে উপদেশ নিতে হবে না।

রাজপুত্র: আমি বয়সে ছোট হতে পারি, কিন্তু আমার ভেতরেও অনেক সদ্‌গুণ আছে।

রাজা: রাজার আদেশ যে অমান্য করে তাকে সম্মান করা নিশ্চয়ই একটা মহৎ গুণ। তোমার বিচারে বোধ হয় আন্তিগোনে কোন অপরাধ করেনি।

রাজপুত্র: হাঁ, থেবসের জনগণও তাই বিশ্বাস করে।

রাজা: রাজ্য পরিচালনা বিদ্যা বোধ হয় আমাকে থেবসবাসীদের কাছে শিখতে হবে।

রাজপুত্র: ছেলেমি ভাল লাগে না।

রাজা: তাহলে তোমার মতে আমার নিজের বুদ্ধি ছেড়ে অন্যের বুদ্ধিতে রাজ্য শাসন করব।

রাজপুত্র: নগর একজনের শাসনে থাকলে তাকে নগর বলা চলে না।

রাজা: শাসক তাহলে এ দেশের প্রভু নয়।

রাজপুত্র: আপনি মরুভূমির উপযুক্ত শাসনকর্তা হতে পারেন।

রাজা: ব্যাপারটা কি? একজন মস্তবড় নারী দরদী বন্ধু দেখছি যে।

রাজপুত্র: আপনি তো নারী নন, সুতরাং আপনার জন্যই আমার ভাবনা।

রাজা: বাপের সঙ্গে এভাবে খোলাখুলি ঝগড়া করতে তোমার লজ্জা করে না?

রাজপুত্র: কি করব, আপনি যে ন্যায় নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন!

রাজা: রাজার কাজ রাজ্য শাসন করা—শাসনাধিকার প্রয়োগ করাটাই বোধহয় তাহলে অন্যায়!

রাজপুত্র: শাসনাধিকারের মর্যাদা আপনি রক্ষা করেন নি। দেবতার সম্মান আপনার কাছে উপেক্ষিত হয়েছে।

রাজা : ধিক্ তোমাকে। এত নীচু তুমি! একটি নারীর পায়ে সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে বসেছ!

রাজপুত্র : আমি কখনও নীচ কাজ করেছি এমন কথা আপনি কখনও শুনতে পাবেন না।

রাজা : তাই বুঝি ওই দুষ্টা মেয়েটার জন্য কোমর বেঁধে বাপের সঙ্গে লড়তে এসেছ?

রাজপুত্র : ঠিক ওর জন্য নয়। আপনার আমার ও পাতালপুরীর দেবতাদের জন্য।

রাজা : এ জীবনে তুমি আন্তিগোনেকে বিয়ে করতে পারবে না।

রাজপুত্র : আন্তিগোনের মৃত্যু হলে আর একটি জীবনও স্বেচ্ছায় জীবন-দান করবে।

রাজা : সকলের সামনে আমাকে ভয় দেখাবার দুঃসাহস তোমার কি করে হলো?

রাজপুত্র : মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই বুঝি ভয় দেখান হয়?

রাজা : তুমি যদি আমাকে পাগলের মত জ্ঞান দিতে চেষ্টা করো তবে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

রাজপুত্র : আপনি আমার পিতা না হলে আপনাকে আমি অজ্ঞান বলতুম।

রাজা : তুমি স্ত্রীলোকের পায়ে মাথা বিকিয়েছ। আমার সঙ্গে আর ছলনা করো না।

রাজপুত্র : নিজেই শুধু কথা বলুন। অপরকে আর কথা বলবার সুযোগ দেবেন না।

রাজা : তোমার দুঃসাহস দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। নিয়ে এস সেই ঘৃণ্য নারীকে, তোমার চোখের সামনেই বধ করব।

রাজপুত্র : না, না এ কিছুতেই আমি হতে দেব না। আমার মুখও আপনাকে আর দেখতে হবে না। আপনি আপনার স্তাবকদের সঙ্গেই কথা বলুন।

এর পর রাজপুত্র চলে যায়।

কোরাস রাজাকে বলে : ছেলেটা যে চলে গেল। ছেলেরা মনে আঘাত পেলে ভয়ানক হয়ে পড়ে—আপনি কি করে আন্তিগোনেকে হত্যা করবেন ?

রাজা : লোকালয়ের বাইরে নির্জন পথে তাকে লুকিয়ে রাখব। সেখানে সে সন্তানোচিত সাহায্য পাবে অথচ নগরে কলঙ্ক রটবে না। পাতালপুরীর দেবতাকেই স্মরণ করবে সে, এবং তাঁকে স্মরণ করতে করতেই মৃত্যুও ঘনিয়ে আসবে। যদি এভাবে কিছুদিন বেঁচে থাকে তাহলে বুঝবে মৃতের প্রতি ভক্তি দেখানয় কোন সুফল হয় না।

একথা বলবার পর রাজাও চলে যান।

তখন কোরাস প্রণয় দেবতার স্তুতিবন্দনা আরম্ভ করে। কিন্তু ষ্টেজের ভেতর থেকে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যায়। ক্রমশঃ তা কোরাসের স্বরকে অতিক্রম করে একটা প্রচণ্ড হৈ হৈ ও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ষ্টেজে এমন এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় যে শ্রোতাদের কাণে কোরসের প্রণয় স্তুতির বদলে কিল চড় ও ঘুসির আওয়াজ ভেসে আসে। গোলমালের জন্য ড্রপ্ সীন ভেতর থেকে কর্মকর্ত্তাদের কেউ ফেলে দেয়। শ্রোতাদের মধ্যেও একটা অসন্তোষ ও ভীতির সঞ্চার হয়।

দলে দলে লোক সবাই বের হবার জন্য পাগল! ডাক্তার মুখার্জিও সোমনাথকে নিয়ে থিয়েটারের হল থেকে নীচে উন্মুক্ত বাগানে এসে দাঁড়ায়। ওখানেই ওঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ইলীনা ও অমিতাভ সোমনাথকে খুঁজতে খুঁজতে বাগানে এসে দেখা হয়।

সোমনাথ কিছুটা অস্থির হয়ে বলে : কি তোমাদের ব্যাপার ? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। কোরাসের এমন একটা স্তুতিবন্দনা—তা না সব কিছু ভণ্ডুল করে দিলে ?

ডাক্তার মুখার্জি : বোধ হয় নিজেদের মধ্যে একটা কিছু গোলমাল হয়েছে।

অমিতাভ বলে : আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বটে।

কি গোলমাল হলো আবার ?—বললে সোমনাথ।

নিজেদেরই কলঙ্কের কথা। সংক্ষেপে বলছি শোনো—বললে ইলীনা!

আমাদের ললিত-কলা মন্দিরমে ডাঃ গিরীণ চক্রবর্তী এসে যোগ দিয়েছেন

বোধ হয় জান। মহাপণ্ডিত এই ব্যক্তিটি। বিলেতে ৩৪ বৎসর অধ্যাপকের কাজ করেছেন। বিখ্যাত দানবীর বারিন চক্রবর্তী মশাই-এর ভাই-এর ছেলে। ইংরেজী কথা বলতে এর জুড়ি কম! রসজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি হিসেবে বিদেশে যথেষ্ট নাম আছে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও একজন মস্ত বড় পাণ্ডা। গ্রীক নাটক সোফোক্লিসের ডিরেকশনও তিনি দিচ্ছিলেন। এদিকে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদিবাকর শর্মাকে শলাপরামর্শের জন্য নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়ে ডেকে আনা হয়।

কোরাসের প্রণয়-স্তুতির ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক বাঁশী হবে বলে ডাঃ চক্রবর্তী ফতোয়া দেন। কিন্তু শ্রীদিবাকর বলেন গ্রীস দেশের পটভূমিকায় বাঁশীর বদলে ম্যাণ্ডোলিন জাতীয় বাজনাই দেওয়া উচিত। তাহলেই মানাবে ভাল।

না না বাঁশী বাজালেই হবে।

বেশ বাঁশীই বাজান। চিঠি দিয়ে ডেকে এনে অপমান করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বেশ, আমি আসি।

শ্রীদিবাকর কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরেই ডাঃ চক্রবর্তী পুনরায় তাকে ডাকেন।

শ্রীদিবাকরও ডাক শুনে ভদ্রভাবে এগিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি আসতেই বিনা বাক্য ব্যয়ে ডাঃ চক্রবর্তী শ্রীদিবাকরের মুখের উপর এক প্রচণ্ড ঘুসি চালিয়ে দেন।

শ্রীদিবাকর তো মহা অপ্রস্তুত!

অপমান ও লজ্জায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। চারিদিকে একটা হৈ হৈ ও বিশৃঙ্খলা। এ রকম ঘটনার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। বিশেষ করে ডাঃ চক্রবর্তীর মত একজন দেশে বিদেশে সম্মানিত ও উচ্চ শিক্ষিত মানুষ অর্বাচীনের মত কাণ্ড করে বসবেন একথা যেন ভাবাও চলে না। তিনি যত মহাপণ্ডিতই হোন অথবা মনীষার স্ফূরণে না হয় একটা দিকপালই হলেন মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার না করলে তাঁর দম্ভ বা সংস্কৃতিকে কেউ আমল দেয় না। পাগলের মত কাজ করেছেন তিনি। অথচ অমিতাভ যেদিন প্রথম ললিত কলা-মন্দিরমে সভা ডেকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় তখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল তাঁর। বিলেতে এবং কন্টিনেণ্টে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মত বাঙ্গালী তথা ভারতবর্ষের মর্যাদা বাড়াতে যদি কেউ সাহায্য করে থাকেন

তবে তিনি হচ্ছেন ডাঃ গিরীন চক্রবর্তী। সেই ডাঃ চক্রবর্তী যদি এই প্রবীণ বয়সেও উন্মাদের মত কাজকর্ম করেন তবে তাকে ক্ষমা করা চলে না।

এর পর থিয়েটার আর চলতে পারে না। কাজেই বন্ধ করে দিতে হল।

শ্রীদিবাকরেরও একটা মানমর্যাদা আছে। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। তাছাড়া কলকাতা আর্ট কলেজের ডিরেক্টার।

তিনি অতিশয় ভদ্র ব্যক্তি। ঘুসির পরিবর্তে তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রতিদানে যে কিছু দিতে হয় তা যেন তিনি জানেনই না। মহাত্মা গান্ধীর দেশের লোক অত সহজে বিচলিত হলে চলবে কেন!

সোমনাথ বলে: অতীতে শোনা যেতো বিদেশে বাঙ্গালীরা বড় সজ্জন। আমি তার পরিবর্তন করে বলতে চাই: বিদেশে বাঙ্গালীরা হয়ত কিছুটা সজ্জন, কিন্তু ঘরে নৈবঃ নৈবঃ চ। এত রেষারেষি, দলাদলি আর হিংসা আর কোথাও নেই। আচ্ছা, একটু ভেবে দেখো, আমাদের যত শিক্ষাই থাক কোন বড় কাজই আমরা মিলেমিশে করবার উপযুক্ত নই। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের লজ্জার স্থান নেই।

ইলীনা বলে একটু মাঠে বেড়িয়ে বাড়ি ফেরা যাক্। মোটে তো সাড়ে সাতটা। এখানে আর এখন কোন ফাংশন হবে না। মিছেমিছি তর্ক আর অকারণে ঝগড়া ভাল লাগে না। সহ্য করবার শক্তি যেন কোন পক্ষেরই নাই। সকলেই উন্মাদ হয়ে গেছেন।

ঠিকই বলেছ মা, আমরা বড় অধীর হয়ে পড়েছি। 'সহনশীলতা' বলে যে অভিধানে একটা শব্দ আছে তা যেন আর মনে হয় না। আমরা দিনকে দিন কি হয়ে যাচ্ছি, কোথায় চলেছি আমরা! আমদের জাতীয় জীবনে সংযমের এত অভাব যে, অতি অল্পতেই আমরা ধৈর্য হারা হয়ে পড়ি। আমাদের শিক্ষা বল, সংস্কৃতি বল, সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আমরা দিনকে দিন এক কিম্ভুত-কিমাকার জীব হয়ে যাচ্ছি।

ডাঃ মুখার্জি বলে: একথার আর শেষ নেই মিঃ গুপ্ত। ব্যক্তি-চরিত্রের মানদণ্ড উন্নত না হলে সমষ্টির উদার ও উন্নত চরিত্র আশা করেন কি করে? কারণ ব্যক্তিকে নিয়েই তো সমষ্টি। ব্যক্তিকে উপেক্ষা করলে সমষ্টির মানদণ্ড কখনও উন্নত হতে পারে না।

অমিতাভ বলে: এ কথা আমারও অনেক সময় মনে হয়। রাজনীতি-

বিদ্‌রা প্রায়ই বলেন : আমাদের যা কিছু করণীয় সমষ্টির কল্যাণের জন্যই ; কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলো বলে আমরা বিচলিত হব না।

ডাঃ মুখার্জি হেসে বলে : রাজনীতিবিদ্‌রা বোধ হয় বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা বলেন। বোধ হয় পলিসি বা নীতির কথা বলতে গিয়ে কোন ব্যক্তি বশেষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলেও বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য তাঁদের নীতিকে আঁকড়ে থাকবেন—এই কথাটাই তাঁরা ঘোষণা করতে চান। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তি-কল্যাণ উপেক্ষিত হয়ে সমষ্টি কল্যাণের জয়গান ঘোষিত হচ্ছে।

ইলীনা কপট রাগ করে বলে : তোমরা দেখছি বাগানে দাঁড়িয়েই বেশ তর্কের আসর জমিয়ে তুললে। চলো খোলা হাওয়ায়। সেখানে আরাম করে বেশ একটু গল্প করা যাক।

তাই চলো বলে সকলেই গাড়ীতে উঠে পড়ে।

গাড়ী এসে নিঃশব্দে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে দাঁড়ায়। সন্ধ্যাবেলা বহু ভ্রমণ-বিলাসী ও স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড় হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশে-পাশে। গাড়ীর পর গাড়ী চলেছে সারি বেঁধে। দলে দলে নারী পুরুষ হেঁটে চলেছে! লোকে লোকারণ্য। মানুষে মানুষে ছেয়ে গেছে ফুটপাত। মাঠের আনাচে কানাচে দলে দলে নারী পুরুষ আড্ডা জমিয়ে বসেছে। মুক্ত বায়ু সেবন ও নির্দোষ আনন্দলাভের জন্যই যেন মানুষ এখানে আসে।

সোমনাথ, ইলীনা, অমিতাভ ও ডাঃ মুখার্জি সকলেই গাড়ী থেকে নেমে মাঠের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে এগিয়ে যায়। সমস্ত মাঠ জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে। কলকাতায় শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ খোলা মাঠ বা গঙ্গার ধারে না গেলে বোঝাই যায় নাই। তাই নগরের লোকের উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ালে মন আপনিই প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। একটি পরিচ্ছন্ন জায়গা দেখে তারা সবাই বসে পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বিশ্রামের পর সোমনাথ বলে : তারুণ্যকে অস্বীকার করবার মত দুঃসাহস আমার নেই। তবে তারুণ্য মানুষকে উদ্ধত ও অসংযমী করে। আবার এ-ও বুঝি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার চাবিকাঠিও তরুণদের হাতেই। কিন্তু তাই বলে উশৃঙ্খল হতে হবে এ-ও কোন কাজের কথা নয়।

ডাক্তার মুখার্জি বলে : সত্যি অস্বীকার করে লাভ নেই। ললিতকলা মন্দিরমে গিয়ে এমন একটা সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম, যে বাইরের সবকিছু অন্তত মুহূর্তের জন্য আর মনে ছিল না। কিন্তু তার সমাপ্তি যে এমন একটা বিশৃঙ্খল ও উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘটবে তা ভাবতেই পারিনি। সকলেই সেখানে শিক্ষিত এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন।

অমিতাভ একটু গম্ভীর ভাবেই বলে : এই শ্যাম (Sham) ডেমোক্রেশীর যুগে (নকল গণতন্ত্র) ক্ষমতালোভী এক শ্রেণীর মানুষ জন্মলাভ করেছে। রাজনৈতিক দলই বলুন অথবা সাধারণ ছোটবড় প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানই বলুন সব জায়গাতেই ক্ষমতা নিয়ে মারামারি কাটাকাটি। আবার ক্ষমতা হাতে পেলেই মানুষের হৃদয়ের সূক্ষ্ম কোমলবৃত্তিগুলি, অপরের প্রতি মমত্ব বোধ, উদারতা এবং স্থিতিস্থাপকতা সব যেন ক্ষমতার গর্বে তলিয়ে যায়!

ডাঃ মুখার্জি বলে : খুবই ঠিক কথা। রাজনৈতিক নির্বাচনের আগে যখন প্রার্থী ভোটদাতাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তদ্বির করেন, তখন প্রার্থীদের সামনে কত গোলাপী স্বপ্নের ছবি তুলে ধরেন। দেশের মঙ্গলের জন্যই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি দেশের কাজ করতে চাই। তখনই দলের সঙ্গীরা বলবেন : মহাশয়ের অতীতটা একটু লক্ষ্য করুন—দেশের জন্য কৃচ্ছসাধনা, কত ত্যাগ আর কী অনাড়ম্বর জীবন। যথার্থ প্রার্থী যাতে আইন সভায় স্থান পায় সেদিকে অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন।

ইলীনা এ কথার উত্তরে বলে : সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ডেমোক্রেশীর চাইতে আর কোন বেটার ফরম্ অফ্ গভর্ণমেণ্ট কি হতে পারে, সেকথাও কেউ বলতে পারছেন না। গণতন্ত্রের চাইতে আরও উৎকৃষ্টতর সরকার কি হতে পারে তারও তো সঠিক নির্দেশ কেউ দিতে পারছেন না।

অমিতাভ বলে : ওয়েলফেয়ার ষ্টেট বা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা তা ভারতের পক্ষে নতুন নয়। এটা ভারত-সংস্কৃতির মর্মকথা। অবশ্য পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচারের ফলে আমরা সংসার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুলাংশে আত্মসুখ প্রয়াসী হয়েছি। ভারত সংস্কৃতির মূলকথা জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে সচেষ্ট হওয়া। প্রচুর মমত্ববোধ না থাকলে জীবন রস শুকিয়ে যায় আর সংস্কৃতিরও ধ্বংস হয়।

ডাঃ মুখার্জি বলে ঃ অমিতাভবাবু যখন কথাটা তুললেন তখন বলি ঃ যৌথপরিবার প্রথা আমাদের অগ্রগতির পক্ষে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে, না ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে—সেটা ভাববার কথা। অপরের দরদে দরদী হতে, জীবে দয়া, ভক্তি বা প্রেমের কর্ষণ করতে হলে যৌথ পরিবার প্রথা সাহায্য করবে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ বাঁধা দেবে—এ কোন কাজের কথা নয়। আত্মসুখ নিয়ে যারা জর্জর, প্রাথমিক শিক্ষাতেই তাদের গলতি আছে বলতে হবে।

অমিতাভ হেসে বলে ঃ বিদেশী আমলে আমরা যে-শিক্ষা পেয়েছি তাকে হচ্পচ্ (খিচুরী) শিক্ষা বলা চলে। স্কুল কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বাড়িতে সনাতনী রীতিতে মা দিদিমার সংস্কারে ইন্ধন দিতে দিতে দুটোতে মিলে মিশে সামঞ্জস্য রক্ষা করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। দু-নৌকোয় পা দিয়ে আমরা এক কিম্ভুতকিমাকার জীবে পরিণত হই। কোন্ সংস্কৃতি আমরা আঁকড়ে ধরবো? পাশ্চাত্যের চোখ ধাঁধাঁন জমকালো সংস্কৃতি, না প্রতীচ্যের অলৌলিক সংস্কৃতি।

ডাঃ মুখার্জি বলে ঃ আমাদের সমাজে এ-জাতীয় বিরোধ একটা ছিল বটে তবে সে সমস্যা বোধ করি ঊনবিংশ শতাব্দীর। বিংশ শতাব্দীতে আমরা নিজেদের মধ্যে সবকিছু মিলে সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছি—একথা বলা চলে। কিন্তু আমার তো এবারে উঠতে হবে। রাত সাড়ে আটটায় আমার একটা জরুরী কল আছে রিজেন্ট পার্কে।

সোমনাথ একথা শুনে বলে ঃ তাহলে মুখুজ্জে আমি তোমার গাড়ীতেই যাব। ইলীনা-অমিতাভ থাকতে চায় থাকুক ওরা পরে আসবে।

বেশ তো চলুন। এতে আপত্তি কিসের?

ডাঃ মুখার্জি সোমনাথকে নিয়ে চলে যায়। ইলীনা, অমিতাভ দুইজনেই অনেকক্ষণ অপস্যয়মান গাড়িটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

অমিতাভ বলে ঃ কি, চুপ করে আছ যে বড়?

ভাবছি।

কি ভাবছ?

তোমাকে বলা চলে না।

এমন কথা ভাবছ যা আমাকে বলা চলে না। তোমার ভাবনাকে তাহলে সমাজের পক্ষে সুস্থকর বলা যায় না।

আমার মন তো অসুস্থ নয়।

তবে?

মেয়ে ঘেঁষা পুরুষ আমার দু'চক্ষের বিষ।

তাই নাকি?

পুরুষের ধর্মই হচ্ছে বহু নারীর পেছনে ছোটা।

আর মেয়েদের ধর্ম পুরুষের পেছনে ছোটা।

ব্রুট্!

কেন?

তোমাদের জাতধর্ম যাবে কোথায়? পুরুষ যে বহুবল্লভে আসক্ত সেকথা কে না জানে? সেকালের দিনে দেখো একটা পুরুষ অনেকগুলি বিয়ে করতো। তাহলে একটা হৃদয় কতভাগে ভাগ হতো? কুলীনদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

দেখো অশ্লীল কথা বলতে চাইনে। ধর তোমাদের জাত-ব্যবসার কথা।

তুমি একটি জানোয়ার।

আজকে তোমার হলো কি? এত মধুর সম্ভাষণ!

ইতরের মতো কথা বললে তোমাকে মাথায় তুলে নাচবো—বেশ আব্দার যা হোক।

সত্যভাবণে যদি কিছুটা অশ্লীলতা থাকেই তবে তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করা উচিত।

থাক, একটা দোষ ঢাকতে গিয়ে আর কতগুলি কষ্টকল্পিত শব্দের অপপ্রয়োগ করো না।

খুবই চটেছ দেখছি। তোমাদের প্রবোধ সাণ্ডেল মশাই ঠিকই বলেছেন: মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হওয়া ভাল, ঘনিষ্ঠতা হওয়া ভাল নয়। তারা ভুলতে পারে না যে তারা মেয়ে।

চমৎকার নজির দেখাতে শিখেছ আজকাল তুমি, অমি। পুঁথি ঘেটে শেখবার বয়স আর নেই, বাস্তবকে কিছুটা শাদা চোখে দেখতে শেখো

শিখেছি বলেই তো বলছি : আত্মানং সতত রক্ষেৎ ; মেয়েদের কাছ থেকে শত হাত দূরে রেখে নিজেকে বাঁচাও।

সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত দেখছি। মেয়েদেব কাছ থেকে শত হাত দূর—এসব কথা কোথায় আছে—অনুবাদ করলে তো!

ওসব কথা উহ্য আছে। এটুকু বুঝতে পার না—তা না হলে নিজেকে তুমি বাঁচাবে কার কাছ থেকে।

কেন, মেয়েরা কি দোষ করল?

দোষ, মহাদোষ করেছে মেয়েরা। জীবনভরে নিত্যি নতুন চমক লাগিয়ে পুরুষকে নাচিয়ে বেড়ায়।

মনস্তত্ব রেখে এবারে নিজের কথা কিছু বল!

'তোমা হতে দূরে, বহুদূরে মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম'—

হঠাৎ?

হঠাৎ নয়। সীমা ও অসীমের নিবিড় দ্বন্দ্ব যেন একটা পরিসমাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই একে অন্যের ভেতর হারিয়ে ফেলবার জন্য উতলা। আজ যেন 'আলোয় আকাশ ভরা, ফুল্ল শ্যামল ধরা।'

তাহলে সুখবর বলতে হবে। একটা কবিতা বল না।

শুনবে?

হাঁ, শুনবো।

একেবারে হাল আমলের আধুনিক কবির আধুনিক কবিতা।

তা হোক।

তবে শোন :

> যখন প্রাণের নিচু মেঘের মুখে কথা বলি,
> তোমার ধারণা, ঐ যে নবধারা কাকলি,
> ঐ টুকুই কবিতা।
>
> রাতের তারার মলাট সরিয়ে
> গাছের পাতায় ফুল পরিয়ে
> জাগর-ক্লান্ত আমার চোখের পাতার নীচেও
> কলমের যে ফুল ফোটায় উষা,

তোমার ধারণা, ঐ যে রঙীন,
ঐটুকুই কবিতা।

কিন্তু যখন নিঃশব্দে
রঙের ঝাঁপি বন্ধ করে বাইরে আসি,
তখন থাকে না,
না ফুল, না কথা, না অবতারণা
তুমিই বলো,
হায় হায়, কিছুই যে হলো না।
অথচ নিশ্চয় জানি
এই অনুক্ত রাগিনীর নীরবতায়
নিরুদ্ধ—ব্যঞ্জনার মগ্ন শোভায়
সকল অতিরিক্তকে বাদ দিয়ে
হৃদয় সমুদ্রের অতলে
আমার পূর্ণতা।

ওপরে ঢেউয়ের কথায় গান,
ফেনায় আবিষ্ট সমুদ্রের স্বর
নিচে অক্ষর হীন অন্ধকারে
সমুদ্রের অন্তঃপুরে যেখানে প্রাণের প্রদীপন
আমি উন্মনা, আমি অজানা,
সেখানে বসে রইলাম।

খুব কবিত্ব করেছে দেখছি। মন যখন পীড়িত থাকে দুঃখবাদ তখন তত্ত্ব-কথা সৃষ্টি করে।

কবিটি আমার বিশেষ বন্ধু ব্যক্তি। ক্রমশ দিব্যজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে মনে হয়।

গভীর সুরের গভীর কথা নয়। এবারে হালকা কথা বল। দার্শনিকতা রাখ।

ছেলে আর মেয়েতে বন্ধুত্ব রক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার গো। তোমাদের অন্নদাশঙ্কর বলেছেন: এমন একজন দেখলুম না যে, বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখল। দু'দিন পরে নরনারীর সেই আদিম সম্পর্ক। বন্ধু হয়ে উঠল প্রেমিক। হতে চাইল স্বামী।

স্রেফ্ গাঁজা। আমি অনেক পুরুষকে জানি যাঁরা গভীর বন্ধুত্বের পরেও স্বামী হতে চায় না। স্বামী হবার দায়িত্ব অস্বীকার করে।

যথা?

উদাহরণ দিতে হবে?

দিলেই বা দোষ কি?

দোষ কিছু নয়। তবে ভাবটা নৈর্বক্তিক ও ডিটাচড্। ডিটাচড্-এর বাংলা করতে পারলুম না। বিচ্ছিন্ন কথাটা আমার ভাল লাগে না। অথচ নিজের কথা শুনতে ভাল লাগে। এমনি মানুষের স্বভাব। কেউ সহজে স্বীকার করে, আবার কেউ জল ঘোলা করে স্বীকার করে, তফাৎ শুধু এইটুকু। ইলীনা গুণ-গুণিয়ে গান গেয়ে ওঠে:

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে?
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ-মুখের পানে?
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে?

রেডিওতে রাত সাড়ে দশটার আসরে বিভাস চৌধুরীর গলায় শুনেছি। আবার এখন এই পরিবেশে শুনলুম! বেশ ভাল লাগলো। একটি নারীর অভাবে কি সমস্ত পৃথিবীরও শেষ হয়ে যাবে? না ঠিক তা নয়। সূর্য আকাশে ঠিক উঠবে। আমিও কল্পনায় অবগাহন করে আনন্দ পাব। আমি আমার কাজ চালিয়ে যাব। জীবন পথে একা চলতে পারব আমি। তবে হয়ত একটা অজানা সুর বা অদেখা ব্যথা সময় সময় আমাকে পীড়া দেবে। তা ছাড়া আর কি বল?

তাহলে স্বীকার করলে অজানা সুর ও অদেখা ব্যথা তোমাকে পীড়া দেবে। তোমাকে ক্ষণিকের জন্যও একটু পীড়া দেব তাইতো আমি চাই, তাইতে আমার আনন্দ।

তোমার আনন্দ পাবার পদ্ধতিটা কিন্তু একটু এ্যাবনরমাল।

কি রকম?

মানুষকে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পাও। নিউহিউম্যানিজম্ (নতুন মানবিত্বিক সংজ্ঞা) নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করচ বুঝি?

দেখ না আজকের সাহিত্য। জনচিত্ত এ্যাবনরম্যালিটিস্-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মানুষের আনন্দ পাবার রুচি বা ধারাটা দিন দিন পালটে যাচ্ছে। অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক চরিত্রের উপরেই মানুষের ঝোঁক বেশী।

এ-ধোঁকা বেশীদিন চলবে না। মানুষ আবার সুস্থ হবে।

যুগে যুগে যে রুচি পাল্‌টে যাচ্ছে সেটা লক্ষ্য করেছ। সকল মানুষেরই লক্ষ্য আনন্দ। আনন্দের সন্ধানে ছুটছে সবাই দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে। রুচির চমৎকারিত্বের প্রতিও মানুষের একটি মোহ আছে।

ঠিকই বলেছ: বই পড়ে আনন্দ, গান গেয়ে আনন্দ, নেচে আনন্দ, হেসে আনন্দ, মদ খেয়ে আনন্দ। রুচি, রুচিই হচ্ছে প্রশ্ন।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে হুংকার দিয়ে ইলীনা বলে: তুমি ভীষণ ভালগার।

কেন?

সব কথার সঙ্গেই একটু অশ্লীলতা জুড়ে দাও বলে।

মূর্তিমান অশ্লীলতার মুখে এ-কি বাণী শুনি আজ।

ইলীনা হেসে বলে: যাক্ গে বাপু, তুমি খুব ঝগড়া করতে জান—সে কথা আমি জানি।

ঝগড়া নয় লীনা। জীবনে শান্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়? থেকে থেকে আমার দার্শনিক সোপেনহাওয়েরকে—মনে পড়ে। তিনি বলেছেন: জীবন দুঃখময়, কারণ এ-জীবন হচ্ছে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। স্থলে জলে আকাশে বাতাসে সব জায়গাতেই আমরা দেখতে পাই সবল দুর্বলকে গ্রাস করতে চায়।

ঝগড়া থেকে এবারে বক্তৃতা সুরু করলে যে।

কাজ হয়ত অনেক করতে পারতুম—কিন্তু প্রপার প্ল্যাটফরম্ পেলাম না, সেইটেই—দুঃখের।

সবসময় আমার এ দুঃখবাদ ভাল লাগে না। দুঃখবাদ নিয়েই শুধু দার্শনিকতা সাজে।

তুমি সোপেনহাওয়ারের পরের কথাটুকু শুনলেই না। একটুকু কষ্ট করে শোন: এই ধর আমাদের বিবাহিত জীবনই কি সুখের, অথচ কৌমারাবস্থাও দুঃখের। একা ভাল থাকি না আবার সকলে মিলে একসঙ্গে থাকতে গেলেও বিশ্রী লাগে। ঘনিয়ে বসতে চাই, বেশী ঘনিয়ে বসলে পরস্পরের গায়ে কাঁটা ফোটে। আবার দূরে সরে যাও মন তখন কেমন কেমন করে—ইচ্ছে করে আবার ঘনিয়ে বসি।

এজন্যই পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আমি খুব পছন্দ করি।

পছন্দ কর ঠিক। কিন্তু আয়ের পথ কোথায়? আমাদের মাথাপিছু বছরে আয় কত? তোমার বাবার মত ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের লোক নন সবাই।

সেকথা আমি বুঝি। যে যত বুদ্ধিমান তার তত বেদনা বেশী। দার্শনিকের একথা ভুলে যাও কেন? কিন্তু সোপেনহাওয়ের তো নারী বিদ্বেষী ছিলেন—ওঁর এত ভক্ত হলে ভালবাসবে কি করে?

'ভালবাসা' মানুষের একটা মস্ত বড় আবিষ্কার। আমেরিকা আবিষ্কারের চাইতেও অনেক বড়। দার্শনিক প্রবর তো 'ভালবাসা' সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ করে বসেছেন। সামান্য কিছুদিনের জন্য যৌবনে নারীকে প্রকৃতি অপূর্ব রূপ-লাবণ্যে সাজিয়ে তোলে কেন? এই যে রূপের ডালি এ-কিসের জন্য? শুধু সৃষ্টিতত্ত্ব রক্ষার জন্য। যেমনি কাজ শেষ হলো অমনি প্রকৃতি দেবী বললেন: আর তো তোমার রূপে প্রয়োজন নেই। প্রজাবৃদ্ধির কাজ শেষ হয়েছে। এবারে পুরুষকে ভোলাবার তোমার মোহিনীশক্তি আমি কেড়ে নেবো।

বাব্বাঃ, কি বিজাতীয় বিদ্বেষ! এতো চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে জীবনে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না।

তার পরের কথাটা শোন: পুরুষকে কিন্তু নারীর চাইতে বেশী সুন্দর বলেছেন।

সেতো বংকিমবাবুও বলেছেন। ময়ূর-ময়ূরী এবং আরও অন্যান্য পশুর সঙ্গে তুলনা করে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছেন। মানুষ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জাত। সুতরাং শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে গিয়ে ওই জাতীয় তুলনা আমার ভাল লাগেনি।

সোপেনহাওয়ের পুরুষের শ্রেষ্ঠতা বিচার করতে গিয়ে মানুষকে পশুর সঙ্গে তুলনা করেননি বটে কিন্তু বলেছেন মোক্ষম কথা। নারীকে যে সুন্দর বলে তাকে অন্ধ বলা চলে। কারণ নারীর চেয়ে পুরুষ অনেক সুন্দর। সে-ই নারীকে সুন্দর বলে যার বিচারবুদ্ধি যৌনতাড়নায় লোপ পেয়েছে। মনোমোহিনী কি ওই হ্রস্বকার, ক্ষীণস্কন্ধ, স্ফীতশ্রেণী ক্ষুদ্রপদের জীব? কিছুতেই নয়।

কিন্তু তোমার কি মনে হয়? তোমারও কি ওই মত? সত্যি করে প্রাণের কথাটা বল তো আজ?

কথাটা তলিয়ে দেখলে সত্যি বলেই তো মনে হয়। পতঙ্গকে যেমন ফুলের বর্ণ গন্ধ আমন্ত্রণ জানায়—নারী পুরুষের সম্বন্ধটাও হুবহু সেই রকমের। বংশ-রক্ষা। সঙ্গীত বল, কাব্য বল, ললিতকলা বল—এতে কোন অধিকার মেয়েদের নেই—এ শুধু পুরুষের চিত্ত হরণের জন্য।

একটা কথা ভুলে যাও কেন—তত্ত্ব নিয়ে তুমি যতই মাথা ঘামাও—ও তত্ত্ব মেনে নিলে সৃষ্টি লোপ পাবে—পৃথিবী রসাতলে যাবে। আর তা ছাড়া সকল মানুষেরই মেণ্টাল স্ফীয়ার যদি অত উঁচুতে ওঠে, তবে রাম রাজত্ব আসতে আর দেরী নেই। ষ্টেট্ বা গভর্ণমেণ্টেরও আর প্রয়োজন হবে না—সবাই সাধু বনে যাবে যে।

তাই তো চাই। দি গ্রেটেষ্ট বুন অফ্ অল ইজ্ ডেথ। নির্বাণ মৃত্যুই যে শ্রেয়—তা উপলব্ধি করতে হবে।

মনুষ্য জীবনের অর্থ কি? নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। মৃত্যু যদি জীবনকে গ্রাস করে তাহলে আর বাকী রইল কি! মৃত্যুর সঙ্গে সব কিছুরই

পরিসমাপ্তি আসবে। মৃত্যুর পর নির্বাণ হলো, না আবার নয়া জীবন আরম্ভ হলো—সেই ফাঁকা বুলি দিয়ে বর্তমানকে ঢাকবে কি করে?

স্থূল আনন্দকে বর্জন করতে হবে। সেইটেই আসল কথা।

তাহলে বলে যাও। দুদিনের জীবন আনন্দ করে যাও। ইট, ড্রিংক এণ্ড বি মেরী! জীবনে আনন্দকে খুঁজে বের করাও একটা আর্ট। তোমার বুড়িয়ে যাওয়া রোগ ধরেছে। দিনে যদি আধ ঘণ্টাও হাসতে পার তাহলে দেখবে জীবনীশক্তি বেড়ে যাবে, দীর্ঘায়ু হবে।

তোমার কথাগুলি হয়ত কতকাংশে ঠিক। কিন্তু মেণ্টালি ডেভালাপড্ হলে স্থূল আনন্দ আর বাইরের আড়ম্বরের জমকাল নেশা কমে যাবে। নিজের মনের মধ্যেই যখন আনন্দের খনির সন্ধান পাবে তখন আর বাইরের হুল্লোড়ের প্রয়োজন হবে না।

'হেল ইজ-এ প্লেস হোয়ার দেয়ার ইজ্ ইটারনাল হলি ডে।' সেখানে হয়ত গবেষণা সম্ভব। কিন্তু এই ফুল্ল কুসুমিত বসুন্ধরা রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ দিয়ে যখন আমন্ত্রণ জানায় তখন শুষ্ক কঠোপনিষদ্ শুধু বিরক্তিজনক নয়, ধিক্কারজনকও।

এজন্যই 'দি লেস্ উই হ্যাভ টু ডু উইথ উইমেন দি বেটার। জীবনযাত্রা অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়ে যায়। তোমাদের যে মনীষার স্ফূরণ হয় না—কেন হয় না জান? অন্তর্মুখী চিন্তাধারার জন্যই হয় না।' ভারত নারীকে মাতৃরূপে কল্পনা করেছে। কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ সকলেই দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে প্রেমের সর্বগ্রাসী দাবীর সঙ্গে যদি মঙ্গলের যোগ না থাকে তবে সে প্রেমে ধ্বংস অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে দুভাগে ভাগ করেছেন। একটি প্রিয়ারূপে আর একটি জননী-রূপে। যেসব নারী পাশ্চাত্য দীক্ষায় দীক্ষিত তাদের ভেতর প্রিয়ার ভাগটা বেশী আর সনাতনী শিক্ষায় শিক্ষিত যারা তাদের ভেতর মায়ের ভাগটা বেশী।

সখি, সবই তো বোঝ। 'ফুল খেলার দিন নয় অদ্য।' এই পিছিয়ে পড়া দেশে গঠনমূলক কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে শিশুরাষ্ট্রে দ্রুত পরিবর্তন অসম্ভব। ভারতীয় ঐতিহ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর আদর্শের

উদাহরণ আছে। তাকে রূপ দেবে কে? ব্যক্তিগত তহবিল ফাঁপানর দিকেই যদি সকলের লক্ষ্য থাকে তাহলে কোন সৎ কাজ সম্ভব নয়।

ভারতকে যদি আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে হয়, তবে নারীকে অস্বীকার করে তা পাবে না। নারী পুরুষের সহধর্মিনী এবং সহকর্মিনীও বটে। নারী পুরুষের সামঞ্জস্য বিধান যেখানে সম্ভব হয় সেখানেই বড় কাজ গ'ড়ে ওঠে। নইলে 'প্রকৃতির গুপ্তচর' বৃত্তি করলে কোন কিছু মহৎ কাজ সম্ভব নয়। নারী একাধারে যেমন 'উর্বশী তেমন কল্যাণীও বটে।'

তোমাদের গ্র্যামারকে তো অস্বীকার করছি নে। সে শুধু ওই বিশেষ সময়ের বিশেষ কাজের জন্য।

তুমি একটি পণ্ডিত-মূর্খ। সব সত্যই কি সব সময় প্রকাশ করা চলে?

বিষয়টি তর্কের অবকাশ রাখে।

আর তর্ক নয়। এবারে উঠতে হবে। আমি আগামী পরশু জামসেদপুর যাব। জয়তী আর জয়ন্ত যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে। দুটি ভাই-বোনে মিলে বেশ জমিয়ে তুলেছে। দেখে আসি তাদের কাজকর্ম।

কি কাজকর্ম করেন এঁরা?

জয়তী একটি মেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আর জয়ন্ত সেখানে ডাক্তার।

বেশ তো। আমিও ঘুরে আসি পাঁচদোনা।

সে আবার কোথায়?

বাংলা দেশেরই একটা গণ্ডগ্রাম। 'ব্রীদস্ দেয়ার দি ম্যান উইথ সোল সো ডেড্ হু নেভার টু হিমসেলফ্ হ্যাথ সেইড্—দ্যাট দিস্ ইজ্ মাই ওউন মাই নেটিভ ল্যাণ্ড।'

অর্থাৎ তোমার মাদারল্যাণ্ড।

মাদারল্যাণ্ড তো আমার সবই। দেশে দেশে মোর ঘর আছে।

তবে সেখানে কি?

সমাজকর্মীদের ফার্ম দেখবো। আর যদি ভাল লাগে সেখানেই থেকে যাবো। মাঝে মাঝে অবশ্যি নিজের অভিজ্ঞতার কথা যদি সময় পাই লিখে রাখবো।

তাহলে তোমার ললিতকলা মন্দিরমের কাজ শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেবে নাকি?

না ছাড়বো না। বোধহয় ছাড়তে পারবো না। যোগাযোগ থাকবে নিশ্চয়। তবে আমার মনে হয় শহরে বসে ললিতকলা নিয়ে মন কষাকষি না করে পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত মূর্খ দরিদ্র মানুষদের মধ্যে কিঞ্চিৎ শিক্ষার আলো যদি দেওয়া যায়—তবে অনেক বেশী কাজ করা হবে।

একেবারে গো ব্যাক টু ভিলেজ ক্যাম্পেইন। কিন্তু তুমি কি মনে কর এইসব অশিক্ষিত মূর্খ লোকদের সঙ্গে পেরে উঠবে? কিছুতেই পারবে না। ওদের যদি একটু সহানুভূতি দেখাও ওরা তোমার মাথায় চেপে বসবে। শিক্ষা চাই একথা অস্বীকার করি নে—কিন্তু আসল সমস্যা সেখানে নয়। গোড়ার কথা পরিবার পরিকল্পনা করা। সকল আনন্দের মূল আধারই হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণে।

ওরা ওবুঝ বলেই তো সব কথা ওদের শিক্ষার ভেতর দিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে।

কিন্তু চিরন্তনী রাধার উপায় কি? তাকে কার কাছে রেখে গেলে?

প্রয়োজন হলে জানাবে। শ্রীকৃষ্ণ আবার তার বাঁশীতে সুর যোজনা করবে।

চার

জীবন নিয়ে রোমান্‌স্‌ করবার, বিলাসিতা করবার একটা বয়স আছে। মানুষের এই ক্ষণিক স্বল্পস্থায়ী জীবনে ওই বিশেষ বয়সের একটা স্বতন্ত্র অহংকারও আছে। উদ্দাম কর্মক্ষমতা এবং অমিত বল-বীর্য মানুষকে দিশাহারা করে দেয়। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে এই নতুন স্রোতের জোয়ারের সঙ্গে যারা একটা সামঞ্জস্য বিধান করে নিতে পারে, তারাই প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যায়।

জয়তী জামসেদপুরের উপকণ্ঠে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নিজেই প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেছে। সেবাব্রতের একটা মহান আদর্শ আছে ওর মনে মনে।

নতুন ধরণের স্কুল। উন্মুক্ত প্রন্তরের বৃক্ষের নীচে বসে ওদের ক্লাশ। অনেকটা শান্তিনিকেতনের ধরণে। বদ্ধঘরের গুমোট আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে ছাত্রীরা যাতে বিরাট উদার আকাশের নিঃসীম নীলিমায় প্রকৃতির যথার্থ প্রশান্তির মাঝে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে—এইটেই হলো আসল উদ্দেশ্য। কিছু আগে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুও দালান কোঠার পরিবর্তে প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে যাতে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা পায় সে সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এ-মন্তব্যের পর জাতীয় কর্মপন্থা আরও বেশী নৈতিক বল পায়।

নিজের আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্য জয়তী উঠে পড়ে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে আপন মনেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে কিছুটা ধারণা জন্মেছিল যে তার কাজে সাফল্য অনিবার্য। তাই ভূতপূর্ব সহপাঠিনী ইলীনাকে তার কাজ দেখে যাবার নিমন্ত্রণ করেছিল।

ইলীনা দুদিন হয় জামসেদপুর এসেছে।

জয়তী নিজে গিয়ে ষ্টেশন থেকে বান্ধবীকে নিয়ে এসেছে। ইলীনা জয়তীর আদর যত্নে অবিভূত।

একবার তো বলেই ফেললে : ইউ আর ট্রায়িং টু বি ফরমাল।

জয়তী বলে : ফরমালিটির তুই কি দেখলি? তোরা কলকাতার লোক তোদের এসব জায়গায় এসে পদে পদে অসুবিধে।

ইলীনা বলে : কেন? আমি তো আরামেই আছি। এত ধরাবাঁধা নিয়মে সহজ হতে কেমন বাধ বাধ লাগে।

তোর জন্য আমি বেশী কিছু করিনি। রোজকার জন্য যা করি, তার বেশী একটুও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করিনি।

হ্যাঁ রে, একটা সত্যি কথা বল্ দেখি। কলকাতায় শুনলাম জয়ন্ত-দা নাকি বিয়ে করেছেন?

সংক্ষেপে 'হ্যাঁ' বলে জয়তী।

মেয়ে কোথাকার?

দিল্লীর কনট প্লেসের মেয়ে। ভীষণ আপষ্টার্ট।

তাই নাকি? নাম কি রে? দেখি চিনি কিনা।

নাম সুতপা বানার্জী।

বাব্বাঃ, এ যে দেখছি ফিলম্ ষ্টারের নাম। তা বৌদি কেমন হলো?

বৌদি বেশ ভাল হয়েছে। যেমনি চেহারা তেমনি মিষ্টি ব্যবহার।

বৌদি কোথায়?

দিল্লীতে আছেন।

জয়ন্তদা দেখছি সকাল ছ'টায় বেরিয়ে যান, আর রাত এগারোটায় ফেরেন। বাড়ীর লোকের দেখা পাওয়াই ভার।

দেখা পাবি রোববার। রোববারে সকাল দশটা পর্যন্ত বিশ্রাম। বেরুলেও দশটার পর বাইরে যান।

কি এত কাজ?

দুশো বছরের বিদেশী শাসনে রোগ আর অশিক্ষায় দেশ ছেয়ে গেছে। বিজ্ঞানের এই স্বর্ণ-যুগেও মধ্যযুগীয় অনগ্রসরতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কাজের কি অভাব আছে রে!

কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনের ভাল স্কীমও তো আমরা পাচ্ছি নে।

ধীরে ধীরে হবে, চট করে এসব কাজ হয় না। এবার তোর প্রেমিকটির খবর বল! আমরা তো দূর থেকে অনেক কিছু অতিরঞ্জিত ভাবে শুনি।

ইলীনা হেসে বলে : কি শুনিস্, বল দেখি ?

কি বিষয়ে শুনতে চাস্, বল ?

তোদের প্রেমের বিষয়।

প্রেম কি চোখে দেখা যায় যে সে বিষয়ে বলবো।

চোখে দেখা যায় না সেকথা আমি জানি। তোর অনুভূতির কথা শুনতে চাই ?

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয় ?
সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।

হেসে বাঁচিনে। তোর পেটে পেটে এতো !

বয়স তো কম হলো না। নিছক সাত্ত্বিক প্রেম তাও একটু করতে দিবি নে। তোরা বড় নিষ্ঠুর।

প্রেম করতে দেবো না সেকথা বলছিনে। বলছি : সামাজিক কষ্টিপাথরে শোধন করে নিয়ে যত ইচ্ছে প্রেম কর কেউ কিছু বলবে না।

শোধন করতে গেলে প্রেমের মৃত্যু ঘটে জানিস।

সমাজকে অস্বীকার করে যে প্রেম, তাকে বলে স্বৈরাচার।

পরকীয়া তো চিরকালই অবৈধ ভাই।

অবৈধ না হলে প্রেম জমজমাট হয় না।

তোর মাথাটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতীয় নারী যে ঐতিহ্যের সুরে বাঁধা তাকে তুই এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিবি এতো আর হতে পারে না। সামাজিক নিয়ম-কানুনের বিধান একদিনে জন্মলাভ করেনি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে এর জন্ম।

বাঁধা বুলিতে আটকা পড়লে আগামী দিনের জন্য নতুন সড়ক তৈরী করবে কে ?

নতুনের রিসার্চ করা মানে উশৃঙ্খলতা নয়।

উশৃঙ্খল হতে তোকে বলছে কে ? প্রাচীনপন্থীরা নতুনকে কোনদিন সম্মান দেয়নি। অতীতের প্রতি মোহ তাদের শিরায় মজ্জায়।

তাকে তুই আমল দিবি নে কেন ? তার মধ্যে যদি কোন শুভ ইঙ্গিত থাকে।

তারপরে যোগ করে দাও : বয়স হলে বুঝতে পারবি।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।

তোকে একটা কথা জিগগেস করি। উত্তর দিতে পারিস কিনা চেষ্টা করে দেখ। বিজ্ঞানের তো এত জয়জয়াকার। মৃত্যুর রিসার্চ করে বৈজ্ঞানিকেরা আজও নতুন তথ্যের আলোকসম্পাত করতে পেরেছেন কি? পারেন নি? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে তাহলে এ জীবন এত বিধিনিষেধ দিয়ে বেঁধে লাভ কি?

তুই এত পড়াশুনা করেও এমনি একটা মতবাদ গড়ে তুলবি সেকথা ভাবিনি। জগতের সকল মহাপুরুষই তো মৃত্যুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

ওইটেই বুঝতে পারিনি। যুক্তির রাজ্যে হ্যালুসিনেশনের স্থান নেই।

আমাদের কবি বলেছেন: মরণ শূন্যগর্ভ নয়। মৃত্যুর মাঝেই আছে অমৃতের উৎস। প্রেমকেও অখণ্ডরূপে বুঝতে হলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বোঝা যায়। বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনেই মিলন সম্পূর্ণ হয়।

এসব ফাঁকা বুলি। স্কুল কলেজের বক্তৃতায় চলে ভাল। কিন্তু জীবন তোমার চেয়েও গভীর।

স্কুল-কলেজ ঘেঁষা কথা হলে কি সে কথার কোন মূল্য নেই। কবির শেষ কথাটুকু তো শুনলি নে: জীবন অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তো জীবনের স্নেহ ভালবাসার বিনাশ হয় না। যা ছিল ব্যক্তিত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ তা বিশ্বের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, মানবজীবনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

বড্ড বেশী পোয়েটিক হয়ে যাচ্ছে। জড়বাদীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটু বিচার করতে হবে। অতীন্দ্রিয় প্রেম আর অতিমানস জগতের কথা সকলের জন্য নয়।

> 'মনে ভাবি, মুক্তি বুঝি কাছে এলো—
> বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত।'

এই যে মুক্তি বা স্বাস্থ্যলাভের জন্য হাহাকার একেই বলে জীবনস্পন্দন। তাই আধুনিক কবি বলেছেন:

> 'রবীন্দ্র ঠাকুর শুধু আজি হতে শতবর্ষ পরে
> কবিরূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
> প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবন-ঋতু,
> সকল শোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা,
> শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।'

আধুনিক কবি ঠিকই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ নমস্য ব্যক্তি। তিনি পৃথিবীর

গৌরব। তাঁর মতন মানুষ যখন তখন বার বার পৃথিবীতে আসেন না। কিন্তু আমি যে যুক্তি ছাড়া কোন কথা মানতে রাজী নই।

ভুলে যাস নে তুই নারী। হৃদয়াবেগ নিয়েই তোর কারবার।

তবুও।

কিন্তু যুক্তির উর্ধ্বেও একটা রাজ্য আছে যা ভাষ্য করে পাওয়া যায় না : 'দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন এণ্ড আর্থ' ইত্যাদি।

ওকেই বলে মায়ার খেলা।

আচ্ছা বলতো তোদের ক্রীড্ কি, প্রিন্সিপ্‌ল্ কি? কোন্ পথে চলতে চাস্ তোরা? কোন্ নতুন সম্বন্ধ আনতে চাস্ নর-নারীর মাঝখানে?

কেন ভালবাসার ওপরেই দাঁড় করাতে চাই।

তবে বন্ধনকে মেনে নিতে এত দ্বিধা ও সংকোচ কেন? আর এ কথাও বলি বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদের কুক্ষিগত হয়েছিস নাকি?

গতকাল রাতে রেডিওতে 'চার অধ্যায়' নাটক শুনে বুঝি তোর মনে হলো আমি কোন বিশেষ দলগত। পাগল, দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। সে ব্রহ্মানন্দ বা মাষ্টারমশাই নেই আর ও জাতীয় বিপ্লবী অগ্নিযুগের মানুষও নেই। একটা মানুষকে নিয়ে চিরকালের জন্য ঘর বাঁধবি অথচ বাজিয়ে নিবিনে।

তাহলে বল্ এগুলো শিকার ধরবার ছলাকলা।

একথা বললে একটু ভালগান শোনাবে। বরং বলতে পারিস মন বোঝাবুঝির পালা চলেছে বা বৈষ্ণবী ভাষায় পূর্বরাগ বলা চলে।

কিন্তু পূর্বরাগকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে কোন লাভ আছে? শীগ্‌গিরই মন কষাকষি মিটিয়ে ফেল। নইলে কাল রেডিওতে শুনলি তো এলা'র মত হাহাকার করতে হবে।

সত্যি কাল এলার পার্ট যে মেয়েটি করেছে—তাকে এক কথায় বলা চলে সুপার্ব বা অপূর্ব!

তাহলে তোর নাটকটা ভাল লেগেছে?

তৎকালীন ক্রিটিকরা অবশ্য এই বইটিকেও উদ্দেশ্যমূলক বলে প্রোপাগাণ্ডা লিটারেচারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু অতনু-এলার প্রেমে যে ফল্গুধারা বয়ে চলেছিল ওইটাই ছিল উপন্যাসের প্রাণ। বড় মিঠে প্রেমের গল্প।

বিরোধ বা বাধার মধ্যে দিয়ে না গেলে প্রেমে জমাট বাঁধবে না।

আমার সবচেয়ে কি ভাল লেগেছে জানিস্‌: ওই যে মেয়েটির কাতর গোঙানি ও সকরুণ ডাক: 'অন্তু, অন্তু আমি যে তোমার·······আমাকে তুমি নাও·······অন্তু রাজা আমার, তুমি আমাকে নিজে হাতে মার। সে মরণেও আমার সুখ'।—কি বিনিয়ে বিনিয়ে মেয়েটি অভিনয় করেছে। বাহাদুরীর তারিফ করতে হয়।

মানুষ তো নিজের প্রেম নিয়ে সুখী নয় তাই পরের প্রেম নিয়েও তার মনোবিলাস। সাধারণ মানুষ নাটক সিনেমায় আর্ট বা এ্যাকশন ষ্টাডি করতে যায় না। তারা যায় প্রেমের সুর খুঁজতে। যদি নিজের জীবনের সঙ্গে মেলে, তাহলে খুশী হয়—মনের আনন্দে হাততালি দেয়।

কিন্তু তোর কথা তো কিছু বললি নে। তুই বড্ড বেশী রিজার্ভ। পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের ছেলেগুলো যখন তোর পিছু পিছু ঘুরঘুর করতো সামান্য একটু কথা বলবার জন্যে—তুই ফিরেও তাকাতিস্ না—মহারাণী দৃপ্ত ভঙ্গীতে চলে যেতো হনহনিয়ে লাইব্রেরীর দিকে—সব আমার মনে পড়ছে রে।

জীবনের ওই তো মধুমাস। বাইরে কথা না বললেও মন তো নিরন্তর কথা কয়ে গেছে। জীবনের সেদিন আর ফিরে পাব না।

এখন আক্ষেপ করবি বৈ কি। তখন আমরা ছেলেদের সঙ্গে মিশি বলে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করতিস্—সবই মনে আছে রে। কিন্তু সেদিন মিলফোর্ড সাহেব বায়রণ পড়াতে এসে বললেন: বায়রণ হ্যাড সিকস্‌টি থ্রি লাভ এ্যাফেয়ার্স। মেয়েদের বেঞ্চগুলিতে একটা হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল। তাইতো গুণে গুণে একটি করে প্রেম—হিসেব রাখাও মুস্কিল—বোধ হয় ডায়েরী রাখতেন।

সেই সুন্দর রমণীলোভন ছেলেটি, আই মীন্ অশোক, কি করে রে এখন ?

কেন লোভ আছে নাকি ? বলিস্ তো দেখি চেষ্টা করে। বোধ হয় কোন কলেজের অধ্যাপক হবে।

শুনেচি তো ঘোর নারী বিদ্বেষী।

নারী বিদ্বেষী না হয়ে কি করবে ? মেয়েগুলোও হয়েছে হ্যাংলা, নির্বিচারে আত্মদান করে বসতে চায়। সুন্দর ছেলেদেরও মাথা গরম হয়ে যায় বৈ

কি। অযাচিত ও অপ্রার্থিত কত প্রার্থনা আর মঞ্জুর করতে পারে একটা মানুষ। তাঁর ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে।

সেদিন কি একটা কাগজে ওঁর একটা লেখা দেখেছিলুম। প্রবন্ধটির প্রতি ছত্রে ছত্রে নারীকে অস্বীকার করবার একটা দুর্জয় লোভ ফুটে উঠেছে। মানুষের ইচ্ছা আর কামনাকেই পরমাশক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন ঃ এই যে জিজীবিষা অর্থাৎ বেঁচে থাকা এটাই মানুষের পরম ও চরম সত্তা। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু মানুষমাত্রই বাঁচতে চায়। তাই জীবের প্রধান শত্রু মৃত্যু। সকল প্রাণীই তাই যৌবনে সৃষ্টির জন্য উন্মুখ। কারণ মৃত্যুর পর সে বেঁচে থাকবে তার সন্তানের মধ্যে। নারীর মাতৃত্ব যে গভীর অর্থজ্ঞাপক তাকে তিনি বানচাল করে দিয়েছেন।

এতো তিনি, উনি, ওঁর বলে উল্লেখ করছিস্ কেন? আমরা তো অশোক বলেই ডাকতুম। তোর অবস্থা ত বিশেষ সুবিধার নয়। অশোককে জানাতে হয় যে তোমার নীরব ভক্ত গোপনে পূজার ফুল নিয়ে বসে আছেন।

তোকে আর ফাজলামি করতে হবে না। তুই কিন্তু একটু সিরিয়াস্ হতে শিখলি নে, সেই ছেলেমানুষটিই আছিস। কথার গুরুত্বকে হালকা করে দিতে পারলেই তোর উল্লাস।

তোর মত দিন রাত গম্ভীর হয়ে রাশভারী চালে চলে জীবনের গভীর অর্থ বের করতেও মন চায় না। দুদিনের জীবন হেসে খেলে নাও। মৃত্যুর পর কোথায় তুমি যাবে, সে কি তুমি জান? না সে-বিষয়ে সঠিক সংজ্ঞা কেউ দিতে পেরেছেন?

মনুষ্যজীবনের যে একটি গভীর অর্থ আছে সেকথা অস্বীকার করবার নয়।

কি অর্থ আছে তুই বল? আমাদের দেশের কথাই ধর, শতকরা আশীটি লোক মূর্খ। অবশ্য তাদের ভোট দেবার অধিকার জন্মেছে।

ভোট দিয়েই তারা খালাস। রাষ্ট্রের শুভাশুভের কথা তারা চিন্তাও করেনা, বুঝতেও চায়না আর পারেও না। এই যদি গণতন্ত্রের নমুনা হয় তবে তো চমৎকার ব্যবস্থা। শিক্ষা কোথায়? শিক্ষার আলো জনচিত্তে ছড়িয়ে পড়লে যদি তারা একটু ভাল খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে পারে তবেই কি বলব তাদের মনুষ্যজীবন সার্থক হলো! ঠিক তাও তো নয়। তবে কি?

তুই বলতে চাস্ কি?

বলতে যে কি চাই সেটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি না দেখেই তোরা বুঝতে চাস্‌নে। তোরা মানুষকে নিয়ে রঙীন স্বপ্নের জাল বুনছিস। বিজ্ঞান তোদের কত উঁচুতে নিয়ে গেছে তাই না? কিন্তু এ্যাটম্ বোমা, স্পুটনিক বিজ্ঞানের এই চরম আবিষ্কার নিয়ে তো একটা অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলছে। কে বড়, তাই নিয়ে কতই না গবেষণা! আমি আমার দেশে বসেই এই মুহূর্তে তোমাকে ধুলিস্যাৎ করে দিতে পারি তোমার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সকল গর্বের। কিন্তু সার্ব্বভৌম কল্যাণ বুদ্ধি কই? যা মানুষের সত্যিকারের গর্বের, দম্ভের বিষয় বস্তু।

বাবাঃ, তুই তো দেখছি বৃহত্তর জগৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস। কিন্তু নিজের দেশই যে ঠিক হলো না?

এ্যাটম্ স্পুটেনিকের কথা ছেড়েই দিনুম। সাধারণ মানুষ তার সন্ধান জানে না। কিন্তু রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিসনের যুগে সমগ্র মানবগোষ্ঠী যে একটি ছোট্ট পরিবারে পরিণত হয়েছে সেকথা তো বুঝিস।

তাতো সত্যিই। আমি তোমার দেশের কথা জানি, তুমি আমার দেশের কথা জনে। এসব জিনিস সাধারণ পর্যায়ে এসে গেছে। রেডিও, সিনেমা, ও টেলিভিসন আজ সাধারণ মানুষের সম্পত্তি।

বেশ, এই প্রসঙ্গে ভেবে দেখ আমাদের দেশের কথা, আমরা 'তুলসী তলার প্রদীপ' নিয়ে এখনও সাহিত্য রচনা করছি। অবহেলিত নারীত্ব পদে পদে লাঞ্ছিত, তবুও আমাদের চৈতন্য নেই। আমাদের ঘরে খাবার নেই। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির জন্য চুপ করে বসে থাকি।

এজন্যই চাই শিক্ষা। কিন্তু কোথায় সে শিক্ষা ব্যবস্থা?

টাকা নেই। টাকা তোমাদের কোনদিন থাকবেও না বাপু। কোত্থেকে টাকা আসবে জানতেও চাই নে। আমরা শিক্ষার আলো চাই, মুক্তি চাই।

এমন সময় জয়ন্ত এসে ঘরে প্রবেশ করে। জয়ন্তই কথা বলে: কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তোমাদের?

ইলীনা বলে: তুমি তো বেশ মানুষ জয়ন্তদা। দুদিন ধরে তোমাদের বাড়িতে আমি অতিথি অথচ তোমার দেখাই পেলুম না।

কেন জয়ন্তী বুঝি তোমার ঠিকমত পরিচর্যা করতে পারছে না? কি রে

জয়ন্তী—এই বলে জয়ন্তীকে লক্ষ্য করে বলে: তোর বন্ধুর আতিথেয়তায় কোথায় যেন ত্রুটী ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে—নইলে এই অভিমান কেন?

জয়ন্তীকে তুমি কেন দোষারোপ করছ? জয়ন্তীর কাজ জয়ন্তী করবে, তোমার কাজ তুমি করবে। একের কাজ অপরকে দিয়ে করান চলে না।

সে কথা ঠিক। তোমার কথায় কোন ভুল নেই। এ-দুদিন আমি বিশেষ কাজে আটকা পড়েছিলুম। আমাদের এখানে একটা বস্তীতে এমন কলেরার হিড়িক পড়েছে যে বস্তীকে বস্তী উজাড় হবার জোগাড় হয়েছে, কাজেই আর বাড়ীতে আসবার সময় পাই নি।

কণ্ঠে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ইলীনা বলে: কলেরা লেগেছে আর সেই ভীষণ এপিডেমিক এরিয়ায় তুমি নিশ্চিন্তে দুদিন কাটিয়ে দিলে। বাড়িতে বোনটি একলা আছে তার কথা একবার ভাবলেও না!

জয়ন্তী শিক্ষিতা মেয়ে, সে নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে পারবে। আর তাছাড়া সমাজ কর্মীদের এসব আপদ বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে ওদের কে দেখা শুনা করবে, বল?

কিন্তু তুমি তো আর এখন একলাটি নও? তোমার জীবনের একটা স্বতন্ত্র মূল্য হয়েছে।

কেন নতুন মূল্য যাচাই এর আবার কি হলো?

জয়ন্তী মুখ টিপে হেসে খাবারের ব্যবস্থা করি গে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ইলীনা আরও স্পষ্টতর হয়ে বলে: বৌদির কথা বলছিলুম।

কোথায় বৌদি?

কেন দিল্লীতে যে বৌদি আছেন।

সে কি কথা?

কেন দিল্লীতে তুমি বিয়ে করনি?

এ খবরটা আবার তুমি কোথায় পেলে?

কেন জয়ন্তীর কাছে আমি সব শুনেছি। তা বিয়ে করেছ এতে আর লজ্জার কি আছে!

বিয়ে করেছি, লজ্জার কি আছে! বুঝেছি জয়ন্তী, ওই দুষ্টু বাঁদরটা তোমাকে বলেছে বুঝি।

হাঁ, ওর কাছেই সব শুনলুম।

তোমাকে খুবই—বি ফুলড্ করেছে। কারণ সম্বন্ধটা তোমাদের তাই যে। বিয়ের মত ভাববিলাস করবার সময় কোথায়?

ভারী চাল দিয়েছে তো। দিল্লীর কণ্ট প্লেসের মেয়ে। ভীষণ আপষ্টার্ট। আরো কত কি? সেজন্যই বোধ হয় খাবার দেবার ছুতো করে উঠে গেল।

চলো এবারে খাওয়া দাওয়া সারা যাক্

খাবার টেবিলে বসে টুকরো টুকরো কথাবার্তা চলতে থাকে।

জয়ন্ত বলে : ইলীনাকে একবার কারখানাটা দেখবার ব্যবস্থা করে দাও।

জয়তী বলে : আমি আজ সকালে ডি-সুজাকে ফোন করেছিলুম—আগামী পরশুদিন দেখতে যাবার কথা বলেছেন।

জয়ন্ত বলে : বুঝলে ইলীনা, জামসেদপুরে লোহার কারখানা ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই। ষ্টীল ফ্রেমের শহর সবকিছু ইস্পাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

ইলীনা বলে : আমি কিন্তু দু'দিনেই তোমাদের এই পরিবেশটাকে ভালবেসে ফেলেছি।

জয়ন্ত বলে : কলকাতার জনারণ্য থেকে এসেছ, ফাঁকা জায়গা প্রথম প্রথম ভাল লাগবে বৈ কি! দুদিন থাক, কিছুদিনের মধ্যেই তোমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে। না পাবে সোসাইটি, না পাবে পার্টি, না সঙ্গী-সাথী। মিশবে কার সঙ্গে? কথা বলবে কার সঙ্গে?

কেন তোমরা মিশছ কার সঙ্গে? তোমাদের দিন চলে কি করে?

আমাদের কথা ছেড়ে দাও। আমরা জংলীলোক। বুনো লোক নিয়ে আমাদের কারবার।

বুনো মানুষ আমারও খুব ভাল লাগে। মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাই তাদের চরিত্রে।

'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ-নগর।'—কাব্যে শোনায় ভাল। কিন্তু বাস্তবের সংস্পর্শে এলে তোমার গা ঘিন্ ঘিন্ করবে।

সাহিত্যিকের কাজ মানুষকে আনন্দ দান করা। তাই মনে হয়

সমাজসেবীও কি এমনিতেই সেবাব্রত গ্রহণ করেন। না, তাঁর যাত্রাও মনের আনন্দর সন্ধানেই। নিজের এবং অপরের মনে আনন্দ জাগিয়ে তোলাই তার কাজ।

তোমার কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু আসলে এটা রুচির প্রশ্ন। তোমরা ছেলেবেলা থেকে যে ভাবে মানুষ তাতে করে এ-পরিবেশ তোমাদের সহ্য হবে না।

সেকথা আমাকে বলো না জয়ন্তদা। পোষ্টগ্রাজুয়েটে পড়বার সময় জয়তী আমাকে কিছুটা দেখেছে। তাছাড়া মেয়েদের যে-কোন পরিবেশকে মানিয়ে নেবার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। নইলে মেয়েরা বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর ঘর করতে যেতে পারতো না।

জয়তী এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে মুখ খুললে : ইলীনা কি বলতে চাইছিস বল দেখি? সমগ্র মেয়ে জাত নিয়ে ফতোয়া দিচ্ছিস; কিন্তু মেয়ে হিসাবে আমারও একটা মতামত আছে—সেকথা কেন ভুলে যাস্?

বেশ তো বল না। কেন, আমি কিছু মিথ্যে বলিনি। বাঙ্গালীর পাঁচ বছরের মেয়ে মিনিও শ্বশুর বাড়ির কথা জানে।

জয়ন্ত হেসে বলে : তোমরা কোথা থেকে কোথায় চলে এলে—বল দেখি। কথাটা বোধহয় ছিল ইলীনার জামসেদপুর ভাল লাগে কিনা? কিন্তু সেসব ভুলে গিয়ে যেখানে এসে দাঁড়ালে সেখানে দেখতে পেলুম সনাতনী নারীর চিরন্তনী রূপ।

ইলীনা বলে : কথাটা কি রকম দাঁড়াল জয়ন্তদা—আরও একটু খোলসা করে বল?

তোমরা বুদ্ধিমতী—এর আবার ভাষ্য কি? মেয়েরা মায়ের জাত। তাই ঘুরেফিরে মেয়েদের মা হবার কথাটাই মনে হয়।

একথা শুনে ইলীনা ও জয়তী দুজনেই মুহূর্তের জন্যে নারী-জনোচিত সরম ও সংকোচে অভিভূত হয়ে পড়ে। জয়ন্ত সেকথা উপলব্ধি করে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বলে : তারপর ইলীনা জয়তীর ইস্কুলটাও একদিন দেখে নিও। ওর ইস্কুল কিন্তু সাধারণ গতানুগতিক ইস্কুল নয়।

এসেছি যখন তখন একদিন কেন অনেকদিন ভরেই দেখবো।

হাঁ, তাই দেখো। তারপর বুঝলে ইলীনা : এইসব মানুষের ভেতর

আমিও কাজ করে একথা বুঝতে পেরেছি : এরাও বাঁচতে চায়, বেশ ভাল করেই বাঁচতে চায়। কিন্তু সেই জ্ঞানের আলো এদের ভেতরে জেলে দিতে হবে।

জয়ন্তদা, মানুষ বাঁচতে চাইবে না কেন? সকল মানুষই বাঁচতে চায়। বাঁচার মত করেই বাঁচতে চায়। তাই কবি সকল মানুষের হয়ে বলেছেন : 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

জ্ঞানবৃক্ষের ফল যারা খেয়েছে, তারা একথা বলতে পারে; কিন্তু যারা অজ্ঞান অবুঝ তারা তো বাঁচার ভেতরকার আনন্দ খুঁজে বের করতে জানে না।

সেজন্যই শিক্ষা চাই। কিন্তু আমাদের দেশে কি শিক্ষিতেরাই বাঁচতে জানে?

জানবে না কেন ভাই! ফাণ্ডস্ পারমিট করে না তাই। আয়ের পথ যদি সুষ্ঠু থাকে তবে কি করে বাঁচতে হয় সেকথা ভারতবাসীর চাইতে আর কেউ ভাল জানে না। অন্ধ অনুকরণ করতে আমাদের মত খুব কম লোকই আছে। বিদেশে দুদিন ঘুরে এসেই সাহেব হয়ে বসি।

কিন্তু আমাদেরই সমাজে আবার গান্ধীজি আছেন।

তিনি জাতির আর্ষপ্রয়োগ।

তা বটে। কিন্তু জাতীয় আয় বাড়াবার আমাদের কাজ কতটুকু এগিয়েছে জানি নে। কৃষিনির্ভর দেশকে শিল্পনির্ভর করতে হবে— এধরণের কথা অনেকের মুখে শুনি। তা কতদিনে আর কতদূর সম্ভবপর হবে সে-ও ভাববার কথা।

বুঝি স্বাধীনতা লাভের পর দেশের মানুষ একটা র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ চেয়েছিল। কিন্তু র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ হঠাৎ কি করে হবে, বল? কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার গ্লানি দুদিনেই ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে—এতো আর হতে পারে না। অবুঝ হলে চলবে কেন? ধৈর্য ধরতে হবে।

সাধারণ মানুষ তো বর্তমানে খাওয়া পরা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। তারা দুটি খেতে পেলেই খুশি। দেশ বিভাগে সাধারণ

মানুষের শান্তিময় জীবনে এলো ঝড়। সে ঝড় থামতেই হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলেন দেশের কর্ণধারগণ।

সে কথা মিথ্যে নয়। এতবড় একটা দুর্ভাগ্য খুব কম জাতির ভাগ্যেই আচমকা এসে পড়ে।

রাতে দুই সখিতে শোবার আগে আবার গল্প সুরু করে।

ইলীনা বলে: তুই জয়ন্ত-দার বিয়ে নিয়ে মিথ্যে কথা কেন বললি আমাকে।

জয়ন্তী: দেখলুম, তোর কি রি-এ্যাক্‌শন্ হয়।

ফিজিকসের প্রথম পাতার প্রথম কথা: এভরি এ্যাকশন্ হ্যাজ গট ইটস্ রি-এ্যাকশন্। রি-এ্যাকশন্ হলে তো তোর মিথ্যে বলবার জন্যই অসদ্ভাব ঘটবে—জয়ন্তদার বিয়ের জন্য নয়।

আমারই ভুল হয়েছে। কারণ তোর যে প্রেমিক আছে আমি সেকথা একদম ভুলে গেছলুম। বুঝলি, আজকালকার দিনে একটি বয়-ফ্রেণ্ড থাকবেই—তা নইলে চলে না।

তা বয়-ফ্রেণ্ড থাকা দোষের কি? ওটা জীবনের প্রাণধর্ম। বিয়ের চাইতে অনেক ভাল। কারণ বিয়েটা বড্ড স্থূল।

তুই সুন্দরী কাজেই তোর অনেক বয়-ফ্রেণ্ড জুটবে। তোর রূপা কটাক্ষ পেলে বহুলোকই তোর পায়ে দাসখৎ লেখাবে—কিন্তু যারা কুৎসিত, যারা তোর মত আপ্-টু-ডেট্ নয়—তাদের উপায় কি?

কেন তোর নিজের বেলায় ত আর এ-প্রশ্ন জাগছে না?

তোর পাশে এসে দাঁড়ালে লাগতেও পারে।

সে-বিচার পুরুষ করবে—তুই আমি করতে পারি নে।

ঘরে আর্শি আছে তো?

আর্শিতে এ-কাজ চলে না বন্ধু। পুরুষের কাজ পুরুষ করবে, নারীর কাজ করবে নারী। আমি যে চোখে পুরুষকে বিচার করব আর একটি পুরুষ যে ভাবে নারীকে বিচার করবে তার একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

এ-কথা বলে কিন্তু তুই নিজেদেরই নিজে ছোট করছিস। বিচারের মানদণ্ড পুরুষ নির্ভর হলে মেয়েদের স্বতন্ত্র সত্তা ক্ষুণ্ণ হয়।

এ-তে সত্তার কথা কিছু নেই। এ-হচ্ছে প্রকৃতি ও পুরুষের কথা। ব্যাপারটা পারস্পরিক।

নে এখন শুয়ে পড়। আর মনস্তত্ত্ব ঘাটতে হবে না।

কিন্তু হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে।

রাত এগারোটায় টেলিফোন।

জয়তী একটু চিন্তিত হয়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু ত্বরিতে গিয়ে ইলীনা রেসিভারটি তুলে নেয়।

হ্যালো। হ্যাঁ, বলুন।

অমি হাসপাতাল থেকে বলছি।

বলুন।

জয়তী দেবী আছেন?

হ্যাঁ, বলুন। জয়তীই বলছে।

অশোকবাবু আজ কলকাতা থেকে জামসেদপুর এসেছেন।

তাই নাকি? তারপর?

সমাজতন্ত্রী নেতা অশোক রায় কলকাতা থেকে আজ সকালেই এখানে আসেন। আজ বিকেলে তাঁর একটি সভায় যোগ দেবার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্টেশনেই রেল লাইনের ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার? এখন কেমন আছেন?

এখন ভালই আছেন। তবে জ্ঞান হবার পর জিগগেস করা হলো: কাকেও কিছু বলতে হবে কিনা—তখন শুধু আপনার কাছেই ফোনে জানাতে বললেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটলো কি করে?

ব্যাপার যখন ঘটে—তখন এমনিতেই ঘটে। এখন আর কোন কারণ তক্ষ পাওয়া যায় না। রেল লাইনের পাশে সিগনালের যে নীচু তার থাকে তাতেই কি করে পা জড়িয়ে পড়ে যান। বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলেন।

তা আমরা কি একটু দেখতে যেতে পারি?

অনায়াসে আসতে পারেন। ক্যাবিনে আছেন। আমাদের এখানে ক্যাবিন পেসেন্টের কোন রেসট্রিক্শন্ নেই।

কিন্তু আমরা গেলে রোগীর পক্ষে কিছু খারাপ ঘটবে না তো?

না সে স্টেজ পেরিয়ে গেছে।

আসুন না, আমি অপেক্ষা করব।

আপনার নামটা জানতে পারি?

আমার নাম ডাঃ এস্, চৌধুরী। আমরা একসঙ্গে ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়তুম।

কথাটা শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। কারণ বাল্যবন্ধুর প্রেম নির্ভেজাল। যত্নের কোন ত্রুটি ঘটবে না।

আমি না থাকলেও যত্নের কোন ত্রুটি ঘটতো না। তবে অসুস্থ অবস্থায় নারীর হাতের কল্যাণস্পর্শ ও সহানুভূতি পেলে রোগী মনে বল ভরসা পায়।

আচ্ছা, আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি।

ফোন ছাড়বার পর জয়তী প্রশ্ন করেঃ কি রে কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললি? কি ব্যাপার সব কথা খুলে বল!

ডুবে ডুবে জল খাস্। ভাবিস্ যে কেউ আর জানতে পারবে না। সাবাস্ মেয়ে তুই। রিজার্ভ হবার এই যে শেষ পরিণতি সে-কথা আমি আগেই জানি। সংযমী মানুষই মনে মনে অসংযমের মহড়া দেয় সবচেয়ে বেশী।

কি সব যা তা বলছিস্। হেঁয়ালি রেখে খুলে বল না—কি হয়েছে? হাসপাতাল, হাসপাতাল—কি বললি?

বলব আর কি তোর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে।

সত্যি ইলীনা তোর সবটাতে রসিকতা। এ-তো-টু-কু সিরিয়াস হতে শিখলি নে। আমার মন যেন কেমন কেমন করছে। আমাকে সব কথা খুলে বল! তোকে মিনতি জানাই।

তোর প্রেমের মুকুল ফুটবে এবার। আর ভয় নাই। তোর অশোক এসেছে জামসেদপুরে বক্তৃতা দিতে। মস্ত বড় সমাজতন্ত্রী নেতা।

কি সব বলছিস্ তুই।

তোকে কাছে পাবার জন্য চাল খেলেছে বাঁচাধন। স্টেশন থেকে আসবার

সময় হুমড়ি খেয়ে রেল লাইনে পড়ে গিয়ে কপাল ও নাকে সামান্য ইন্‌জুরি করে শ্রীমান হাসপাতালে অ্যাড্‌মিশন্‌ নিয়েছেন।

তারপর ?

ওর বাল্যবন্ধু ডাঃ চৌধুরী এইমাত্র ফোন করে জানালেন : একবার এসে দেখে গেলে পেসেণ্ট মানসিক বল পাবে। আমিই জয়ন্তীর ভূমিকায় অভিনয় করলুম। অভিনয় তো নিজ কানেই শুনলি। চমৎকার অভিনয় হয়েছে—কি বলিস্‌ ?

ফোনে একপক্ষের কথা শুনেছি। লজ্জার মাথা খেয়ে কি কথার কি উত্তর দিয়েছিস্‌ তুই-ই জানিস্‌। মেয়েদের উচ্ছ্বাস প্রকাশেও একটা শালীনতা থাকা প্রয়োজন। তোর যেন সেটুকুও নেই।

তোর উষ্মার কি কারণ ঘটলো জানিনে। তবে আমার উত্তর পেয়ে তোর মক্কেল যে হাত ছাড়া হবে না—সেকথা বলাই বাহুল্য।

অ্যাক্‌সিডেণ্টের গুরুত্বটা মোটেই দিচ্ছিস্‌ নে !

কেমন আছে মানুষটা—কে জানে ? হাসপাতালে যাবি তো চল্‌ !

নিশ্চয়ই হাসপাতালে যাবো। কিন্তু যাবার আগে লক্ষীটি একবার বল্‌— অশোকের সঙ্গে কি করে এতদিন যোগাযোগ রক্ষা করেছিস্‌ ?

তোকে তো কতবার বলেছি মেয়েদের জীবনে একটু সিরিয়াস না হলে নারীত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়।

অর্থাৎ তুই একটি গভীর জলের মাছ। ফাঁকা বুলি দিয়ে আসল কথা চেপে যেতে চাস্‌। কিন্তু একটা কথা তোরা ভুলে যাস্‌—জীবনে শিক্ষার যে আলো পেয়েছিস—তার কি কোন মূল্য নেই ! কেন সহজ ভাবে আলোচনা চালাতে পারিস নে যা জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং পরমতম কাম্য।

এই কি তোর সারমন্‌ দেবার সময় হলো ?

সারমন্‌ নয় বন্ধু। শিক্ষিত লোকের অ্যাপ্‌প্রোচ্‌টা সায়েনটফিক্‌ হোক এই প্রার্থনা। সকল জিনিস যেন তারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনা করে অগ্রসর হতে পারে।

যুক্তি দিয়ে ভালবাসা যায় না। ভালবাসাও আবার যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। যদি বলিস্‌ লাবণ্য অমিতকে ভালবেসে শোভনলালকে ভালবাসতে শিখলো তবে সেটা হবে একটা প্রকাণ্ড ভুল।

তাহলে লাবণ্যের ভালবাসাটা কি জাতীয় ?

আমি বলব : শোভনলালকে ভালবাসাটাও ভাবাবেগের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। নে এখন হাসপাতালে চল্। তৈরী হয়ে নে। আমি দাদাকে বলে আসি।

জয়তী, জয়ন্ত আর ইলীনা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়।

একটি পরিচ্ছন্ন কেবিনের শুভ্র ফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছে অশোক।

কাছেই একটি চেয়ার নিয়ে বসে আছে ডাঃ এস, চৌধুরী।

ওরা সকলে উপস্থিত হতেই ডাঃ চৌধুরী ওদের অভ্যর্থনা জানায়। বলে : এই যে আসুন জয়ন্তবাবু, জয়তী দেবী।

তারপর ইলীনাকে অপরিচিত দেখে চুপ করে যায়। ইলীনার উগ্ররূপের জৌলুষে একটু স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ডাক্তার চৌধুরীর কবি কীটসের দুটি বিখ্যাত পংক্তির কথা স্মরণে আসে : 'সাম্ সেপ অফ্ বিউটি মুভস্ অ্যাওয়ে দি পল ফ্রম্ আওয়ার ডার্ক স্পিরিটস্' অর্থাৎ 'কোন না কোন সৌন্দর্য মনের ম্লানিমা মুছে নিয়ে শান্তসিক্ত করে।'

সত্যি রূপের এমনি মোহ মানুষকে মুহূর্তে কোথায় যেন নিয়ে যায়। অন্যমনস্ক মানুষ নিরুদ্দেশের দ্রুত রথে চড়ে অচিন দেশের উদ্দেশ্যে ভেলা ভাসায়। সে আশেপাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভুলে যায়। সে উদাস, সে ব্যাকুল, সে অনন্ত তীর্থযাত্রার দিশাহারা পথিক। হৃদয় মন ভরে এমন এক সুর বেজে ওঠে যখন প্রাণ আপনা থেকেই নেচে গান গায়। বোধ হয় 'ময়ূরের মত নেচে ওঠে।' ভাষা স্তব্ধ, বাণী মূক অন্তরে এক অপূর্ব ভাবসমৃদ্ধ ব্যঞ্জনা।

জয়ন্ত জিগগেস করে : কেমন আছে এখন ?

ডাঃ চৌধুরী ভাবরাজ্য থেকে ফিরে এসে একটু অস্বাভাবিক গলার আওয়াজে বলে : ভালই আছে। কোন চিন্তার কারণ নেই। প্রোকেন পেনিসিলিন দিয়েছি। আগামী কাল স্কিন্ টেষ্ট করে এন্টিটিটেনাস্ দেবো ভাবছি।

এর আগে কি এ্যান্টিটিটেনাস্ দিয়েছে ?

প্রায় কুড়ি বছর আগে। কাজেই স্কিন টেষ্ট করে দেবো।

বেশ ভাল কথা। তাহলে আর ভাবনার কিছু নেই।

অশোক দুচোখ তুলে তাকিয়ে আছে জয়তীর দিকে। ইলীনাকে দেখতে পেয়ে একটি প্রসন্ন পরিচিত হাসি দেয়। নারীর স্নিগ্ধ রূপ পুরুষকে শুধু তৃপ্তি দেয় না, তার ভাবনাকে আরও গভীরে নিয়ে যায়। অশোকের মনে হয়ঃ জয়তী জ্যোৎস্নার একটি প্রসন্ন রূপ আর ইলীনা প্রখর বিদ্যুতের খরতর ঝলমলে সংস্করণ। জ্যোৎস্না ও বিদ্যুৎ এই দুই সহোদরা যেন শান্তির বাণী আর জ্যোতির আলো নিয়ে এসে দিশাহারাকে পথ দেখাবার জন্য দুদিকে দাঁড়িয়েছে। এইবারে আশা ও বাণীর মূর্তরূপ প্রতিফলিত হবে যেন এক চঞ্চল জীবনের অশান্ত দরিয়ায়। কি বলবে অশোক? বলবার কিছু নেই। মন দিয়ে চুয়িয়ে চুয়িয়ে অন্তরের বকযন্ত্রে শোধিত হয়ে যে সুরভি ফেনায়িত হবে—তারই সৌরভ রসিয়ে রসিয়ে আঘ্রাণ নেবে সে। শিক্ষিত লোকের সংযম মনন প্রয়াসী। তারা কথা কয় মনে মনে।

ডাঃ চৌধুরী বলেঃ আজ আর নয়। দুদিন পরে যখন সব ঠিক হয়ে যাবে তখন কথাবার্তা হবে। এবারে অশোক রেষ্ট নিক্।

জয়ন্তও বলেঃ তাই ভাল ইলীনা। চল, আজ আমরা আসি। কথা বলতে গেলে অশোকের মাথায় লাগবে।

জয়ন্ত, ইলীনা ও জয়তী সকলেই একসঙ্গে বিদায় নেয়।

পথে আসতে আসতে ইলীনা শুধু একবার জিগগেস করেঃ জয়ন্তদা, তোমাদের সঙ্গে অশোকের পরিচয় হলো কি করে?

জয়ন্ত বলেঃ আমাদের ছেলেবেলায় অশোকের বাবা আর আমাদের বাবা চাকরীর সময়ে একই স্টেশনে পোস্টেড্ ছিলেন। অশোকের বাবা ছিলেন ইগ্‌জেকিউটিভ্ সার্ভিসে আর আমার বাবা ছিলেন জুডিসিয়াল সার্ভিসে। কাজেই—ছোট স্টেশনে হৃদ্যতা বেড়ে উঠতে সময় লাগেনি।

ইলীনা বলেঃ আমি ভাবছিলুম জয়তীর পোষ্ট গ্রাজুয়েট মারফত বুঝি তোমাদের চেনা-ও-জানা।

পাশাপাশি বাড়ি থাকায় আমাদের দুই পরিবারের হৃদ্যতায় আত্মীয়তার সুর বেজে ওঠে। সে সুর আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

তাতো দেখতেই পাচ্ছি।

চারদিন পরেই অশোক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। ছাড়া পাবার পরে জয়ন্তীদের বাড়িতে সোজা চলে আসে সে।

এদিকে একদিন ইলীনা ও জয়ন্তীর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। ইলীনা বলে: আমাকে তো খুব উপদেশ দিচ্ছিলি, এবারে মহারাণীর গোপন সম্ভারের যখন উদ্ঘাটন হলো, তখন আর বিলম্ব কেন? দু'হাত এক হয়ে যাক্।

জয়ন্তী উন্মনা হয়ে মৃদু হেসে যেন কথার উত্তর দেয়।

হাসি নয় বন্ধু, হাসি নয়। কথার জবার দাও।

কেমন যেন ভয় ভয় করে। অতবড় দায়িত্ব নিতে পারবো কি?

না, না—তা পারবে কেন? অতবড় দায়িত্ব তোমার মা, দিদিমা—ঠাকুরমা পারেন নি আর তুমি পারবে কি করে? তুমি তো আবার দু'পাতা ইংরেজি পড়েছ।

মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক আর না শিখুক ওরা যুক্তির চাইতে হৃদয় নিয়ে খেলা করতেই ভালবাসে। তারা আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে। শিক্ষা নারীর হৃদয়াবেগে ডিভাইড্ এণ্ড রুল পলিসি বেরিয়ার তুলতে পারে নি। আমাদের দিদিমাও যা ছিলেন আমরাও তাই আছি।

অর্থাৎ স্বামী দেবতাকে তুষ্ট করতে জীবন নিঃশেষে তিলে তিলে ব্যয় করা। আর স্বামীও হবেন একনিষ্ঠ বৌ-পাগলা স্বামী। স্বামীকে বশে রাখাই ত নারীর চরম কৃতিত্ব।

ঠিক তা নয় রে। আধুনিক ছেলেদের হাজারো চাহিদা। সে সব ডিমাণ্ড ফুলফিল করতে পারব কি-না। সেজন্যই ভয় হয়।

আমি একথা বুঝি নে জয়ন্তী প্রেম করেছিস বলে কি নিজের সত্তাকেও হারিয়ে ফেলেছিস্। তোর কি নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব নেই। অপরের ইচ্ছে দিয়ে নিজের ইচ্ছেকে পীড়িত করতে দুঃ-খ-খু হয় না তোর?

প্রেমের খনি বোধ হয় সেখানেই। নারী পুরুষের জুলুম চায়, অত্যাচার চায়—তবেই নারীর তৃপ্তি, তবেই তার আশা-আকাঙ্খার সার্থকতা গভীরে রূপ পায়।

ভারতীয় নারীর এতো দুর্দশা সেজন্যই। একটি শিক্ষিতা নারীর মুখেই যখন এই কথা, তখন আর অন্যের কথা কি বলব।

আধ্যাত্মিক ভারতের সাধনাও তো ত্যাগেরই সাধনা, ভোগের নয়। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ, ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির নিঃশ্বাস।

তাই নাকি? আমি কি বলি জানিস্। ভারতের নারী মা হতে জানে, ভগিনী হতে জানে, জানে সেবিকা হতে—কিন্তু কখনও প্রিয়া হতে জানে না—একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

ভারতীয় নারীকে তো শুধু প্রিয়া হলে চলবে না। তার দায়িত্ব সুদূর-প্রসারী।

শুধু প্রিয়া কেন—প্রিয়ার ভাগ এ-তো-টু-কু নেই।

আছে রে আছে। পুরুষের কাছে নারীর আত্মসমর্পণ শুধু কথার কথা নয়। গভীর অর্থ জ্ঞাপক।

সে তো বটেই।

তুমি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চলবে না—একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতে হবে। নারী যদি পুরুষের সব দায়িত্ব তুলে নিতে না পারে—তাহলে পুরুষ ঘর বাঁধবে কি করে? পুরুষের ঘর বাঁধবার গুপ্তিমন্ত্র যে নারীরই কাছে।

যাক্ যখন গোপন চাবিকাঠি জেনে গেছিস—এখন তোর জন্য আর ভাবনা নেই আমাদের।

তোর তো সব সময়ই হালকা সুরে হালকা কথা কওয়া একটা অভ্যেস। জীবন যেন তোর কাছে একটা স্পোর্ট।

তা মিথ্যে কথা নয়। যতটুকু জীবন ততটুকু সত্য। মৃত্যুর সঙ্গে সকল জিনিসের পরিসমাপ্তি। মৃত্যু নিয়ে দার্শনিক বিলাসিতা করতে মন চায় না।

কোন দুটো মানুষই এক নয়। তারপর আছে রুচির পার্থক্য, মতের পার্থক্য।

ওর ভেতরেই আবার কমন্ ফ্যাকটরস্ বের করে নিয়ে বৃহত্তর সমাজের জন্য নীতি তৈরী হয়।

অশোক এসে দাঁড়াল ওদের মাঝখানে। বলে: কি নিয়ে আলোচনা চলছে তোমাদের?

নারী পুরুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলুম।—বললে ইলীনা।

ইনটারেষ্টিং সাবজেকট্ বলতে হবে।

বয়সকালে ইনটারিষ্টিং বৈ—কি! কিন্তু আমি একটু আজকের ডাকটা দেখে আসি।—এই বলে ইলীনা বেরিয়ে যায়।

শুধু অশোক আর জয়তী বসে থাকে।

জয়তী বলে: কবে কলকাতা যাবে স্থির করেছ?

অশোক: পরশু দিন যাব ভাবছি। একদিনের নাম করে এসে সাতদিন তো কেটে গেল।

অ্যাক্সিডেণ্টটা বুঝি কিছু নয়।

সে কথা তুমি বুঝলেও সকলে মানতে চাইবে কেন?

তাহলে শেষ পর্যন্ত কি স্থির হলো?

স্থির করবার তো আর নতুন কিছু নেই। তুমি তো জান অনেকগুলো ভাইবোন। তারপর মা-বাবার অটক্র্যাটিক্ মনোভাব কোনমতেই আমার আগামী দিনগুলি মসৃণভাবে কাটাবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। বাবা মা-ও আমার বিয়ে সম্বন্ধে উদাসীন। আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সে-ও একটা কারণ বটে। সবচেয়ে বড় কথা ওই বৃহৎ পরিবারের জনারণ্যের মধ্যে যদি আমি তোমাকে নিয়ে যাই তবে সেটা হবে আমার সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা।

এ তোমার মনগড়া কথা।

একটুও মন গড়া নয়।

আর আমি যদি মানিয়ে নিতে পারি তোমার তাতে অসুবিধে কি?

দূর থে:ক এসব নিয়ে বিলাস করা চলে। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন ওই অবস্থার মধ্যে পড়বে তখন আর পালাবার পথ পাবে না। বৃহৎ পরিবার আমাদের সমাজে এক অভিশাপ বিশেষ। পরিবার পরিকল্পনার জন্য এতটুকু চিন্তা ভাবনা নেই।

আমাদের সমাজে দুরবস্থাও সেজন্য। কিন্তু তুমি কি করে বুঝতে পারলে বিয়ে করলে তুমি সুখী হতে পারবে না?

এসব জিনিস পূর্বাহ্নেই বোঝা যায়। ছেলেবেলা থেকেই আমার এ-গুণটা আছে। বলতে পার 'সেকেণ্ড লাইট' পেয়েছি।

জ্যোতিষী করতে বসে যাও। তোমার পয়সার দুঃখ কি। কলেজে মাষ্টার মশাইগিরি করার চাইতে অনেক ভাল।

সে আমি জানি। কিন্তু উপায় যে নেই। যাকে ভালবাসব তাকে যদি মনের মত করে রাখতে না পারি, তবে দুঃখেরও অন্ত নেই।

তুমি এত ভাব দেখেই তুমি নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অ্যাড্‌জাস্ট্ করে নিতে পার না।

ঠিক তা নয়। ভবিষ্যতের ছবিগুলি আমার চোখের সামনে এমনভাবে ফুটে ওঠে যে অনাগত দিনগুলিকেও মনে হয় এখনকারই কোন বাস্তব ঘটনা। তাছাড়া গরীব অধ্যাপক। বহুজনের বহুরকমের দাবী আমার কাছে। কারণ আমি যে বড় ছেলে।

তুমি বেশী বেশী করতে যাও বলে সবাই তোমাকে পেয়ে বসেছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে ভাই-বোন সাবালক হয়ে গেলে তোমার তো আর অপগণ্ড নাবালকের মত পিছু পিছু মাতব্বরী করবার কোন প্রয়োজন দেখি নে। হাকিমি করে তোমার বাবার ব্যাংক ব্যালেন্স কতো হলো?

যা আছে বোনেদের বিয়ে দিতেই তা ফুরিয়ে যাবে। আর বোনেদের বিয়ে না হতে ছেলের বিয়ের কথা তো ভাবাই চলে না আমাদের সমাজে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ অভিবাবকেরই এ-জাতীয় মনোভাব দেখতে পাই। ফলে ঘরে ঘরে অনূঢ়া মেয়ের প্রাদুর্ভাব। তুমি তোমার ছেলেটিকে ছাড়বে না—তা হলে অপরেই বা তার ছেলেটিকে ছাড়বে কেন? না, না—আমার ছেলে ঠিক থাক—আমি অন্যের ছেলেটিকে আগে বিয়ের ফাঁদে বন্দী করে নিই।

কথাটা ঠিকই। সবাই ভাবে আগে আমার মেয়েটির বিয়ে হোক্। কিন্তু ছেলেরা যে বাপ-মায়ের নজরবন্দী। কার সঙ্গে বিয়ে হবে? সমাজে এ অবস্থার প্রতিকার কি করে সম্ভব তা জানিনে। সকলেই যদি আমরা একে অন্যকে দোষারোপ করি, তাহলে তো সমাজ থেকে এ-দুর্নীতির মূল উৎপাটন কখনও সম্ভব হবে না।

ছেলেরা বিয়ের আগে অতিমাত্রায় সুবোধ হলে এ-জাতীয় অনটন হামেশাই ঘটবে। তোমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন ঘটবে কি করে? নিজের

ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বকে রূপ দেবার সাহস যদি না থাকে, তবে লেখাপড়া শিখেছিলে কি জন্যে ?

তাহলে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বল ?

প্রয়োজন হলে করতে হবে বৈ কি !

ধর, তোমার ছেলেও যদি একদিন তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন তোমার মনের অবস্থা কি রকম হবে ?

আমি কখনও আমার ছেলের উপর অন্যায় জুলুম করব না। আমার নিজের ইচ্ছেকে ওর ওপরে চাপিয়ে দেব না।

জুলুম বলছ কেন, বল অন্যায় অত্যাচার।

জুলুম বা অত্যাচার কোনটাই নয়। এটা হচ্ছে বয়সের ধর্ম।

যথা।

যে বয়সের যে কাজ। প্রকৃতির তাগিদে সৃষ্টি কখনও বন্ধ হবে না। পুত্র বাল্যে মায়ের, যৌবনে স্ত্রীর, বার্ধক্যে ঈশ্বরে মন সমর্পণ করবে—এই তো বুঝি। মা যদি ছেলের যৌবনেও ছেলেকে বাল্যকালের মত শাসন করতে চান তবে সেটা হবে দৈনন্দিন জীবনে বিড়ম্বনা। আবার স্ত্রী যদি স্বামীর বার্ধক্যেও তাঁকে আঁকড়ে থাকতে চান তবে সেটা হবে অমিতাচার। জীবনে এই যে ষ্টেজ ভাগ করা আছে, তাকে উপেক্ষা করলেই অশান্তি আসতে বাধ্য।

তুমি এ সম্বন্ধে বেশ ভেবেছ দেখছি।

মা শিশুকে লালন করেন কতকটা নিজের খাতিরে, কতকটা শিশুর খাতিরে। শিশু যত বড় হতে থাকে ক্রমশ মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মা'র দৃষ্টিও তখন সর্বশেষ অতিথিটির দিকেই নিবিষ্ট হয়। শিশু কিন্তু মায়ের এই বিচ্ছিন্নভাবকে কখনই প্রসন্নভাবে দেখে না। অথচ উপায়ও তো নেই। প্রকৃতির তাড়নায় উভয়েই নিজ নিজ পটভূমিকায় অভিনয় করে যায়। তারপর আসে অ্যাডলেসেন্স্ পিরিয়ড্। মানুষের জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়। পরিণত মানব স্বর্ণময় যুগের উজ্জ্বল দিনগুলির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকায়। সে মনে মনে তর্ক করে' বিচার করে, যুক্তি হানে। তাইতো মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ, ছেলের সঙ্গে পিতার সম্বন্ধ কোথায় আরম্ভ আর কোথায়ই বা তার শেষ।

সত্যি আরম্ভ আর শেষটা বড়ই বিচিত্র। মা-কে ছেলের মনের নাগাল পেতে হলে মা-কেও ইন্‌টেলেক্‌টিউয়্যাল্‌ লেবেলের ক্রশরোড এসে দাঁড়াতে হবে।

ক্রশ রোডে এসে দাঁড়ালেও মা আর ছেলের মনের নাগাল পাবেন না। সেজন্যই সামাজিক জীবনে এত গরমিল। মা বলবেন: আমি আমার ছেলেটিকে সযত্নে লালন করেছি—এত বড় করেছি—কিন্তু কোথাকার কোন্‌ অজানা অচেনা মেয়ে এসে দুদিনে ছেলেকে পর করে নিয়ে যাবে—এ হতে পারে না। কাজেই তখন ভারতীয় আদর্শের ধ্বজা তুলে ধরা হবে। কিন্তু ছেলেটি যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব জট পাকিয়ে ওঠে। লা কনসাস্‌ তার অদ্ভুতরূপে সচেতন। ঘর ছাড়ি না, বৌ ছাড়ি। কিন্তু তোমার সমস্যা তো অন্য রকম। গোপাল বড় সুবোধ বালক।

তুমি কিন্তু হেষ্টিলি বিচার করছ! পারিবারিক জটের গ্রন্থিগুলি কি এত সহজে উন্মোচন করা চলে? ধীরে ধীরে হবে। পঁচিশ বছর আগের জীবনযাত্রার সঙ্গে পঁচিশ বছর পরের জীবনযাত্রার তুলনা কর: দেখতে পাবে আকাশ পাতাল তফাৎ। সুবোধ বলে কটাক্ষ করছ। কর। কিন্তু ভারতীয় স্নেহরসে সিক্ত যে সমাজব্যবস্থা তাকে এক ঢিলে অনেক যোজন দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে, তা হয় না।

তুমি কি তাকিয়েছ আমার মনের দিকে, তোমার নিজের মনের দিকে। না তোমার সে অবসর নেই। তুমি সব সময়ই ব্যস্ত তোমার পরিবারের বহুজনের মনস্তুষ্টি সাধনে। বহুর ভেতরে যে দান তা আমি চাই নে। আমি চাই একান্ত নিজস্ব করে আমারই জন্য আমাকে দান।

জয়, তুমি আজ খুব উত্তেজিত হয়েছে।

ওতো তোমার বাঁধা বুলি। এমন ঠাণ্ডা মানুষ জীবনে আমি কখনও দেখি নি।

ইলীনা এমন সময় ডাক নিয়ে ফিরে আসে।

অশোক পাশের দরজা দিয়ে বসবার ঘরের দিকে চলে যায়।

ইলীনা বলে: ধ্যান গম্ভীর মূর্তি। বড্ড একা যে।

জয়তী: না, এতক্ষণ অশোক তো ছিল। কা'র চিঠি এলো রে?

অনেক চিঠি এসেছে। অনেক চিঠি।

কার, কার?

এফ্, আর, সি, এস্ অন্নদা মুখার্জি, অমিতাভ মায় নীরেন লাহিড়ীর।

এফ্, আর, সি, এস্ লিখছেন: ইউ কে'তে যাচ্ছেন। দু'বছর অন্তর যদি একবার ইউ, কে'তে ঘুরে আসতে না পারেন তবে নাকি আধুনিক চিকিৎসা জগতে পিছিয়ে পড়তে হয়। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই।

অমিতাভ নতুন বই লিখেছেন। আসলে সে শিল্পী। তাঁর সমাজকল্যাণ-বোধের বিকাশ হবে লেখনীর সাহায্যে। হাতে কলমে শ্রমসাধ্য গুরু কাজ তার জন্য নয়। কাজের রকম ফের মানুষ হিসেবে না হলে চলবেই ব' কেন!

তারপর?

তারপর নীরেন লাহিড়ীর চিঠি। রোমান্টিক লাহিড়ীর চিঠি খুব ইনটারিষ্টিং। ছেলেটি এক হিসেবে খুব সরল। কুমারী মেয়েদের কাছে একটি ছেলে যদি অপর মেয়েদের গুণপনা ও সৌন্দর্যের প্রশস্তি করে তবে তাতে তাদের আনন্দ হয় না। যা হয় তা দুঃখ ও ঈর্ষামিশ্রিত বিদ্বেষ।

কি রকম?

জানা শোনা একটি সুশ্রী তন্বী মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আর হৃদয়ের গ্রাফিক চার্টের ওঠাপড়া কষ্টকল্পিত শব্দচয়নে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে লাহিড়ী।

ভারী মজার ব্যাপার তো। তাহলে দেখছি ছেলেদেরও মেয়েদের মত দুঃখবোধ আছে। পুরুষকে হৃদয়হীন কে বলে!

সমাজে সুপাত্রদের বিয়ের খবরে কুমারী মেয়েদের বেদনাবোধ জাগে সে তো সত্যি কথা। তোর কথা শুনে হাসি পায়: সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ!

কেন?

মেয়েদের যদি দুঃখবোধ জন্মায়, তবে ছেলেদেরই বা জন্মাবে না কেন? বিষয়টা তো এক তরফা নয়, উভয় তরফের।

ছেলেদের কথা তো বুঝতে পারি নে। মেয়েদের কথাটাই বুঝতে চেষ্টা করি।

ন্যাকা চৈতন। কেন তোর অশোক কি বলে?

অশোক আর কি বলবে? বলতে পার: ভীরু, কাপুরুষ। প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাহস নেই।

সে তো বাপু তোরই দোষ। পুরুষ আবার কে কবে সাহসী হয়েছে জানিনে। নারীর হাতে যদি 'অভয় মন্ত্র' না পায়, 'অশোক মন্ত্র' রূপ নেবে কি করে?

কাব্যি করা হচ্ছে?

না আর কাব্যি নয়। আমাকে চিঠিগুলির জবাব দিতে হবে। এবারে একটু নিরিবিলি বসতে হবে।

ইলীনা অমিতাভের চিঠিটা নিয়ে আর একবার পড়তে বসে।

'মানুষের সঙ্গে মানুষের সবচেয়ে নিবিড় বন্ধন হচ্ছে গোপন পাপের বন্ধন এ্যাডাম আর ইভের কাহিনী হচ্ছে ঐ সত্যের রূপক। কোন বন্ধুত্ব, কোন প্রণয় নিগূঢ় হয় না, স্থায়ী হয় না, যদি তার মূলে না থাকে গোপনে অনুষ্ঠিত কোন পাপের স্মৃতি।' (রাখাল সেন, আই. সি. এস. পৃ ১৩৪ সপ্তপর্ণ)।

তারপর আছে:

'আজ যে বেদনা পরিপূর্ণ কাল তাই হারিয়ে যায় বিস্মৃতিতে তবেই দুঃখ। কিন্তু দুঃখকে কবি শিল্পসূত্রে রাঙা রং দিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন সেটা দুঃখকে উত্তীর্ণ করে চিরন্তনের বুকে নেয় চিরস্থিতির আসন।

'বিস্মৃতির বেদনাকে যেন পৃথিবীতে কেউ না ভুলে যায়, সাহিত্যের মধ্যে সেই না ভোলাবার বেদনা, সেই না ভোলাবার রস যেন থেকে যায়, এমনি করেই কবিরা বলেন দুঃখের ব্যথাকে, সেই অনির্বচনীয় আনন্দকে।' (রবীন্দ্রনাথ)

রাখাল সেনের আর একটা উদ্ধৃতি আছে:

'রূপ কী? রূপ আর বাসনা একই বস্তু। বাসনা কুৎসিৎকে সুন্দর করে। ওটা সম্পূর্ণরূপে প্রণয়ীর দান।

'জাতি রক্ষার জন্য যেটুকু বাসনা দরকার প্রকৃতি মানুষকে তার চেয়ে সে বস্তুটি ঢের বেশি দিয়েছে এবং তারই উদ্বৃত্তাংশ দিয়ে মানুষ করেছে রূপের সৃষ্টি।'

সুন্দর কথা পড়তে বেশ ভাল লাগে। তার জন্য বাজারে বই-ও অনেক কিন্তু কোন বই-এর বিশেষ জায়গা যদি কেউ আবার বিশেষ করে শোনায় তবে তার মূল্য স্বতন্ত্র। অমিতাভের কাছে কি ইলীনা শুধু মহৎ লোকের মহান্ বাণী শুনতে চায়, না অন্য কিছুও চায়। চিঠির গোড়া থেকে শেষ অবধি নিজের ব্যক্তিগত খবর নেই বললেই চলে। কাজেই—ইলীনার এ-চিঠি ভাল লাগে না। কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসেঃ অমি, তুমি আর যাই জান চিঠি লিখতে কিন্তু জান না। তোমার চিঠির মাথামুণ্ডু নেই। তোমার কথা কই? আমি তোমার কথাই শুনতে চাই। বড় মানুষের বড় কথা বইতে আছে, আমি অবসর মত পড়ে নেবো। সেজন্য তুমি অযথা রাত জেগে শরীর নষ্ট করে কোটেশনের পেছনে তোমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করো না। সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকারা নানান বই ঘেঁটে তার প্রিয়জনকে খুশী করবার জন্য বিভিন্ন ধরণের ছন্দোবদ্ধ কথা মুখস্থ করবে। চাই কি সময়-বিশেষে নিজের বলেও চালিয়ে দেবে। ছন্দোবদ্ধ কথায় মেয়েরা মাদকতা পায় সেকথা ছেলেরা জানে। যে পুরুষ কাব্যের রস দিয়ে নারীকে অভিসিক্ত করতে জানে না, তার জীবন হয় ব্যর্থ। নারী তাকে কটাক্ষ করে বলেঃ এমন গদ্যময় মানুষের সঙ্গে নিজের জীবন না জড়ালে ছিল ভাল। কারণ নারীর কাব্যের প্রতি সহজাত টান আছে। যেমন টান আছে কবিতার মিলের দিকে। অলংকারের কথাটা আর বললুম না। সে তো সর্বজনগ্রাহ্য একটা ইঙ্গিত।

অমিত, তুমি তোমার উপলব্ধির কথা বলবে। সেকথা আমার মাধ্যমে দেশকে জানাবে। হয়ত হাসবে যে আমি কাব্যের নায়িকা হবার জন্য এক দুর্লভ অভিযান চালিয়েছি। নারী যদি তার বিশেষ প্রিয় মানুষের স্তুতির সঙ্গে কাব্যেও স্থান পায়, তবে তো সোনায় সোহাগা।

টেকনিক-কে বজায় রাখতে গিয়ে যদি তোমার উপলব্ধিকে যথার্থ রূপ দিতে না পার তবে সবচেয়ে যে বেশী দুঃখ পাবে সে (হচ্ছে) আমি। আমি তোমাদের ধরা-বাঁধা মানুষের তৈরী টেকনিককেও ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধা করি নে—কিন্তু উপলব্ধিকে নৈবঃ নৈবঃ চ।

তারপর চিঠি হবে এমন যেন 'দুজনে নিভৃতে মুখোমুখি' বসে যে কথা যেমন-ভাবে বলি, বলতে পারি, তাই থাকবে চিঠিতে, তাই হবে চিঠি লেখার আর্ট।

আমার মনে হয় আগামীদিনের সাহিত্য চিঠির মাধ্যমেই রূপ নেবে। টেকনিকের ছকে ফেলে নরনারীর যে প্রেম বা উশৃঙ্খল আচরণ সে কাহিনী পড়ে মানুষের মন তৃপ্ত নয়। আর্ট ও টেকনিক নিয়ে নিত্য নতুন পরীক্ষা করে উত্তরকালের সাহিত্য কীর্তির জন্য যে সঞ্চয় তা-ও তো স্থায়ী নয়। তবে নতুনত্বের একটা মোহ আছে। তাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা স্বতন্ত্র আনন্দও আছে।

যাই হোক, আসল কথা তোমাকে চিঠি লেখার আর্ট আয়ত্ত করতে হবে। জেন আষ্টেন চিঠির লেখার আর্ট সম্বন্ধে একটি চিঠিতে তার বোন কাসাড্রাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখেছিলেন। তুমি সেটি পড়ে নিও। কিন্তু 'মিলনের পাত্রটি যে বিচ্ছেদ বেদনায়'........

আগামীতে তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি।

এবারে নীরেন লাহিড়ীর চিঠিটারও একটি সংক্ষিপ্ত জবাব লিখে ফেলে :
লাহিড়ি, তুমি একটি নির্বোধ। মেয়েদের সঙ্গে তুমি কখনও প্রেমে সফল হতে পারবে না। কোন একটি মেয়ের কাছে চিঠি লিখতে বসে তুমি অন্য মেয়ের প্রশস্তি গাও ও হা হুতাশ কর—বলি, তোমার কি সুরুচিবোধও লোপ পেল? মেয়েরা কখনও একটি ছেলের কাছ থেকে অন্য মেয়ের রূপের প্রশংসা শুনতে চায় না। শুনতে চায় নিজের রূপের কথাই। গুণের প্রশস্তি তা-ও সহ্য করা চলে, কিন্তু রূপের তো কখনই নয়।

লাহিড়ি, তুমি কি পাগল না আর কিছু। আমাদের দেশে একদিন বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। তখন একটি পুরুষের বহু স্ত্রী থাকতো। কিন্তু এখনকার পুরুষের তো হালের আইন মাফিক একনিষ্ঠ হতে হবে। বহুবল্লভ হলে তাকে চলবে না। নারীর একনিষ্ঠ হবার নজির সেকালেও ছিল, এখনও আছে। যদিও দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামী নিয়ে ঘর করেছিলেন, এখনও হয়ত চুপিসারে অনেকে করেন। তবে ধর্ম ও সমাজ মধ্যবিত্তের জন্য। ধনী এবং নীচুস্তরের মানুষদের এসব বালাই নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে তুমি যদি সব সময়ই মন নিয়ে উড়ু উড়ু কর, স্থিরপ্রতিজ্ঞ না হও, তবে তো কখনও জীবনে শান্তি পাবে না। বহু মানুষ নিয়ে ঘর বাঁধবে কি করে? শেষ নির্বাচন শেষ পর্যন্ত তোমার বিশেষ একজনকেই করতে হবে। একে ওকে দূর

থেকে দেখে হায় হুতাশ করা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা বা রাতে আকাশের তারা গোনা তোমার মত পূর্ণ যুবকের পক্ষে বড়ই অশোভন। লক্ষ্মীটি, একটি মনের মত মেয়ে দেখে ঘর সংসার করতে মন দাও। কারণ তোমার এই কাতর করুণ গোঙানি ঘর বাঁধবার দিন যে সন্নিকটবর্তী তারই পূর্ব ইতিহাস সূচনা করে আমার আবেদনও রইল তোমার দরবারে; কিন্তু বহুর জন্য ক্রন্দন সেতো আমি সইতে পারব না বন্ধু। কোন আধুনিকা বহুবল্লভে আসক্ত পুরুষকে সুনজরে দেখে না। কাজেই এ-বিষয়ে মন দিয়ে ভেবে দেখো।

শীগ্‌গির শীগ্‌গির চিঠির উত্তর দিও। অমিতের খবর অনেকদিন জানি নে। যদি তুমি ওর খবর কিছু জান তবে অবশ্য আমাকে জানিও। আত্মভোলা পুরুষ, সর্বত্যাগী সে। তার নিরাসক্ত মনের এক অপূর্ব সত্তা নারীকে অভিসারিকা হবার গোপন আমন্ত্রণ জানায়। এক উজ্জ্বল জীবনধারার আলো যেন তার দূরান্তিক মনের মণিকোঠায় শোহিনীর রাগিণী বাজায়। ওঁর নীরবতা দেখে মনে হয়ঃ 'হৃদয় দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এবং আস্থা ও সংশয়ের দোলায় ক্ষুব্ধ হয়েছে।' হয়ত বলতে পারঃ কিসের দ্বিধা, কিসের দ্বন্দ্ব, আর কিসের আস্থা, কিসের সংশয়? সে তুমি বুঝবে না লাহিড়ী, সে তুমি বুঝবে না। নিরাসক্ত মনে জীবনের মূল্যবোধ রূপায়েণে যে নিত্যি নতুন পরীক্ষা চলেছে তারই এক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছে, অমিত।

যাক্ আজ আর নয়।

একটা হাই তুলে হাত পাগুলো টান করে নেয় ইলীনা। দু'খানা চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেছে। এবারে তৃতীয় চিঠিটিও ধরতে হয়; কারণ আজ না লিখলে এফ্. আর. সি. এস্. অন্নদা মুখার্জি বিলেত চলে যাবে। ওয়েলসের টি. ডি. ডি ডিপ্লোম্যা চাকরীর খাতিরে তার চাই। যদিও ডাক্তারী বিদ্যায় এফ্. আর. সি. এস্. হাইয়েষ্ট ডিসটিংশন্। ক্লাস বসবে ৬ই জানুয়ারী থেকে। সুতরাং ২রা জানুয়ারী কলকাতা থেকে তাকে রওনা হতেই হবে। অতএব ইলীনা আবার কাগজের ওপর কলম বুলোতে আরম্ভ করে।

মুখুজ্জে, আবার বিলেত চললে তুমি সত্যিকারের ভাগ্যিমান মানুষ তোমরা। সময় সময় তোমাদের ভাগ্য দেখে হিংসেও হয়। শুনেচি, বিলেতের মানুষ যাঁরা একবার দেখেছেন, দেশের কালোমানুষদের তাঁদের আর মনে ধরে

না। তারপর সেখানে আছে অবাধ মেলামেশা, আর আমাদের এখানে সমাজকর্তারা নারীকে দুর্লভ করে 'ফলস—ক্রাইসিস্' তৈরী করে রেখেছেন। সেজন্যই রকবাজি ছোকরাদের কাছ থেকে মান সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য 'এ্যান্টি-রাউডি সেকশনে'র সাহায্য নিতে হয়। ডকুমেণ্টারি ছবি তুলতে হয়।

আচ্ছা মুখুজ্জে, বিলেত গিয়ে পরীর দেশের মেয়েদের নিয়ে মেতে উঠবে তুমি। আমি মানসচক্ষে বেশ দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য তুমি বলবে: সময় তোমার প্রোগ্রামে ঠাসা। কিন্তু সেদেশ তো আমাদের দেশ নয়। সেখানে কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা, প্রেম করবার সময় প্রেম কর। কাজেই সেখানে গিয়ে তুমি একটুও প্রেমরস পান করবে না, একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি কখনও একজনকে নিয়ে সুখী হতে পার না। রূপের নেশা তোমাদের চোখে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি মেয়ে কাজেই তোমাদের ছলাকলা আর আমার জানতে বাকী নেই। সুন্দর মেয়ে মনে ধরে তো বিয়ে করে এসো। অবশ্য আমাদের দেশের মেয়েদের তরফ থেকে কিছুটা অভিযোগ থাকবে, কারণ তোমাদের মত কৃতী ছেলেকে দিশি মেয়েদের ভোগে যদি না জোটে তবে সেটা বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আজ আর নয় বন্ধু! ইতি।

পাঁচ

শোনা যায় একদা রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন: তাঁর মত দুঃখী লোক পৃথিবীতে আর কেউ নেই। দুঃখ জিনিসটা সব সময় অবশ্য আপেক্ষিক। কবির একথা শুনে অনেকে হয়ত হাসবেন। কিন্তু সত্যি সত্যি হাসবার কিছু নেই। সৃষ্টির কাজে সীমাহীন বেদনাবোধ না থাকলে সৃষ্টি কখনও সার্থক হয় না। শিল্পীরা সাধারণত আত্মপ্রেমিক, সেজন্য তাদের বেদনাবোধও বিচিত্র ধরণের। নার্সিসিজিম্ শিল্পীদের সহজাত বিলাস।

অমিতাভেরও জীবনে প্রচুর দুঃখ। মানুষ জীবনে কি চায়? তার সকল চাওয়ার শেষ চাওয়া কি? জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা প্রসঙ্গে নাকি একবার বলেছিলেন: ভাল ছেলেরা ভাল ছেলে হয় ভাল চাকরীর লোভে আর সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করবার জন্য। এ কথা হয়ত শতকরা আশিটি ভাল ছেলের পক্ষে প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু বাদ বাকী আর যে কুড়িটি থাকে তাদের জীবনধারা আবার গতানুগতিক খাতে প্রবাহিত না হয়ে এক প্রচণ্ড আদর্শ-বাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাতেই তো বিড়ম্বনা।

জীবনকে বুঝতে হবে। মানুষকে সুন্দর হবার পথ দেখাতে হবে। জীবনে জীবনে যে এত অসাম্য—কেন? কোথায়? এবং কি কারণে? মানুষ কিসে সুখী হবে? মানুষ কি করে নির্মল আনন্দ উপভোগের অধিকারী হতে পারবে? কোথায় সেই চাবিকাঠি?

'ল ইজ্ দ্যা কিং অফ কিংস্। কিন্তু ল ইজ দ্যা চাইল্ড অফ্ পলিটিকস্। রাজনীতি শুধু অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে নয়। রাজনীতি এক কথায় দেশ শাসন করে না। সারা পৃথিবী শাসন করে রাজনীতি। অতএব রাজনীতি সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান।

"রাজনীতি আর রাজতন্ত্র নয়, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। গণতন্ত্র নগণ্য ধনিকের নয়, অগণ্য গরীবের। আজকের রাজনীতি সামান্য ধনিকের নয়, বণিকের নয়, সমস্ত গরীব মধ্যবিত্ত জনসাধারণের। সুতরাং জনসাধারণের আজকের দিনে রাজনীতি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

সেজন্য চাই শিক্ষা। দেশ যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষিত হচ্ছে, ততদিন সমষ্টি-

গত কল্যাণ সম্ভব নয়। অথচ রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত সমষ্টির কল্যাণ কি করেই বা সম্ভব? শুধু গণভোট দিলেই মানুষে মানুষে সমান হয় না। যেহেতু পণ্ডিত নেহেরু একটি ভোটের অধিকারী এবং পাঁচু ধোপাও একটি ভোটের অধিকারী—অতএব পাঁচু ধোপা ও পণ্ডিত নেহেরু সমান—একথা বললে একথার কোন অর্থ হয় না। তফাৎ এই নেহেরু পণ্ডিত মানুষ আর পাঁচু ধোপা নিরক্ষর। কাজেই আমাদের সকলের আগে চাই শিক্ষা। রাজনীতি শুধু নেতাদের একচেটে নয়—এটা সকলের।

টলষ্টয় বলেছিলেন: জনতা যত অশিক্ষিত হয় সরকারের ক্ষমতা তত বাড়ে। সেজন্য সরকার সত্যিকারের শিক্ষার বিরোধিতা করে।

শুধু শাসক সম্প্রদায়ই রাজনীতি জানবে শাসিত জনগণ জানবে না এটা কোন কাজের কথা নয়।

হাতের কাছে বই ওলটাতে ওলটাতে অমিতাভ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক অধ্যায় খুলে বসে। রাউণ্ড টেবল্ কনফারেন্সের সময় জিন্নার চোদ্দ দফার মত বঙ্কিমবাবুর বার দফা বেশ উপভোগ্য। আর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়:

(১) যশের জন্য লিখবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

(২) টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়, লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সেদিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

(৩) যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্যের উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৪) যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থ সাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা

একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।

(৫) যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না, কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া ওঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য লেখকের প্রতি অবনতিকর।

(৬) যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সেই বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

(৭) বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধ ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জর্মণ কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থ সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

(৮) অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে, লেখকের ভাণ্ডারে এ-সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মত আপনিই আসিয়া পৌছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।

(৯) যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সেকথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারিবার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

(১০) সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

(১১) কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গলা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, একথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

(১২) যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গলা সাহিত্য, বাঙ্গলার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গলা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

বঙ্কিমবাবুর বারদফা পাঠ করবার পর অমিতাভের মনে হয়ঃ কোথায় এমন প্রাঞ্জল ভাষায় কোন লেখকই তো আগামীদিনের নবীন লেখকদের জন্য বলেন নি।

গতানুগতিক নরনারীর প্রেম নিয়ে যে সাহিত্য তাতে চমক কোথায়? সেই খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া। লেখকের লক্ষ্য হবে মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন, নয়ত সৌন্দর্যসৃষ্টি। উদ্দেশ্যমূলক বা প্রচারমুলক সাহিত্য হয়ত তুমি রচনা করতে পার; কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টি করতে তো বাধা নেই। বঙ্কিমের এই টুয়েলভ্ পয়েন্টস্ ফর নবীন লেখক হাল আমলের লেখকদের সামনে আদর্শ রেখে পথ চলা উচিৎ। আজকাল তো অনেক লেখককে অশ্লীল লিখে দুদিনেই নাম করতে দেখা যায়। আমাদের সাধারণ পাঠকেরও অশ্লীল রচনার প্রতি একটা মোহ আছে। ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসেও সেই ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে রোমান্সের নামে অশ্লীল চার্ট পরিবেশন করেন। ফলে পাঠকের অতিমানস জগতে যে সুপ্ত ক্ষুধা লুকিয়ে আছে তার পরিতৃপ্তির আধার নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করে তারিফ করে। সাহিত্য হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। নয়ত একটা দেড় হাজার পাতার একটা ঢাউস বই লিখে ফেল। বহু পাঠকেরই আজকের দিনে সে বই পড়বার ধৈর্য বা সময়াভাব হবে। অতএব সমালোচককে লেখকের শ্রমের কথা বিবেচনা করেও বলতে হবেঃ নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষায় নতুন সংযোজন। আর উপন্যাসের মাধ্যমে তো বে-আইনী নায়ক-নায়িকার মধ্য দিয়ে অশ্লীল প্রদর্শনী গড়ে তোলবার যথেষ্ট স্কোপ আছে। সে কথা আর উল্লেখ না করাই ভাল। ভারতচন্দ্রের আমল থেকে আমরা এগিয়েছি না পিছিয়ে আছি সে বিচার করে কে?

বাংলার এক অখ্যাত গণ্ডগ্রাম।

নাম পাঁচদোনা।

অমিতাভের পূর্বপুরুষের পিতৃভূমি। বাড়ির সামনেই ঢাকুরিয়া লেকের মত এক বিরাট দীঘি। তার টল টলে স্ফটিক শুভ্র জলে চাঁদের কিরণ রূপালী আমেজের আসর জমায়।

অমিতাভের বাড়িতে দালান কোঠা আছে। এক সময়ে গ্রামের জমিদার ওর পিতৃপুরুষই ছিলেন। এখন জমিদারী ভাগাভাগি আর বিলি বাঁটোয়ারা হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে পড়েছে যাতে করে অনেককেই চাকরীর সন্ধানে ছুটতে হয়েছে।

অমিতাভের বাবা জমিদারীর অবস্থা দেখে আগেভাগেই বর্মাতে গিয়ে কাঠের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপায় করেছেন। অধঃস্তন দুপুরুষ দুহাতে উড়ালেও সঞ্চয় নিঃশেষ হবার নয়। একটি মাত্র ছেলে অমিতাভ। খেয়াল খুশী মাফিক চলে। কারও কিছু বলবার কইবার তোয়াক্কা রাখে না। বাবাও কিছু বলেন না।

তিনি এখনও বর্মাতেই থাকেন। অমিতাভ লেখাপড়া শেষ করে বাংলা-দেশেই আছে। বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার জলবায়ু অমিতাভের বড় ভাল লাগে। কিন্তু বাংলাদেশের দলাদলি, ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ বড় পীড়া দেয়। বিদেশে ছিল কাজেই এসব ঘরোয়া দলাদলির যথার্থ স্বরূপ সেখানে বুঝতে পারে নি। এমন কি বাঙ্গালী সভ্যতার পীঠভূমি কলিকাতা নগরীতেই 'ললিতকলা মন্দিরম্' নিয়ে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তাতে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু করবারও তো কিছু নেই। গলাবাজি করে চীৎকার করতে তার রুচিতে বাঁধে।

তাই চলে এলো সে পিতৃভূমি পাঁচদোনায়।

এখানকার আকাশ বিরাট, ফাঁকা ও নীল। দীঘির ওপর দিয়ে হংস-বলাকার ঝাঁক দুরাকাশে হাতছানি দেয়। এখানে অনেক কিছু করবার আছে। কিন্তু এখানেও পল্লীসমাজ আছে। তবে অমিতাভের বাবার টাকার জোরে ওদের এখানে অখণ্ড প্রতিপত্তি। মুখের ওপর কেউ কোন কথা বলতে সাহস পায় না। সকলেই সমীহ করে চলে।

বেশ কয়েকটা দিন গদাই-লসকরী চালে শুয়ে বসে আলস্য করে—তর্ক করে—সভাসমিতিতে যোগ দিয়ে—সাহিত্য রচনা করে—ইলীনাকে চিঠি লিখে

সময় কেটে যায়। অবসর মুহূর্তে নানান চিন্তা এসে ভর করে। প্রপার প্লাটফরম্ না পেলে কি করে কাজ করবে? না নিজের উন্নতি, না দেশের উন্নতি কোনটাই সম্ভব নয়।

ইলীনার চিঠিটার একটা জবাব তৈরী করে ফেলে: যা কিছু লিখি নিজের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করেই লিখি। টেকনিকের পরোয়া আমি মোটেও করি নে। সমালোচকেরা কিন্তু বিষয়বস্তুকে গৌন করে টেকনিককেই মুখ্য মাপকাঠি ধরে বিচার করেন। কোন্‌টা যে সত্য তার বিচারের ভার কার হাতে জানি নে!

'ক্যালকাটা হেরল্ডে' বোধ হয় আমার নতুন বই 'পৃথিবী ও তৃষ্ণা'র সমালোচনা দেখেছ। কে যে সমালোচনা করেছেন জানি নে। কারণ সমালোচনার নীচে তো কারও নাম নেই। আর যাই হোক্ এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছি সমালোচক নিজের দলীয় লোক ছাড়া অপর কারও লেখা বিশেষ পছন্দ করেন না। এই যদি সমালোচনার সত্যিকারের রূপ হয়, তবে কার কথায় আস্থা রাখব, বল? সমালোচকদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় মাপবার আমি প্রয়োজন দেখি নে। যেহেতু তাঁরা বৃহৎ পত্রিকার আড়ালে স্থান পেয়েছেন, সেইটেই তাঁদের কৃতিত্ব। আমরা পাই নি—কাজেই আমরা নির্বোধ। দলীয় স্বার্থবোধ মানুষকে কতটা হীন ও নীচ করে তোলে আমার বই-এর সমালোচনা না পড়লে তুমি বুঝতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গেই বঙ্কিমের টুয়েলভ্ পয়েণ্টস্ ফর নবীন লেখক আবার পড়ে নিলুম। মনটা ভাল ছিল না—তাই চোখ বোলালুম। তুমিও অবসর পাও তো পড়ে দেখো।

তুমি আমার দৈনন্দিন রুটিন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেছ। বেশ ভাল কথা। সংক্ষেপে শোন: ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে লিখতে বসে যাই। বাগানের মালী রঘু কনস্ট্যাণ্ট কম্পেনিয়ান। সে বাবুর্চি বেয়ারার কাজও করে। সেই সময়মত বেড টী সাপ্লাই করে। চায়ের সঙ্গে সিগারেটও ধ্বংস হয় কিছু। (তোমার কথা মনে রেখেছি। দিনে কুড়িটির বেশী সিগারেট কোন অবস্থাতেই খাই নে। তবে নির্জন জায়গা, সোসাইটীও নেই, সিগারেটই একমাত্র বন্ধু। কি করব, বল?)

সকাল সাতটায় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যাই। দীঘির পারে ও মাঠের ধারে বেশ এক ঘণ্টা হেঁটে ঘর্মাক্ত হয়ে বাড়িতে ফিরি! একটু বিশ্রামের পর ব্রেকফাষ্ট

রেডি, কাজেই অন্যদিকে মন দেবার সময় নেই। এমন কি খবরের কাগজ দেখবারও সময় হয় না। এর মাঝেই আমাকে স্নান সেরে নিতে হয়।

রঘুটাও যেন আমার গার্ডিয়ান! ছেলেবেলায় আমাকে কোলে পিঠে করেছে। কাজেই মুরুব্বীয়ানা করবার একটা সহজাত দাবী আছে। আমিও বিশেষ কিছু আপত্তি করি নে। কেননা আমার প্রয়োজনের সবকিছু হাতের কাছে পাই। তোমার তো অজানা নয় প্রয়োজনের সময় কাজের জিনিস হাতের কাছে না পেলে আমার মন মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

ব্রেক ফাষ্ট করতে করতেই খবরের কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নি।

এরপর সাড়ে নটা বাজতে আসেন এখানকার স্থানীয় নেতা এম, এল, এ গগনবাবু। চাষীদের ওপর তাঁর অখণ্ড প্রতাপ। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। এ্যাকাডেমিক ডিসটিংশনের চাইতে কাজ করে কর্মীদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন পাতা বড় সহজ কথা নয়। ঘরের কোণে বসে বই মুখস্ত করে তুমি পরীক্ষা পাস করতে পার, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াবার পথ তো সহজ নয়। প্রচুর ত্যাগ আর নিঃস্বার্থ কর্মী হতে পারলেই তা সম্ভব। এ-জিনিস অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ আমি কুঁড়ে লোক। আমি দূর থেকে পথ বাতলাতে পারি। যথা—থিওরেটিক্যালি, কারণ ব্যবহারিক জ্ঞান আমার নেই।

গগন মৈত্র লোকটি ভাল। যেমন অমায়িক তেমনি সাদাসিধে। সকালে আমার সঙ্গে প্রত্যহ ব্রেকফাষ্ট খান। তারপর নানান বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলে। বারোটার আগে সাধারণতঃ তিনি ওঠেন না। তিনি চলে যাবার পরেই আমি জরুরী চিঠি-পত্রের জবাব দিতে বসি। কারণ একটায় আবার খেতে বসতে হবে। রঘুর কড়া হুকুম। নড়চড় হবার উপায় নেই।

দুপুরের লাঞ্চন গড়িয়ে খেতে খেতে তিনটে বাজে। এরই মাঝে দেশ-বিদেশের জর্ণালগুলো একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নি। তারপর তিনটে থেকে চারটে ফুল রেষ্ট।

বিকেল চারটে থেকে ছ'টা আবার পড়তে বসি। সিরিয়াস ষ্টাডি। এ সময় কারও সঙ্গে কোন কথা নয়। দিনরাত্রির ভেতর এ সময়টাই আমি জ্ঞান-সমুদ্রের অতলে ডুবে যাই। একদিকে সমস্ত পৃথিবী আর একদিকে আমি। এ সময়টা আমার সুন্দর পৃথিবী তৈরীর প্রস্তুতিকাল বলতে পার। শান্তি চাই না

ধ্বংস চাই। একদিকে সংস্কৃতি অপরদিকে মহাশূণ্যে ধ্বনিত হচ্ছে ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রগুলোর স্ব-শব্দ হুংকার। সবকিছু রসাতলে পাঠাতে চাও, না এবার শক্তিকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করবার অভিযান চালাবে। কোন্‌টা বন্ধু ? এ-দ্বন্দ্বের কি মীমাংসা হবে না ?

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে ন'টা গগন মৈত্রের বয়স্ক সান্ধ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান। এ-তল্লাটের বহু চাষী পড়তে আসে সেই ইস্কুলে। মোট সংখ্যা দু'শোর কম হবে না। গগনবাবুর বোন প্রান্তিকা এই বিদ্যালয়ের একজন অতি উৎসাহী শিক্ষয়িত্রী। মেয়েটা পড়াবার ঢং ঢাং জানে ভাল। বেশ সুন্দর পড়ান। আমিও মাঝে মাঝে বসে তাঁর পড়ান শুনি। মন্দ লাগে না। বড় মিষ্টি চেহারা। ছোট খাটো মানুষটি। পড়ান শেষ হলে গগনবাবু ও আমাকে প্রান্তিকা দেবী চা করে খাওয়ান।

চা খেতে খেতে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। কি করে দেশের ও দশের শুভ হতে পারে তারও অনেক জল্পনা কল্পনা আমরা করি। অলোচনা স্থানীয় সমস্যা থেকে হাল আমলের সাহিত্যে গিয়ে শেষ হয়। কারণ গগনবাবু ও প্রান্তিকা দু'জনেই জেনে ফেলেছেন আমার সাহিত্যের প্রতি একটু নেশা আছে। সুতরাং আলোচনার শেষ অংশ মধুরেণ সমাপয়েৎ সাহিত্য দিয়েই করতে হয়।

এরপর বাড়ি ফিরি আবেশে ভর করে। মন যেন কোথায় নাই নাই শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়। কিসের একটা অভাববোধ বোবা কান্নার মত বুকে চেপে বসে। তখন তোমাকে খুব বেশী করে মনে হয়। গগনবাবুর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি আসতে তিনটে মোড় ঘুরতে হয়। আর সেই মোড়ের বাঁকে বাঁকে নারিকেল বীথির ফাঁক দিয়ে আকাশের ফালি চাঁদকে দেখা যায়। তুমি যেন ওই চাঁদের দেশে চলে গেছ—অনেক অনেক দূরে। আমাকে হাতছানি দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছ, অথচ তোমার নাগাল আমি পাচ্ছি নে। এ-যেন এক অভিনব খেলা। আমি নায়ক আর প্রকৃতি দুজনে মিলে এক অপরূপ খেলা করে চলেছি। পুরুষ আর প্রকৃতির খেলা যা যুগে যুগে চলে এসেছে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে। প্রকৃতি এখানে প্রতীক বা সিম্বল, কারণ তুমি তো এখানে নেই। নৈসর্গিক আলোর রেখার দ্যুতি রক্তমাংস মানুষের চাইতে কম জোরাল নয়। এর মানে তোমার নারীত্বকে আক্রমণ করা নয়। যা সত্যি—

কারের উপলব্ধি তাই তোমাকে নিঃসংকোচে জানালুম। 'মনের আকাশে কামনার যত তারা নিভে যেতে চায়। আমার কৃষ্ণচূড়ার বন বলে : ডানা কোথায় পাই, কেমন করে মেঘের সাথে উধাও হয়ে যাই।'

রাত ন'টা থেকে দশটা—বিশ্রাম ও আহার পর্ব সমাধা করতে চলে যায়।

তারপর দশটা থেকে বারোটা সাহিত্য অরাধনা।

আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত কথা জানতে চেয়েছিলে—এবারে তাই পূর্ণাঙ্গ চিত্রই দেওয়া গেল। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার পেরিয়ে যদি নৈর্বক্তিক আনন্দের অধিকারী হতে পার তবে সবকিছুতেই একটা নির্মল আনন্দের অস্বাদন পাবে।

সবশেষে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে আজ ইতি টানবো। দেখতে পাচ্ছ বিজ্ঞান আজ গৌরবের চরম শিখরে উঠেছে। দেশ ও কালের বাধা অতিক্রম করে মানুষ আজ দূরকে নিকট করেছে। 'প্রকৃতির শক্তি ভাণ্ডার আয়ত্ত করে মানুষ গতি ও উৎপাদনের রাজ্যে' এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করেছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের প্রীতির ও মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। একে অন্যের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাকে বলা চলে 'বৈরিতা ও বিরোধ'। কেন এমন হলো? ক্ষমতালোভী নরখাদকের মত যদি মানুষ আচরণ করে তবে মানবসভ্যতা ধ্বংস হতে আর বেশী দেরী নাই। কেন মানুষের সুবুদ্ধির উদয় হয় না? বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেমন জোর কদমে এগিয়ে গেছে দর্শনশাস্ত্রের কর্ষণ সেই অনুপাতে অনেক কম হয়েছে। সেজন্যই এই অসামঞ্জস্য, এই বিরোধ।

আজকের জীবনযাত্রা এতই জটিল হয়ে পড়েছে যে একটি এগারো লাইনের কবিতা বুঝতে একজনকে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, অর্থনীতি উদ্ভিদবিদ্যা, প্রণীবিদ্যা, সংখ্যাতত্ত্ব—আরও কত কি জানতে হবে তার ঠিক নেই। একাধিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ আজকের দিনে বাস্তবিকই এক কঠিন সমস্যা। যিনি কলাবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন তিনি বিজ্ঞানের মর্ম জানেন না, আবার যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের ধার ধারেন না। এই অসামঞ্জস্যের জন্যই পৃথিবীতে এত বিরোধ, এত তিক্ততা, এত মন কষাকষি। উপাচার্য ডাঃ দুখনরাম দুঃখ করে বলেছেন : সকল রকম শিক্ষার প্রাণলোকেই দর্শনকে স্থাপিত করা উচিৎ; তবেই দেশকালের গণ্ডীবিমুক্ত সার্বভৌম মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট হবে। পীড়ন, শোষণ, নির্ধন সবকিছু প্রকৃত শিক্ষা পেলে

বন্ধ হবে। মানুষ উদার হবে, মহৎ হবে, আদর্শবাদী হবে। সোনার পৃথিবী গড়বার যে মূলমন্ত্র বা বীজমন্ত্র তারও প্রকৃত গলদ লুকিয়ে আছে শিক্ষার মধ্যে।

জামসেদপুর।

ইলীনা আর জয়তী ড্রয়িং রুমে বসে আছে।

গত সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অশোক ও জয়তীর রেজেষ্ট্রী বিয়ে। বিয়ের পর অশোক কলকাতা রওনা হয়ে গেছে।

বিয়ের পর জয়তীর দেহ ও মনে একটা গভীর প্রশান্তি নেবে আসে। অকারণ খুশীর প্রাচুর্যে দুই সখিতে মিলে অনেক আবোল তাবোল বকে যায়।

জয়তীই প্রথমে বললেঃ বুঝলি বিয়েটা হয়ে যাবার একটা প্রয়োজন ছিল।

ইলীনা হেসে বলেঃ কিন্তু বিয়ের সূচনাতেই যদি অনির্দিষ্ট বিরহ মেনে নিতে হয় তবে তা যেন আরও অসহনীয়। এতদিন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যে মিলনের সেতু তৈরী হলো, সে সেতু দিয়ে আমি চলবার অনুমতি পাব না।

অনুমতি পাবি নে সেকথা তোকে কে বললে? আগামীতে অনুমতি পাবি বলেই তো বুনিয়াদ পাকা করা হলো। এখন এঞ্জিনীয়ার ফাইনাল রিপোর্ট দিলেই গাড়ী চলাচল সুরু হবে।

অর্থাৎ রেজিষ্ট্রেশনটাও ফাইনাল ছাড়পত্র নয়, তুই বলতে চাস কি?

একটি সেতু নির্মাণ হলেই কি গাড়ী চলাচলের ছাড়পত্র পায়! বিশেষজ্ঞের অনুমোদন না পেলে ছাড়পত্র সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হচ্ছেঃ পরিবারের নেতৃস্থানীয় আত্মীয়স্বজনরা।

অনুমোদন পাবার জন্য আবার কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

দেখা যাক্।

দেখা যাক্ কি রে?

স্বামীর আত্মীয়স্বজন এঁদের সবাইকে খুশী করবার জন্য ত একটা চেষ্টা প্রথমত করতে হবে। তারপরও যদি বনিবনা না হয় তখনকার কথা তখন।

তোর ধৈর্যের প্রশংসা করি।

বাঙ্গালী মেয়ের এত অল্পেতে অধীর হলে চলবে কি করে? এতদিনের প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে কি ওভারনাইট নস্যাৎ করা যায়! ওঁরও তাই মত। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাও আপনিই রূপ নেবে। তুলনা কর পঁচিশ বছর আগের ব্যবস্থা ও বর্তমানের ব্যবস্থা।

কিন্তু আমি বলি—

এর মধ্যে আর কিন্তু নেই ইলীনা। সহনশীলতা নারীর একটি প্রধান গুণ। প্রিয়জনের জন্য কৃচ্ছ সাধনায় প্রিয়ার একটা অননুভূত এবং রসাল ও গোপন আনন্দ আছে যা' শুধু অনুভবই করা চলে।

এসব কাব্যিক কথাবার্তা পুঁথিপত্রে যত যুৎসই হয়—বাস্তবে তার রস কতটুকু নিঙড়ে নেওয়া যায়, সেটা ভাববার কথা।

আনন্দ জিনিসটা অনুভবের, একে মাপতে যাওয়া বাতুলতা। পশ্চিমী শিক্ষাটাই ইন্‌টালেকটের, কাজেই তোরা সব জিনিস মাপতে চাস্‌। আমাদের ইনটুইশনের কালচারে অত মাপা-জোকা চলে না—কাজেই কবিকে বলতে হয়ঃ সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়?

বুঝেছি, বৈষ্ণব সাহিত্য বেটে খেয়েছিস্‌। কিন্তু অশোক কি স্বেচ্ছায় এ বিরহ মেনে নিতে রাজি হলো?

অশোককে তোরা দূর থেকে দেখেছিস, কাজেই ভাল করে চিনতে পারিস নি। ওর মত ছেলে বাংলা দেশে দুর্লভ। আমি বললুমঃ বিয়ে পর্বটা এক্ষুনি শেষ করতে হবে। ও বললেঃ তথাস্তু। এখন এরপর যে কোন পরিস্থিতিকেই আমরা সানন্দে মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। কেউ কোন অনুযোগ বা অভিযোগ করব না।

তাহলে তো সব ল্যাঠাই চুকে গেল।

ল্যাঠা চুকলো বললেই কি সব কিছু চুকে যায়। বলতে পারিসঃ ঝামেলা সবে সুরু হলো।

কেন, এরপর আবার কি করতে চাস?

আমি বিয়ে করেছি বলে ওঁর মা-বাবা ভাই বোন কাকেও অস্বীকার করতে চাইনে। ইচ্ছে করলেই সেপারেট এসটাব্লিশমেণ্ট করে অশোককে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারি। কিন্তু তা করব না, মিল মিশ দিয়েই থাকতে চেষ্টা করব।

হাল আমলের আধুনিকার পক্ষে শুভ ইচ্ছা বলতে হবে। কিন্তু শাশুড়ীরা কি সহজে ছেলের অধিকার ছাড়তে চান? যদি বা শাশুড়ী একটুখানি উদার হন, অমনি মেয়েরা এসে রাশ টানতে থাকেন। এমনিই তো সব পরিবারে দেখে আসছি—এ অবস্থার কবে উন্নতি হবে কে জানে?

দেখা যাক্ না শেষ পর্যন্ত কি হয়। ভদ্র ব্যবহার করে কেন শাশুড়ী ননদদের মন জয় করতে পারব না, জানি না! আমি তো খুব ভরসা রাখি একবার বাড়ীতে ঢুকবার অনুমতি পেলে সকলেরই মন জয় করে নিতে পারব।

তবে কি বাড়ীতে ঢুকবার অনুমতি পাসনি এখনও?

সেটা কি করে সম্ভব? বিয়ে তো এখানে রেজিষ্ট্রি করে হয়ে গেল। কথাটা ওঁর বাবা-মাকে জানাতে হবে তো!

তাহলে ওঁর মা-বাবার কি বিয়েতে খুব অমত ছিল?

অমত ছিল কি না জানি নে। তবে অল্প বয়েসী মেয়ে—টাকা-পয়সার স্বপ্ন সব মা-বাপই দেখে থাকেন। সে সব তো আর হলো না।

কেন, তুই কোথাকার বুড়ী?

বুড়ী ছাড়া আর কি! কলেজের সহপাঠীকে কি বাড়ীর লোকের মনে ধরে?

আমার কিন্তু এ-বিষয়ে পাশ্চাত্যের মতটাই ভাল লাগে। বিয়ের পর বাপ-মাই ছেলে বৌ-কে আলাদা সংসার পেতে দিয়ে আসেন। এজন্য তাদের অভিযোগ নেই। ছেলে-বৌও সুবিধে মত এসে বাপ মায়ের সঙ্গে দেখা করে যায়। সম্বন্ধ-ও মিষ্টি মধুর থাকে। একসঙ্গে থেকে দৈনন্দিন ব্যাপারে খিটিমিটি করার চাইতে এ-অনেক ভাল।

এ-ব্যাপারে আমাদের প্রথম বাধা সমাজ ব্যবস্থা। দ্বিতীয় বাধা অর্থনৈতিক বাধা। পাঁচজনে জড়িয়ে থাকতে না পারলে আমাদের সংসার চলে না। কারণ সবকটি ছেলের আয় সমান নয়। বাপ মা চান না তাদের অভাবে যে ছেলেটি নিকৃষ্ট সে বানের জলে ভেসে যাক্। অন্য ভাইরা হচ্ছে তার সেফ্‌গার্ডস।

এসব ব্যাপার তোরা বুঝিস্ ভালো। কারণ আমি যে পরিবেশে মানুষ তাতে যৌথ পরিবার প্রথা সম্বন্ধে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। ভাই-বোন বলতে আমিই আমার পিতার একমাত্র সন্তান।

শুনেছি আমাদের দেশে যেমন স্নেহের বাঁধা বা উট্‌কো মায়া পাশ্চাত্যে এসব ভাবালুতার অবকাশ বড় কম। ওখানে জীবন বাস্তবধর্মী। জড়বাদীর দেশ বলে আমরা নাসিকা কুঞ্চন করি, কারণ আমরা আধ্যাত্মবাদী। এই অহংভাবের জন্য অবশ্য অনেকশুভ জিনিসের ব্যবহারিক জ্ঞান আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু একটু আগেই তো ইন্‌টিলেক্‌ট্‌ আর ইন্‌টিউয়িশন্‌ নিয়ে পার্থক্যের ভেদাভেদ সৃষ্টি করে ভারত-মহিমার গুণকীর্তন করছিলি। তোর উক্তি তো বড় সামঞ্জস্যহীন।

ভারত-মহিমার গুণকীর্তন করলেই যা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয় তেমন জিনিসের সমালোচনা করব না—এ তোর কোন্‌ দিশি কথা ?

চটিস্‌ কেন বাপু, তোদের ত্যাগের মন্ত্রে ভোগের গন্ধ পেলে আমাদের যেন কেমন কেমন লাগে। যাক্‌ গে বিয়ের পর অশোককে পেয়ে তোর উপ-লব্ধির কথা একটু বল্‌। এসব ভূতের কচ্‌কচি করে আমাদের লাভ কি ?

জয়তী হেসে বলেঃ তুই ভীষণ দুষ্টু। ফাঁকি দিয়ে সব কথা শুনতে চাস্‌, নারে ?

রসের কথা কার না শুনতে ভাল লাগে।

উপলব্ধিটা বোধ হয় গতানুগতিক। কতগুলো শিরা-উপশিরার কম্পন। তবু রোমাঞ্চ আছে বৈ কি ? বিয়েটা কর না সবই বুঝতে পারবি।

তুই চালাক মেয়ে, নিজের কাজ বেশ গুছিয়ে নিলি।

তোকেই বা চালাক হতে না বলছে কে? অমিতাভকে লিখে দেনা ?

আমার মানুষটি তোমার মানুষ নয়। তাঁর ভাবাবেগ আর আদর্শের কাছে নারীর প্রেম অতি তুচ্ছ। অর্থনৈতিক সমস্যা বাধা নয়—পারিবারিক সম্মতি উভয় পক্ষেই অবান্তর—তবুও দুস্তর বাধা। একেই বলা চলে ভাগ্য।

বলিস্‌ তো তোর হয়ে আমি অমিতাভকে লিখে দি।

লিখলে কি ফল হবে কিছু ? আচ্ছা, তোর মা হতে ইচ্ছে করে না ?

সলজ্জ ভঙ্গীতে জয়তী বলেঃ নারী হয়ে তুই নারীকে একথা জিগ্‌গেস করছিস্‌, তোর লজ্জা করে না। নারীর ইচ্ছে না থাকলে সৃষ্টি এতদিনে রসাতলে যেতো।

মা হয়ে ছেলেমেয়েকে মনের মত করে মানুষ কর। তাইতেই বংশের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ।

মাতৃত্ব নারীর এক চরম সম্পদ ও চরম গৌরব। পুঁথিপত্রের একথা অস্বীকার করবার নয়। একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যখন নিজের জীবনে প্রতিভাত হয়, তখনই তাতে আনন্দ।

আমি নারী হয়েও একটি কথা ভাবি জানিস্ঃ নারী না হয় নিজের দায়ে শিশুকে মানুষ করলো কিন্তু আগামীতে শিশুর কাছ থেকে প্রতিদানে পাবে কি? প্রশ্নটা স্থূল বাস্তব প্রশ্ন—কিন্তু এই বাস্তব স্বপ্নে যখন ব্যর্থতার সুর লাগে তখনই মানুষ রোষায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু কালিদাস রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখতে পাইঃ প্রেমের সঙ্গে মঙ্গলের যোগ না থাকলে প্রেম মরণকে ডেকে আনে। বৃহত্তর প্রেম আর মঙ্গলকে তাই তাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করেছেন। দেহগত রূপজ প্রেম ক্ষণিক উন্মাদনামাত্র। কারণ দেহের লাবণ্য চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমেরও মৃত্যু হয়।

ভারতীয় বিয়েটাই একটা সামঞ্জস্য। এ্যাড্জাষ্টমেণ্ট এবং কম্প্রোমাইজ হচ্ছে বড় কথা। সন্তান কামনা করাও ভারতীয় ধর্মের অঙ্গীভূত।

যাই হোক্, তোকে দেখে মনটা বেশ হালকা মনে হলো। এই স্বল্প মেয়াদী নারী জীবনে যদি চিন্তা ভাবনা করতে করতেই অর্ধেকের বেশী কাটিয়ে দি, তাহলে আর ঘর করবো কদিন? প্রকৃতি তো ভাবাবেগকে ক্ষমার চোখে দেখবে না?

তাই তো বলিঃ আমি অমিতাভকে লিখে দি। তুই মিছেমিছি ঘরে বসে বিরহের সেতু তৈরী করবি আর আমি তোর বন্ধু হয়ে দীর্ঘশ্বাস শুনবো—এ কখনও হতে পারে না। তুই বল দেখি তোর জন্য আমি কি করতে পারি? এত লেখাপড়া শিখলি অথচ নিজের দাবীটাকে পেশ করতে শিখলি নে—হেমিংওয়ের হুইলে মাছে-মানুষে খেলা দেখেছিস তো—এ খেলাও অনেকটা সেই রকম—দাবীটাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাহস অর্জন করতে হবে।

নারীর সরম সংকোচ সব বিসর্জন দিয়ে? এমনিতেই তো ছেলেদের অভিযোগ আধুনিকা শিক্ষিতা মেয়েদের পুরুষালী ভাবটা অতীতের কাব্যিক আবহাওয়া থেকে অনেক যোজন দূরে ঠেলে দেয়। নারীর ভেতর আর

যে গুণই থাকুক কবিতা থাকা চাই। গদ্য পুরুষের। পদ্য নারীর।

গদ্য পদ্য করবার সময় কলেজের তরুণ-তরুণীদের। তখন তারা এসব জিনিসে আনন্দ পায়। তারপর সংসার জীবনে প্রবেশ করবার পর একদা কাব্যের সঙ্গিনী মা হয়, 'তখন তার কাব্যের গুঞ্জন, বসন্তের বাতাস, ভ্রমরের গুঞ্জন সব চলে যায়।'

নারী-পুরুষের ইন দীজ্ ডেজ্ অফ্ ইকোয়ালিটি—তবু বলব নারীকে পুরুষের মনোমত শিক্ষা পাওয়া উচিত।

'এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?'—বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোর বর্তিকা নিয়ে একদা যে নারী পুরুষের সমকক্ষ হবার জন্য লড়তো, তার মুখে আজ আপোষের বাণী। এতটা নতি স্বীকার!

কারণ বিষয়টা তুই একবার তলিয়ে দেখ্ না—পুরুষের এ্যাকটিভ্ রোল, মেয়েদের প্যাসিভ্। যারা সকর্মক তারা এমনিতেই সবল, অকর্মকরা পারবে কেন তাদের সাথে?

তোর চিন্তাধারার দৈন্য বোধহয় অধিক বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো থাকা। কারণটা আমার মনে হয় সাইকোলজিক্যাল্।

সে তুই গবেষণা করে যা ইচ্ছে বের কর আমার কোন আপত্তি নেই। আমার যা উপলব্ধি তাই বললুম।

উচ্চ চিন্তা, গবেষণা, উপলব্ধি সবই ভাল জিনিস। ঠিক খাওয়া-পরার মতই মানুষের কতগুলো প্রাথমিক চাহিদা আছে। দেহের দাবীটাও তার অন্তর্গত। সভ্যতার পলেস্তরা তুমি যতই চাপাও এ-দাবীকে অস্বীকার করবার তোমার উপায় নেই। যদি বঞ্চিত কর তবে নিজেরই ক্ষতি।

আমার অনেক দেবার আছে, অথচ গ্রহণ করবার মানুষ নেই।

তোর কথা শুনে একটি গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা শোন্ঃ এক অষ্টাদশী সুন্দরী তরুণী যুবতী তার সর্বকুলপ্লাবী যৌবন নিয়ে এসে দাঁড়াল পৃথিবীর বুকে। এই অপূর্ব রূপসীর অভিযোগ তাকে ভালবাসার পৃথিবীতে কেউ নেই। এমন কি ছেলেবেলায় তার সঙ্গে খেলাধূলা করেছে তারাও ফিরে তাকায় না। তার দুঃখ কি সহজ দুঃখ!

কি রে তোর গল্প রূপক নয় তো? আমাকে নিয়ে কটাক্ষ করছিস না তো?

একেবারে নিছক গল্প—কোন বাস্তব চরিত্রের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ নেই।

বেশ। তাহলে বলে যা—

কিন্তু একদিন ঝর্ণার ধারে একটি যুবকের ওই যুবতীটিকে খুব ভাল লাগে। ফলে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতেও সময় লাগে না। শহরের উপকণ্ঠে, পাইন বনের ধারে, সিনেমা থিয়েটার সর্বত্রই এই প্রেমিক যুগলকে দেখা যায়। ওই ছোট্ট শহরের সকলেই ওদের নিয়ে আলোচনা সুরু করে। তারপর পাড়ার এক বর্ষীয়সী মহিলা একদিন ডেকে মেয়েটিকে সাবধান করে দেয় এই বলে: যে-ছেলেটির সঙ্গে তুমি রাতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ—ওতো বিবাহিত। ছেলেটি নির্ঘাত তোমাকে প্রতারিত করবে। মেয়েটি এ-নিষেধ এতটুকু গ্রাহ্য করে না। সে মনে মনে ভাবে যে মানুষ তাকে এত আনন্দ দেবার ক্ষমতা রাখে সে কখনও বেদনা দিতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘ ছয় মাস পর একদিন সেই বেদনার দিন ঘনিয়ে আসে। ছেলেটি মেয়েটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। মেয়েটি অন্তরের নিষ্করুণ বেদনা নিয়ে আপন মনে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে। তাইতো এ-কি হলো? কিন্তু এদিকে দিনের পর দিন বহুপুরুষ এসে তার দুয়ারে ধর্ণা দিতে সুরু করে। একদিন যে ভালবাসার জন্য লালায়িত ছিল, আজ সেই ভালবাসা বহুজনের কাছ থেকে অযাচিত ভাবে এসে তার পায়ে লুটালো। কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন জাগলো মেয়েটির মনে। নতুন নতুন প্রেমিকদের ধারণা একবার যখন মেয়েটি আত্মদান করেছে তখন তারাই বা কেন তার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে! যতদিন কলঙ্ক রটেনি, প্রেমিকদের দেখা পায় নি—কিন্তু যেমনি কলঙ্ক রটলো বহু প্রেমিকের ভিড়। গল্প এখানেই শেষ।

তা হলে এ গল্প থেকে কি এ্যানালজি ড্র করতে চাস্।

মেয়েদের অল্পে অধীর হতে নেই। ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করে গভীর গবেষণার পর আত্মদানের প্রশ্ন বিচার করতে হবে। গ্রহণ করবার মানুষ নেই বলে যে আক্ষেপ, ও-কোন কাজের কথা নয়। তারপর তুই একজন উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলা, তোকে এ-বিষয়ে কি বলব? ভারতের সমাজব্যবস্থাও তোর অজানা নয়।

তোর রিডিং কিন্তু চমৎকার। এতদিন ধরে দেখে তুই আমাকে এই চিন্‌লি!

আমি সমস্ত নারীসমাজের মুখপাত্রের কথাটাই বললুম। শুধু তোর কথা বলিনি। মেয়েদের বিচলিত হতে নেই। ধৈর্য ধর্, ধৈর্য ধর্। বহু অতিথি আসবে যাবে তার ভেতরে বিশেষ অতিথিকে বেছে নিতে হবে। আর তোর কথা তো স্বতন্ত্র, তুই তো আগেই নির্বাচন করে রেখেছিস।

তোর বক্তৃতা কি একনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে? না অন্য কিছু বলতে চাস্? ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে স্কুল গোয়িং কিডিসদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিস্।

অপরাধ হয়েছে। ক্ষমা কর।

ক্ষমা করবার কথা নয়। বিয়ের পর বাচাল হয়েছিস।

হেসে জয়তী বলে: যা বলবি—বল! তোর ইচ্ছেতে বাধা দেবো না।

ঘরের কোণে নীচু পর্দায় রেডিওটা বেজে চলেছিল। গান, বাজনা, বক্তৃতা কত কি হয়ে যাচ্ছে। ইলীনা ও জয়তীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। কিন্তু এবারে রেডিওর কণ্ঠস্বর দুজনকেই আকর্ষণ করে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলে যাচ্ছেন: শিল্প আনন্দের জন্য, হাসির জন্য, আত্মার উন্নতি ও মানুষের প্রয়োজন মিটোবার জন্য। যদি আমরা শিল্পকে উপলব্ধি করতে পারি তাহলে আমরা ভারতের শিল্প ঐতিহ্যকে অতীতের চাইতে অধিক গৌরবান্বিত করতে পারি।

ইলীনার মনে হয় এ তো অমিতাভের কথা। অমিতাভ এসব কথা অনেকবার অনেক অকেশনে বলেছে। ভাষার হেরফের হতে পারে কিন্তু বিষয়বস্তু হুবহু এক।

এমন সময় জয়ন্ত এসে উপস্থিত হয়।

জয়তীর বিয়ের পরে এই আত্মভোলা লোকটা যেন কথায় অকথায় অকারণ খুশীতে উচ্ছল। জীবনের এক মস্ত গুরুভারের বোঝা অপসারিত হয়েছে সেকথা যে-কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে।

ইলীনা ভাবে: মেয়েরা কি সত্যিই ভাই-এর এ-তো বোঝা? তারা যত লেখাপড়াই শিখুক তারা কি পুরুষ অভিবাবক ছাড়া চলতে পারে না! জয়তী তো নিজেই সেলফ্ সাপোরটেড্ ছিল। দিনান্তে জয়ন্তের সঙ্গে কতটুকু দেখা সাক্ষাৎ হতো—কথাই বা কতটুকু হতো? কারণ জয়ন্তের এই তৃপ্তির নিঃশ্বাসের মধ্যে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার গোপন কলঙ্ক লুকিয়ে আছে সেকথা বুঝবার ক্ষমতা ইলীনার আছে।

ইলীনার মনটা বিশ্লেষণী। সে ছোটখাট জিনিসের মধ্যেও গভীর সুরের গভীর কথা খুঁজে পায়। মেয়েদের স্বাধীন হতে হলে বাপ ভাই-এর এ-জাতীয় মনোভাব বর্জন করা উচিত। নতুবা পরস্পরের বিশ্বাস স্থাপন কি করে হবে! আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভর হতে হলে অপরপক্ষের আস্থা অর্জনও একটা বিশেষ প্রয়োজন।

জয়ন্তই কথা বললে: ইলীনা, তোমরা চুপচাপ. ঘরের মধ্যে বসে আছ কেন? ন'টার শো-তে সিনেমা দেখে এলেও তো পারতে? আর আগামী-কাল বিকেলে আমাদের হাসপাতালটা দেখে এসো, ভাল লাগবে।

কেন আমরা বসে বসে গল্প করছি। মন্দটাই বা কি?

আনন্দ চাই। মানুষের জীবনে বিভিন্ন আনন্দ চাই। কোনটাকে দিয়ে কোনটার পূরণ হয় না। তুমি যদি বল অমুক আনন্দটাকে আমি গ্রহণ করব না—তার পরিবর্তে ওই আনন্দের শূন্যস্থানকে এই আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে রাখবো।—তাহলে ঠিক হলো না। মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যায়।

সেজন্যই বুঝি দ্রুত সিনেমা শিল্পের প্রসার কামনা করছ।

না, ঠিক তা নয়। তবে সিনেমা আজকের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

যাক্ সিনেমা শিল্প থাক। জয়তীর তো একটা গতি হলো এখন তোমার গতি কবে হবে জয়ন্ত-দা?

দেখছ না আমার কত কাজ। এসব বিলাসিতা করবার আমার সময় কোথায়?

জয়ন্ত-দা তুমি কি রক্তমাংসের মানুষ না অন্য কিছু? মানুষের প্রাথমিক চাহিদা উপেক্ষা করে তুমি সংসারে সাফল্যের বরমাল্য পাবে এ তুমি আশা করো না। নারীকে অস্বীকার করার মধ্যে পুরুষের কোন স্বতন্ত্র কৃতিত্ব নেই।

ইলীনা তুমি বড্ড বেশী ডেঁপো হয়ে গেছ।

সত্যি কথা বললে রাগ তো হবেই। অন্য কোথায়ও মন বাঁধা নেই তো? যদি থেকেই থাকে বলে ফেলো—আমরা ঠিক করে দিচ্ছি।

বড় ভাইকে বেশ সম্মান দিচ্ছ তোমরা!

শিক্ষিত হয়েও যদি নারী-পুরুষের জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি নিঃসংকোচ মনে আলোচনা করতে না পারি, তবে সে শিক্ষায় কি লাভ আছে জয়ন্তদা?

বুঝেছি, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছ ?

মেয়েদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে দেবে, অথচ স্বাধীন মত প্রকাশের অবকাশ দেবে না, তোমাদের এই যে মুরুব্বীয়ানা ও বসিং অ্যাটিটিউড্ এতে কখনও মেয়েরা স্বাধীন হতে পারে না।

যা স্বাধীন হয়েছ—তাইতে আমরা অস্থির, আর বেশী স্বাধীন হলে আমরা ঘর ছেড়ে বনে যাব।

তোমরা পুরুষেরা বড় কনসারভেটিভ। নিজেদের অধিকার এতটুকু ছাড়তে চাও না।

অধিকার আমরা পেলামই বা কোথায় আর রক্ষা করছিই বা কি করে জানিনে।

আর জেনে কাজ নেই। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। এবারে যাও সিনেমা দেখে এসো। সময়ও হয়ে গেছে। টিকিট দুটো রাখো। তর্কের কি শেষ আছে ?

সকালে অমিতাভ ও অমিত দুজনেরই চিঠি আজ এক সঙ্গে ইলীনার নামে এসেছে।

দুটি চিঠিরই বক্তব্য ইলীনা মনে মনে বিচার করে। টুকরো টুকরো ছেঁড়া ছেঁড়া কথা মনের কোণে উঁকি দেয়।

সবচেয়ে চমক লাগে গগনবাবুর ভগ্নী প্রান্তিকা দেবীর চা-খাওয়ানো ব্যাপারটা। বস্তুত চা-খাওয়ানো ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। কিছুদিন আগে মেট্রোতে 'টী-এণ্ড-সিমপ্যাথী' নামে পরিচালক ভিনসেণ্ট মিনেলীর একটি ছবি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। পাত্রপাত্রীদের মধ্যে প্রধান এক কৈশ-রোত্তীর্ণ তরুণ ও তার শিক্ষকের স্ত্রী। ছেলেটি নিজের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশতে পারতো না, বড্ড লাজুক। কিন্তু ছেলেটি শিল্প-রসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। খেলা-ধুলার প্রতি তার নজর নেই। ওর মেয়েলীপনা স্বভাবের জন্য বন্ধু-বান্ধবের বিদ্রূপের শেষ নেই। তরুণটির জীবন যখন বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে চরম অবস্থায় ওঠে তখন তার শিক্ষক পত্নীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। এক কাপ চা অথবা একটি দুটি মিষ্টি কথায় ছেলেটির জীবন ভালবাসার

মধুর আস্বাদ পায় আর তাই নিয়েই চমকপ্রদ প্রণয় কাহিনী—ফিল্মের বিষয়বস্তু।

কিন্তু এ-গল্প ইলীনার কেন আজ মনে পড়ছে? 'টী এণ্ড সিমপ্যাথী', অমিতাভ, প্রান্তিকা দেবী, সান্ধ্য আসর, একটুখানি চা, দুটো মিষ্টি কথা! শিল্পীরা নিঃসন্দেহে ভাল প্রেমিক হতে পারে, কিন্তু তারা বড় দুর্বল চিত্ত। অপরের জন্য বেদনায় মন তাদের স্বতঃই উৎকণ্ঠিত। ওই প্রণয়মূলক ছবির সঙ্গে অমিতাভ—প্রান্তিকাকে জড়িয়ে নিয়ে ইলীনা চলে যায় এক 'সুদূর ও মধুর' কল্পনায়। কিন্তু 'রিম্ ঝিম্ ফিস্ ফিস্ তুষার ও ঝিলমিলে' কন্‌কনে বাতাসে হাড় কাঁপুনি শিহরণ অনুভব করে। শিক্ষিত মন সাধারণত রুচিপ্রধান প্রেমের বলিষ্ঠ ও উদার বহিঃপ্রকাশ কামনা করে। ইলীনার মনের প্রশস্ততাও বড় একটা কম নয়। অমিতাভকেও সে বিলক্ষণ জানে। তবু কেন জানি নারীজনোচিত এক অহেতুকী ঈর্ষা এসে তাকে ভর করে। বিচারশক্তি ও যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে মনে মনে লজ্জিত হয় সত্য, তবু একটু কিন্তু থেকে যায়। এই 'কিন্তুই' সাধারণ নারীর সাধারণ মনের কথা। তাহলে ইলীনাও কি সে দোষে দোষী? 'রসের অনুভূতিতে, সুন্দরের উপলব্ধিতে বিশ্বের সকল মানুষ একই সুরে বাঁধা।' তাই ভয় হয়। 'এই ভয় ওঠে মনে এই ভয় ওঠে—কানু হেন প্রেম যেন তিল নাহি টুটে—'........অমিতাভের প্রেমও যদি রূপ হতে রূপে, রস হতে রসে সংক্রামিত হয়—তবে?

অমিতাভ আদর্শবাদী।

সে প্রেমিক কিন্তু আত্মভোলা তাপস। নারীচিত্ত তন্ময়তার এক দুর্লভ খনিবিশেষ। ধরা ছোঁয়ার মধ্যে অমিতাভ নেই। এক কথায় একটি অদ্ভুত মানুষ সে। ব্যক্তির চাইতে সমষ্টির কল্যাণে সে বিশ্বাসী। কিন্তু ব্যক্তিকে নিয়েই যে সমষ্টি সেকথা যেন অনেক সময় সে ভুলে যায়। হৃদয় নিয়ে তার কারবার। তার বিষয়বস্তুহৃদয়নির্ভর। সাপ নিয়ে খেলার মত হৃদয় নিয়ে খেলাও তো মারাত্মক ব্যাপার। কতখানি ডিটাচড্ থাকলে পরে নৈর্বক্তিক অভিজ্ঞতা একটি সাহিত্যিক সঞ্চয় করতে পারে—সেকথা ঠিক বোঝা যায় না। তবে অমিতাভকে যে সকল মেয়ের ভাল লাগবে—সেকথা মেয়ে হয়ে ইলীনা বেশ বুঝতে পারে।

প্রেম কি শুধু বিশেষ বয়সের বিশেষ আকর্ষণ, না তার ওপরেও কিছু? দেহের দাবীর চাইতে মনের দাবীই বা কম কি? দেহ ও মন যে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। একে বাদ দিয়ে ওকে চলে না।

অমিতাভ সাহিত্য রচনা করে। অমিতাভ সাহিত্যিক। 'মহৎ সাহিত্য অসংখ্য দেশে অনেকবার স্বকীয় ওজস্বীতা এবং প্রসাদ গুণে সমাজের রূপ মানুষের চিন্তা ও রুচির পরিবর্তন সাধন করেছে এবং দেশ ও জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছে।' কাজেই সাহিত্য হৃদয়নির্ভর হলেও অমিতাভের দায়িত্ব প্রচুর সেকথা ইলীনা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করে। সুন্দরের সৃষ্টি করতে গিয়ে নর-নারীর বাছাই করা মনের কথা লিপিবদ্ধ করলেও সমাজ কল্যাণের বৃহৎ দিকটা উপেক্ষা করা চলে না। 'সংস্কৃতিকে সমাজের হাতে নিরঙ্কুশভাবে সমর্পণ না করেই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার ভেতর দিয়েই সংস্কৃতি ও সমাজ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছাড়া সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণ অসম্ভব।' সেজন্যই প্রয়োজন আত্মলোভ নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা নিষ্ঠার। চারিত্রিক কাঠামো দৃঢ় না হলে কোন জাতি বড় হতে পারে না। অমিতাভ এ জিনিসটি ভালভাবেই রপ্ত করেছে। তাইতো ওকে ভাল লাগে। সাহিত্য সৃষ্টির রূপায়ণে রচনাশৈলীর খাতিরে যেমন চরিত্রের সম্পূর্ণতার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী—তেমনি নারীর জীবনেও পুরুষের চরিত্র চাই। নচেৎ শিক্ষিত রুচিপ্রধান নারীমন তৃপ্ত নয়। 'চিরন্তনকে নতুনরূপে প্রকাশ করাই নবীনত্ব। চিরন্তনকে আমিত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করাই সাহিত্যসৃষ্টি।' কিন্তু সবকিছুর ওপরে মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথ আঁকড়ে থাকতে হবে—দেশকে উন্নততর করবার সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত সাহিত্যের ভেতর দিয়েই জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। নতুন মানুষ তৈরী করবার ব্রত আজ সাহিত্যিকের হাতেই। তাঁরাই দেবে পথনির্দেশ। সুতরাং সাহিত্যিকের দায়িত্ব আজ সুদূরপ্রসারী। মিনমিনে বোবা প্রেমকে বলিষ্ঠ ও দীপ্ত ভাষায় রূপ দিলেই সাহিত্যিকের কর্তব্য শেষ হলো—এই যাঁরা মনে করেন তাঁদের সাহিত্য অচিরেই বুদবুদের মত মিলিয়ে যাবে। আর্টের খাতিরে আর্ট। সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। সবই ভাল কথা। কিন্তু সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া বা মানুষের সুন্দর জীবনাদর্শকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে কতগুলো অবভাব ও কল্পিত কাহিনীকে ফুলিয়ে কাঁপিয়ে রূপ দিলেই সাহিত্য

সৃষ্টি হলো—এই যাঁদের ধারণা তাঁদের সঙ্গে ইলীনার মতের এতটুকু মিল নেই। কি করে মানুষ অধিকতর জ্ঞান লাভ করে আপন আপন বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সব জিনিস যাচাই করে সুন্দর ও আদর্শ জীবন যাপন করতে পারে সাহিত্যিককে তার চাবিকাঠি বাতলে দিতে হবে।

অমিতাভ টোয়েনবীর ইতিহাস পাঠ করেছে। লিখেছে: এই ইতিহাস পাঠে এক নতুন আলোর সন্ধান পাচ্ছি। মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতা, মহেঞ্জো-দাড়ো ও হারাপ্পা সভ্যতা, বেদ, উপনিষদ্ তন্ত্র ও ষড় দর্শনাদি, জেন্দাবেস্তা, বৌদ্ধ জৈন ধর্ম—চীনে লাউৎজে ও কন্‌ফ্যুসাসের অবির্ভাব—গ্রীসে সক্রেতিস-প্লেটো-আরিস্ততল—রামায়ণ মহাভারত, ভাস-কালিদাস, ইস্কিলাস, সোফো-ক্লিস এরিষ্টোফেনিস—রোমান সভ্যতা—শার্লেমী—সাম্রাজ্যবাদ—আমেরিকা আবিষ্কার—সিপাহী বিদ্রোহ—সবকিছু মিলে বৃহৎ মানব পরিবারের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক গভীর সুর ধ্বনিত হয়। এক পৃথিবী গড়বার যে স্বপ্ন তা আর আজ শুধু কল্পনা নয়—বাস্তবে মূর্তরূপে প্রতিভাত হবার সকল চিহ্নই পরিস্ফুট।

অমিতাভ যেন সাধারণ জিনিস আর সাধারণভাবে দেখতে পায় না। সব কিছুতেই গভীর দর্শন খুঁজে বের করাই তাঁর কাজ। বিপর্যস্ত ও লাঞ্ছিত মানবতাকে বাঁচিয়ে কি করে মনুষ্যত্বের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে তারই চেষ্টায় তার সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য সবদাই উন্মুখ। দেশ-কাল-পাত্র ও গণ্ডীর উর্ধ্বে যে মানব সমাজ—তারই কল্যাণ কামনায় তার মন ব্যস্ত।

চিপ্ পপিউল্যারিটি বা ষ্টানট্ দিয়ে পাঠককে কদিন ভোলাবে? আসলে লেখকের আত্মবিশ্বাস এবং জনচিত্তের ওপর কতখানি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তার সাফল্যের সিঁড়ি তৈরী করবে অর্থনৈতিক সাকসেস্। কারণ যুগটা বৈশ্য যুগ।

ও সব ভাবনা থাক।

ইনটারলুড্‌কে মধুময় করবার টেকনিক কালচার করতে হবে। কিন্তু এলোমেলো আদিম অরণ্যের হাতছানি মনকে সময় সময় বড় উদাস করে তোলে। কি করা যায় সেটাই সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

জীবনকে বাদ দিয়ে শিল্পী যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছে। শিল্পীর কাজ 'মানব চরিত্রে যে সমস্ত সম্ভবপরতা আছে, সেইগুলিকেই ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে গল্পে নাটকে বিচিত্র করে তোলা।' এসব সূক্ষ্ম কাজ করতে গিয়ে যদি শিল্পী নিজেকে বঞ্চনা করে বসে—তাহলে তো গোটা

জীবনটাতেই একটা মস্ত বড় শূন্যের অঙ্ক হা করে দাঁড়িয়ে থাকবে। এসব কি কথা ভাবছে ইলীনা? সে কি চায় তার প্রেমিক নিজের মহান্ ব্রত থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু রূপসী তরুণী নিয়ে ভোগবাসনায় ডুবে থাকুক। সমাজের কাছে, দেশের কাছে, শিল্পীর দায়িত্ব, তাঁর প্রেমিকার দায়িত্ব হতে এতটুকু কম নয়। আমাদের সাধনা তো আত্মকেন্দ্রিক হবার সাধনা নয়। আধ্যাত্মিক ভারতের মূলমন্ত্র হচ্ছে: ত্যাগ। ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমরা বড় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি। নিজের ব্যক্তিগত সুখটাকেই বড় করে দেখি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যৌথ পরিবার প্রথায় পূর্বে যে সুখ ছিল আজ আর তা নেই। বিকলাঙ্গ সমাজব্যবস্থায় মানুষের স্বার্থবোধ নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

কিন্তু প্রেম? প্রেমকে অস্বীকার করি কি করে? সেজন্য কেউ বলছেন: 'প্রেমের দেবতা অন্ধ। প্রেম ছেলেমানুষ। প্রেম চিরশিশু। প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ, প্রেম দুঃখ সহচর। বিরহের অন্ধকার নহিলে প্রেমের কিরণ স্ফুটতর হয় না। বেদনার স্পর্শ ব্যতীত প্রেমের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব।' আবার কেউ লিখেছেন: প্রেমই জীবনের শক্তি, শান্তি, স্বস্তি, আনন্দ, রস। প্রেমের বর্তমান তাই জীবন, অবর্তমান তাই মৃত্যু।

'প্রেমে নিষ্ঠার প্রশ্ন। আর সর্বভূক এক নারীতে প্রীত নয়। অগ্নি প্রেম গরবিনী, স্বাহা প্রেমে একনিষ্ঠা, সে এক পুরুষ প্রীতা। অগ্নির তৃষ্ণার শান্তি তাই স্বাহা; বহু নারী প্রীতির শান্তি এক পুরুষ প্রীতার একনিষ্ঠ আলিঙ্গনে। কিন্তু অগ্নি যখন এ-তত্ত্ব উপলব্ধি করে স্বাহা তখন দূরে সরে যায়। অগ্নি স্বাহাকে আজও পায় নি, তাই সে অতৃপ্ত। বর্তমান জগতেও অগ্নির মত সর্বভূক প্রেমিকের অভাব নেই। তাদের বুকেও অগ্নির প্রদাহ; তাদের বুক জোড়া হাহাকারের শান্তি হতে পারে অনুরূপ ভাবেই।

'প্রেম দেহকে অস্বীকার করে না, অতিক্রম করে। প্রেম কাম নয়, কিন্তু কামভিত্তিক। কাম যদি হয় কুসুম, প্রেম তার সৌরভ।'

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায়: অমিত আধুনিক ছিল আচরণে, লাবণ্য ছিল আত্মায়। অমিতের প্রেম ভাববিহীন গ্রন্থী; কিন্তু লাবণ্যের থিসিস্ বৈপ্লবিক, প্রেম অপরিবর্তনীয় অর্ঘ—দেওয়া যায়, ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।'

এ যেন চিরন্তন নারীমনের শাশ্বত উক্তি। অমিতাভকে ভালবেসেছে সে, প্রকৃত কল্যাণবুদ্ধির প্রেরণাতেই ভালবেসেছে। এ-ভালবাসার জন্য তার গৌরবের শেষ নেই। মানুষ হয়ে মানুষকে ভালবাসতে পারার যে মহত্ব তা মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পেরে এক নতুন আলোর সন্ধান পায়। জীবনে ভালবাসা ছাড়া আর যেন নতুন কোন পথ নেই। এই ভালবাসা-কে কেন্দ্র করেই তুমি তোমার গোটা জীবন চালিয়ে নিয়ে যাও। তুমি হয়ত বাইরে আপাতদৃষ্টিতে তা বুঝতে পার না—কিন্তু এই ভালবাসাই যে মানবজীবনের মূলমন্ত্র তাতে আর ভুল নেই। কিন্তু এই পৃথিবীর আওতায় ভালবাসাকে রূপ দিতে হবে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে—তবেই আসবে জীবনে নতুন রসের সন্ধান।

অমিত।

অদ্ভুত ছেলে এই অমিত। সমস্ত জীবনটা যেন খালি অভিজ্ঞতা দিয়ে ঠাসা। কতই বা বয়স? গভীর পাণ্ডিত্যের এক বিপুল খনি বিশেষ। সত্য আর গাম্ভীর্য ব্লেণ্ড্ করে অমিত এক অপরূপ পাত্র! ওর প্রকাশের কোন তাগিদ নেই। জ্ঞান শুধু সঞ্চয় করে যাও—সেখানেই আনন্দ। এই স্বল্পমেয়াদী জীবনে এত পড়বার আছে, এত জানবার আছে যে সে তুলনায় সময়ের একান্ত অভাব। সুতরাং নিজেকে প্রকাশের তাড়নায় উদ্‌ব্যস্ত হবার তোমার প্রয়োজন নেই। এই প্রাচীনা পৃথিবীর যা বয়েস, তাতে করে চিন্তাধারায় নতুন সংযোজনের চাইতে মানুষের উচিত পুরাণ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত যা বিষয় তাকেই সত্য ও গবেষণার আলোকে প্রতিফলিত করে পথ চলা। কারণ এতো কথা তাঁরা অতীতে চিন্তা করেছেন যার যথার্থ সম্মান আধুনিক যুগের মানুষরা দেয় নি। তুমি তোমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছ, সে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছে। এ-যেন একটা ডিস্‌অর্ডার বা বিশৃঙ্খল অবস্থা। তোমার ব্যক্তিগত চিন্তার চাইতে সমষ্টির কল্যাণে যে চিন্তা মঙ্গলের রূপ পরিগ্রহ করবে তার গুরুত্ব অনেক বেশী। তুমি অতীতের জ্ঞানী গুণীর চিন্তার রাজ্যে অবাধে বিচরণ কর—সত্যকে খুঁজে বের কর—তোমার উপলব্ধি দিয়ে পুরাণো সত্যের নতুন রূপ দাও—তবে তো বুঝি তোমার হিম্মৎ। নিজের এক তরফা বা কল্পিত কান্না-হাসির কাহিনী দিয়ে পৃথিবী ভরে গেছে। এখন যা' প্রয়োজন তা হচ্ছে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে পুরাতনকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করা নয়ত

পুরাতন সত্যকে হটিয়ে দিয়ে তার ভেতরে নতুন সত্যের সংজ্ঞা কিছু পাওয়া যায় কিনা তারই সন্ধান করা। বলিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তার মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশী নেই। সুতরাং চর্বিত-চর্বণের চাইতে সকল মানুষেরই সৃজনী প্রতিভার দম্ভ অতি-অশোভন। ট্যালেণ্ট-কে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। আমিও করি না। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের কিছু নয় তাঁদের যখন সমালোচক মাথায় তুলে নাচেন, তখন ক্ষোভ হয়, অনুশোচনা হয়—মনে হয় দেশের নৈতিক মান যদি এমনি বিষিয়ে ওঠে—পিছিয়ে পড়ে—তবে সমাজের পক্ষে তা স্বাস্থ্যকর নয়। ক্রিটিকের দায়িত্ব সহজ নয়। ক্রিটিক রাজাকে ফকির, ফকিরকে রাজা করবার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া একটা সাময়িক মূল্যবোধ নিরূপণের দুর্লভ ক্ষমতাও সে রাখে। মহাকালের গতিতে সবকিছুর ধ্বংস অনিবার্য। যা সত্যিকারের তা শুধু টাইম-লিমিট। তুমি ভাল রচনা তৈরী করতে পার, তুমি পঁচিশ বছর বাঁচবে, সে তাঁর চাইতে ভাল রচনা করতে পারে, অতএব সে পঞ্চাশ বছর বাঁচবে—অপরজন সকলের চাইতে ভাল রচনা করতে পারেন—কাজেই তিনি বাঁচবেন পাঁচশ বছর। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বাঁচবেন পাঁচ হাজার বছর। হয়ত আরও বেশি। তিনি সমাজ, জাতি, দেশ ও পৃথিবীর আর্ষ প্রয়োগ। মহাকালের বিধান সকলকেই সমানভাবে মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু মুস্কিল এই ক্রিটিক বাবাজীদের নিয়ে তাঁরা নিজেদের দৈন্য অনেক সময় ভুলে যান, সৃষ্টির দৈন্য নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান। ফলে দাঁড়ায় সর্বসময়ের জন্য একটা ফল্ট-ফাইন্ডিং অ্যাটিটিউড্—নিজের শক্তি ও মতামত সম্বন্ধে হয়ে পড়েন আন-ব্যালেনসড্। এই আন-ব্যালেনসড্-এর কথা বলতে গিয়েই অমিত একদিন অনুশোচনায় আক্ষেপ করে বলে উঠেছিল : দেশে বাস্তবিকই সত্যি-কারের ক্রিটিকের অভাব। যা' আছে পরস্পর পিট-চুলকানি-সঙ্ঘ। সুস্থ সবল জাতি গড়ে উঠবার পক্ষে এটা প্রচণ্ড বাঁধা। ক্রিটিককে হতে হবে ভূয়োদর্শী এবং মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু আমাদের দেশে কি দেখতে পাই?

আর একদিনের কথা মনে পড়ে ইলীনার। অমিত বলে চলেছিল : এই যে তথাকথিত মানবদরদী সাহিত্যিক তোমরা দেখতে পাও—যাঁদের লেখার ছত্রে ছত্রে বেদনা ও সহানুভূতি ঝড়ে পড়ে—তাঁদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আজ দেখতে পাবে : মহাখিট্‌খিটে, বদমেজাজী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ এঁরা। এঁদের কাজের সঙ্গে এঁদের লেখার কোন সঙ্গতি নেই। কলম যা লেখে

বাইরের প্রকৃতি তা সাক্ষ্য দেয় না। এঁরা বাপুজীর মত দম্ভ করে বলতে পারেন না : 'আমার জীবনই আমার বাণী' বা মহাকবির মত, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান্' ইত্যাদি। কথায় এবং কাজে, চলায় এবং বলায় সঙ্গতি না থাকলে জীবনে নেট রেজাল্ট এ্যাচিভ্ করতে কষ্ট হয়। কথাটা হয়ত অনেকাংশে ঠিক। নইলে শোনা যায় কবি মধুসূদন নাকি. বলেছিলেন : 'আমি যা করি তাকে অনুকরণ করো না, আমি যা' বলি তাই তোমরা কর।' সেজন্যই বোধহয় মধুসূদনের বাণী জনচিত্তে গ্রহণ করতে পারে নাই। কাজ এবং কথায় একাত্ম হতে না পারলে বাণী ফলপ্রসূ হয় না। এ-প্রসঙ্গে ছেলেবেলায় পড়া মহম্মদের সন্দেশ খাবার গল্পের কথাও মনে পড়ে : বিধবার ছেলে রোজ সন্দেশ খেতে চায়—কারণ ছেলেটির সন্দেশ অতি-প্রিয়। কিন্তু মায়ের অবস্থা এমন নয় যে রোজ রোজ ছেলেকে সন্দেশ খাওয়াতে পারবে। শুনেছিলেন, মহম্মদের কাছে অনেকে বহুপ্রকারের আর্জি ও আব্দার নিয়ে যান এবং তিনি অক্লেশে তার ফয়সালা করে দেন। তাই বিধবাটিও মহম্মদের কাছে গিয়েছিলেন। সব শুনে মহম্মদ বললেন : একমাস পর তোমার ছেলেকে নিয়ে এসো। কারণ মহম্মদ নিজে সন্দেশ খেতে খুব ভালবাসতেন, তাই তিনি স্থির করলেন একমাস সংযমের পর তিনি ওই ছেলেটিকে সন্দেশ খেতে নিষেধ করবেন মায়ের অবস্থার কথা বর্ণনা করে। এই সংযমের পর যখন মহম্মদ ছেলেটিকে সন্দেশ খেতে না করলেন, তখন হাতে হাতে ফল পেলেন। নীতিকথার মত এ-গল্প বাংলা দেশে প্রচলিত, সবাই জানে। বিশেষ করে শিক্ষিত লোকেরা তো জানেনই। কথায় এবং কাজে এক হতে না পারলে ফলাফলের কথা ছেড়ে দিলেও জীবনের মহত্তর দিকটা সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে না। একটু খুঁৎ থেকে যায়। আর্টের পক্ষে তা প্রয়োজনীয় হলেও বাস্তব জীবনে তা দৃষ্টিকটু।

এসব কথা ভাবতে আর ভাল লাগেছে না। সবচেয়ে ভাল লাগছে অমিতের চিঠির শেষের অংশটুকু। লিখেছ, আমি তোমাদের ভুলে গেছি কিনা? তোমাদের ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়, না ভুলতে পারা যায়? ভাবছ, অতিশয়োক্তি করছি। কিন্তু সত্যি বলছি এতটুকু অতিশয়োক্তি করছি নে। আমাদের বন্ধু দেবুকে চেন বোধহয়। ওই যে দেবব্রত ভৌমিক তিনি তো মেয়েদের নিয়ে একটা প্রবন্ধই লিখে ফেললেন। ওঁর কথাতেই বলা যাক্। আমার নিজের তো ভাষার দৌড় নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'তোমার আঁচল মেলে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী।' একথা বাঙ্গালী মেয়েকেই উদ্দেশ করে লেখা। আর দেবুবাবু বলছেন : 'বাঙ্গালী পুরুষ চিরকালই আঁচল ধরা—সারা জীবনই তাঁর আঁচল মোড়া, আঁচল ঢাকা, আঁচল দিয়ে ঘেরা। এই আঁচলের আশেপাশেই তার যতো বীরত্ব, যত আস্ফালন; আঁচল নিয়েই তার যত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খা; আঁচল নিয়েই তার কল্পনা। এক কথায় বাঙ্গালী পুরুষের সাম্রাজ্য ঐ আঁচল নিয়েই এবং ওই তার পৃথিবী, তার আকাশ, তার জীবন আর বোধহয় তার মরণও। বাল্যে মায়ের, যৌবনে স্ত্রী এবং বার্ধক্যে গিন্নীর আঁচল থেকে আঁচলে উদ্‌বর্তন, আঁচল থেকে আঁচলে আমাদের বৃদ্ধি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক আচল ছেড়ে আর এক আঁচল আমরা ধরি।

'না আঁচল ছাড়তে পারে না কেউ। তবে আঁচল নিজেই কোন কোন সময় ছাড়ায়—অর্থাৎ ছেড়ে যায়। আঁচল যে শুধু নীড়ই গড়ে, ঘুমই পাড়ায়, তাই তো নয়—কপালের ফেরে কখনও কখনও সে বিপরীত আচরণ করে থাকে। সে নীড় ভাঙ্গে, ঘুম তাড়ায়। আঁচলের ঝাপটায় আমাদের জীবনে যে ঝড় ওঠে, কোথায় লাগে তার কাছে সাইক্লোন টাইফুন। একছিটে রঙীন আঁচল, এক টুকরো শাড়ির পাড়—একটা মানুষের জীবনে তা যে কোন মুহূর্তেই বিপ্লব ঘটাতে পারে। কতো জীবনেই তো ঘটিয়েছে আজও ঘটাচ্ছে। কতো আঁচলের ঝাপটা লেগে কতো মানুষ বিবাগী হয়ে গেছে, ঘর ছেড়ে ছিট্‌কে পড়েছে পথে। পথে পথেই কাটিয়ে দিয়েছে জীবন। কতো আঁচলের ঝাপটা লেগে কতো মানুষ কবি হয়ে গেছে, রাতারাতি শিল্পী হয়ে উঠেছে—কতো মানুষ রাজনীতির পাণ্ডা হয়েছে, মাঠে গিয়ে মাথা মুড়িয়েছে। কতো পার্বতীর আঁচলের ঝড়ে কত দেবদাস উড়ে গেছে, উড়িয়ে পুড়িয়ে জীবন দিয়েছে; কতো ছেলে পটাসিয়াম সাইনায়েড্‌ খেয়েছে, কতো ছেলে লেকের জলের তলায় শুয়েছে—এর কি আর ইয়ত্তা আছে। বাঙ্গালীর ছেলের জীবনে এই একমাত্র রোমানস্‌। এই একমাত্র দুঃসাহাসিক কাজ।

'আমাদের এ-যুগ এলিটের যুগ নয়, রাজা-বাদশা আজ শুধু ইতিহাসের উপকরণ—আমাদের যুগ মোটামুটিভাবে ডেমোক্রেসীর যুগ—বিশেষের যুগ নয়, নির্বিশেষ সাধারণের যুগ। এ-যুগে অধিকারের দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে সবাই

প্রায় সমান। শাড়ি সেই সমানাধিকারকেই রূপান্বিত করেছে, দোকানে দোকানে, ষ্টলে ষ্টলে, ফিরিওয়ালাদের মাথায় মাথায়।

'শাড়িতে যে শুধু দেশের ইকনমিক্ কণ্ডিশনকেই বোঝা যায়, তা তো নয়—শাড়ির দর্শনে দেশের কালচারকেও দেখা যায়। আজ শাড়ির যে ফ্যাসন চলেছে, তাতে মসলিনের মহার্ঘ সূক্ষ্মতা নেই, কিন্তু চোখ ধাঁধান ঝলমলে হাঁলকাপনা আছে। তাতে অঙ্গরুচি আড়াল করার থেকে, অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখানোর দিকেই ঝোকটা বেশী। বাংলা শিল্প সাহিত্যের অবস্থাও আজ তাই—কারুকার্যের সূক্ষ্মতা নেই, কিন্তু রঙচঙা হালকা আবরণে ঢেকে স্থূল দেহ নিয়ে বিকৃত মাতামাতিটাই বেশী। দেহ-বিলাসের কাহিনীই মুখ্য। এটা বোধহয় ডেকাডেনসের লক্ষণ। শাড়ির রুচিতে সেই ক্ষয়ের ছাপ পরিস্ফুট। সবচেয়ে আধুনিক ধরণের শাড়ির নামকরণ হচ্ছে সিনেমার নামে, সিনেমার অভিনেত্রীর নামে—মানে না মানা, মনের ময়ূর, আনার কলি, আওয়ারা নার্গিস, পুষ্পধনু, আম্রপালি ইত্যাদি। এটা নিঃসন্দেহে ক্ষয়ের লক্ষণ। বাংলার সমাজ ভাঙছে, রুচি বিকৃত হচ্ছে, শিল্প কেবলমাত্র একটা যান্ত্রিক উন্নতিতে পরিণত হচ্ছে—শাড়ির গায়ে গায়ে, নামে নামে, আঁচলে আঁচলে দেখছি তার নিশানা।

'শাড়ির আঁচলের হাওয়া লেগেই যে বাঙ্গালী কবি হয়, তাতো আগেই বলেছি। বাঙলা কবিতা সবই আঁচলেরই কবিতা। বাঙ্গালী কবি, ভারতচন্দ্র থেকে মায় জীবনানন্দ পর্যন্ত, সবাই-ই আঁচলের কবি। আঁচল ছাড়া বাঙলার কবিতা হয় না। কি-ই বা হয়—কি-ই বা হয়েছে?

'তাই তো বলছিলাম, শাড়ির আঁচলেই আমাদের চরম-পরম, আমাদের জীবন-মৃত্যু। শাড়িতেই আমাদের শৈশবের শিশুক্ষেত্র. যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। হয়ত এই শাড়ির আঁচলেই বাঙ্গালী একদিন আবার নতুন করে কালচারাল্ কনকোয়েষ্ট করবে। তার লক্ষণও য়ুরোপ—আমেরিকায় কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি—কারণ সেখানে মেয়েরা আস্তে আস্তে শাড়ি ধরছে।'

এ প্রবন্ধ পাঠের পরও কি তোমার মনে হয় ছেলেরা মেয়েদের সম্বন্ধে উদাসীন। মোটেও না?

প্রাণের কথা শুনতে মেয়েদের ভাল লাগে। সৌন্দর্য সৃষ্টির সম্প্রসারণে মেয়েদের সহজাত সমর্থন আছে। পুরুষ নারীর মন নিয়ে গবেষণা করুক।

নারী সেকথা শুনে তৃপ্তি পায়। কিন্তু হালফিল সাহিত্যিকের মত যদি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলগত কচ্‌কচির অরণ্যে দিশেহারা হতে হয়, তবে তাতে সাহিত্যের প্রাণধর্ম ক্ষুণ্ণ হবে। সমাজ ব্যবস্থার কথাই সাহিত্যের মাধ্যমে স্বীয় উপলব্ধি ও নতুন সত্যের আলোকে যাচাই করে সাহিত্যিককে নতুন রচনার জন্য কলম ধরতে হবে। তবে নব ভারত প্রতিষ্ঠার কল্পনা সাহিত্যিকের হাতে সার্থক রূপ নেবে।

কিন্তু তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে আর যেন ভাল লাগে না। বুড়িয়ে যাওয়া মনও যেন প্রাণধর্মের বন্যায় অবগাহনের জন্য উন্মুখ। বয়স ধর্ম বলে একটা কথা আছে। তা যাবে কোথায়? জৈব রসে সিক্ত মন ফাঁকা বুলির আওয়াজে আর ভুলতে চায় না। কঠোর ও নির্মম বাস্তবকে এবার চায়। এ্যাডোলেসেনস্ পিরিয়ডের কাতর গোঙানিকে কদাচ নয়।

অমিত বড় চাপা। সব গভীর তত্ত্ব নিয়েই সে আলোচনা করবে। শুধু জানতে দেবে না সে নিজের প্রাণের ফল্গু রসধারা কোন্ পথ দিয়ে সাগর সঙ্গমের রুট্ এঁকে নিয়েছে। এই তো চাই। সাবাস্ পুরুষ। নারী দেখলেই পুরুষের কাঙালপনা ন্যক্কারজনক। অমিত সে জাতের নয়। তাই তো অমিত বন্ধু, দোসর, নিঃসঙ্গের সাথী। কে বলে নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব হয় না? অমিত বার্নিং ইগ্‌জ্যাম্প্‌ল্।

যখন যে-কথাটি বল, অমিত ছুটে গিয়ে নিঃস্বার্থভাবে করে দিয়ে আসবে। প্রতিদানে কিছু চাইবে না। সেইটেই যেন গভীর লজ্জার বিষয়। প্রতিদানে কিছু দেওয়া মানুষের জাতধর্ম।

জামসেদপুর আসবার আগে অমিতকেই ইলীনা বাবাকে দেখবার ভার দিয়ে এসেছে। কারণ ওই ঠিক মানুষ যে বাবাকে সঙ্গ দিয়ে, সেবা দিয়ে, আনন্দ দিয়ে ভরে রাখতে পারবে। এই দূরে এসেও নিশ্চিন্ত মনে সে হাসতে খেলতে পারছে। নিজের মনোবিলাস নিয়ে পরিকল্পনার পর পরিকল্পনার পাহাড় তুলতে পারছে। সে কেন? সে ওই অমিত ছিল বলেই। এক কথায় অমিত মনের শান্তি, মনের আনন্দ, মনের আরাম। এ তো শুধু ইন্‌টিলেক্‌টিউয়্যাল সখ্য নয়—এ তার ওপরে আরও কিছু—ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দের এক অভিনব আবিষ্কার। অমিতাভকে চাই বলেই অমিতকে মন থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেবে সেকথা উঠতেই পারে না। এ-জাতীয় দুর্লভ সখাও নারীর চাই।

নতুবা নরনারীর জীবনে একঘেঁয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও অচিরেই গতমন্ধ হয়ে ওঠে।

ইলীনার চিন্তার মাথামুণ্ডু নেই। জেমস্ জয়েস, হেমিংওয়ে, আলডুস্ হাক্সলির নায়ক-নায়িকার মত গভীর মননে তলিয়ে যায়। তাই তো এ-পৃথিবীটা কি? এ-সংসারটা তা হলে কি ধরণের? আনন্দরস খুঁজে পাবার জন্য মানুষের যে জয়যাত্রা তার শেষ কোথায়? একধারে জীবন, অপরধারে কঠোর বাস্তব। এর শুষ্কতাপে মানুষকে অবিরত দগ্ধ হতে হয়। এর ভেতর সামঞ্জস্য বিধান করে পথ চলতে হবে; নইলে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। শিক্ষার হয়ত প্রধান ত্রুটি আত্মসমালোচনা করা। অনেক সময় আত্ম-সমালোচনার নির্মম পীড়নে জীবনের মধু শুকিয়ে যায়।

হঠাৎ বাইরে ফটকের কাছে একটা গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হতেই ইলীনা জানালা দিয়ে দেখতে পায় অমিতাভ ইন্টারন্যাশনালের হ্যাণ্ড ব্যাগ নিয়ে স্মিত হাস্যে গাড়ী থেকে নাবছে।

অভ্যর্থনার জন্য দৌড়ে এলো ইলীনা। এ-কি তুমি কি করে এলে, অমি?

কেন আসতে দোষ আছে না কি?

দোষের কথা নয়। কারণ তোমার তো এখন আসবার কথা নয়।

তুমি একটি অর্বাচীন বালিকা। তোমাকে আমাকে নিয়ে যদি কেউ উপন্যাস লিখতো আর এই দীর্ঘ বিরহের অংশ নায়ক-নায়িকার মননের ঠাস বুনোটে ভরে তুলতো, তবে সে-জাতীয় লেখা বুদ্ধি-জীবির ভাল লাগলেও সাধারণ পাঠক তাকে সানন্দে মেনে নিতে পারবে না। তুরীয় আনন্দের চাইতে সাধারণ পাঠক সাধারণ আনন্দ অধিক কামনা করে।

গাড়ী থেকে নাবতে না নাবতেই জনপথকে বক্তৃতা মঞ্চে কনভার্ট করলে।

জনযুগের রাজত্বে জনপথই উপযুক্ত প্ল্যাটফরম্। ভারতের স্বাধীনতার পর নয়াদিল্লীর কুইনস্ ওয়ে আজ তাই জনপথে রূপান্তরিত হয়েছে। তোমাদের আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবার পরিবর্তন করতে হবে।

আমাকে আমলাতান্ত্রিক বলে কটাক্ষ করছ কেন? এ-যে কথামালার গল্প, বাপের দোষে সন্তান নিপীড়িত।

রাগ করলে?

রাগ নয়। জিগগেস করলুম: এলে কি করে? তার বদলে শুনলুম বক্তৃতা।

বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীটা যে আজ বড্ড ছোট হয়ে গেছে। মনে হলো চলে আসি। তোমাকে অনেকদিন দেখি না। পাঁচদোনা থেকে জামসেদপুর ছ'শ মাইলের কাছাকাছি পথ। তিন ঘণ্টায় চলে এলুম। আবার কালকেই চলে যাব। শুধু একবার তোমাকে দেখে নিয়ে আবার মানসিক শক্তি অর্জন করে নিজের কাজে ফিরে যাব।

শুধু একবার দেখেই আবার চলে যেতে চাও—বলি, বয়স বাড়ছে—না কমছে? মুহূর্তের দেখাকে চিরকালের কোঠায় বন্দী করবার সাহস অর্জন করতে পারনি কেন এখনও? নারী হয়ে পুরুষকে নিজ মুখে এসব কথা বলতে হয়। ধন্য তুমি—একটি মস্ত বড় হাবা-গঙ্গা-রাম।

ঠিকই বলেছ। তোমার কম্প্লিমেণ্টস্ জয়যুক্ত হোক্। ভেবেছিলুম: সামাজিক মর্যাদায় আর একটু প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে, তারপর ওসব কথা ভাবব।

বেশী বোধবাদের ওই তো দোষ। জাষ্ট লাইক ফুড্ এণ্ড ড্রিংক জীবনের প্রাথমিক চাহিদা না মিটোতে পারলে জীবনে সফলতা আসতে পারে না। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। বই লিখে মানুষকে কি কথা শোনাতে চাও, জানাতে চাও? শুধু কি সৌন্দর্য সৃষ্টি? না আর্টের খাতিরে আর্ট? না জনসমাজেরও কিছু কল্যাণ করতে চাও? এর পরেও আছে জীবন। তা কোনক্রমেই উপক্ষেণীয় নয়। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখো অশোক-জয়তীকে! কেমন বুকের পাটা?

তাহলে বাইরে দাঁড়িয়েই কথা চলবে? ঘরে যাবে না? তাইতো ট্যাক্সিটা গেল কোথায়? একটা অ্যাট্যাশে কেস্ ছিল যে গাড়ীতে।

গাড়ীর নম্বর দেখে রেখেছ?

না, তা খেয়াল করি নি।

বেশ মজার মানুষ তুমি। জিনিসপত্র সঙ্গে কি এনেছ তা না নামিয়েই যাঁরা কথার পর কথা সাজাতে সুরু করে—তাঁদের এমনি হওয়াই উচিত। কথা সাহিত্যিকদের প্রধান দোষ কথার প্রতি তাঁদের প্রচণ্ড লোভ। লঘু রচনা সৃষ্টি করতে করতে চিত্তও তাঁদের লঘু হয়ে ওঠে, গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দেবার সাহসও যেন তাঁরা হারিয়ে ফেলেন।

'সারমন' দিচ্ছ। জিনিসগুলি যে গেল সেজন্য কি একটু মায়াও হয় না।

কি কি ছিল ওই অ্যাট্যাশে কেসে ?

বিশেষ কিছু ছিল না। কতগুলো কাগজপত্র ও পাণ্ডুলিপির খসড়া।

মায়া দেখালেই কি তুমি জিনিসপত্রগুলি ফিরে পাবে ?

ঠিক তা নয়। এ-অবস্থায় মানুষ মৌখিক সহানুভূতি আশা করে ?

তোমার সঙ্গে তো আমার ফরমালিটিস্-এর সম্বন্ধ নয়। ওসব করবে বাইরের লোক। তুমি ছাড়া দুঃখ যদি কারও হয়ে থাকে সে আমারই হয়েছে, আর কোন বাইরের লোকের হয় নি।

তথাস্তু। চল, এবার জয়তী-অশোককে দেখে আসি।

অশোক তো এখানে নেই। দু' একদিনের মধ্যেই অশোকের টেলি পেলে জয়তী চলে যাবে।

পরের খবরে তো খুব ঔৎসুক্য দেখছি। নিজের খবরটা কি একবার বল দেখি।

কথা বলতে বলতেই অমিতাভ ও ইলীনা ঘরের ভেতর এগিয়ে যায়। গোধূলির রক্তাভ আকাশ বা সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি কোন কিছুই আকাশে ছিল না। আকাশে যা ছিল তা হলো পঞ্চমীর একফালি পাণ্ডুর চাঁদ। কখনও বা ধূসর মেঘের সারি, কখনও বা ফেনশুভ্র মেঘরাজি ইতঃস্তত আপন খেয়াল বশে নভোমণ্ডলে বিচরণ করছিল। সেদিকে উভয়ের দৃষ্টি না থাকলেও প্রাকৃতিক পরিবেশ রোমান্সের বিপক্ষে কোন উশৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করে নি।

অমিতাভ বলে : ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? যতদিন না হচ্ছে ততদিনই নতুন। যেমনি হয়ে গেল সবকিছু পুরানো হয়ে গেল।

ইলীনা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে ; ছেলেরা এমনি করে মেয়েদের ভুলিয়ে অনেক গভীরে নিয়ে যায়। তাইতে মেয়েদের নেতৃস্থানীয়েরা ছেলেদের তোষণ বাক্যে আস্থা স্থাপন করতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন। কারণটা অতি সুস্পষ্ট। দায়িত্বের যে বন্ধন পুরুষকে নেবার কথা তাকে অস্বীকার করবার জন্য সে হাত উঁচিয়ে বসে থাকে। এটা পুরুষ চরিত্রের একটা সহজাত ধর্ম। মর্মে মর্মে তার ঘর ভাঙবার প্রবৃত্তি। নারী তাই পুরুষকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কুটীর বাঁধতে চায়।

'অমিতাভ একটি দীর্ঘ হাই তুলে মুখটি বড় করে খুলে বলে : হে মা বসুন্ধরা, করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।'

তুমি যতই ঠাট্টা কর না কেন, আমি তাতে ভুলছি নে। মিথ্যে তো কিছু বলি নি। মেয়েরা যাতে পুরুষের স্তুতি-তে হঠাৎ যেখানে সেখানে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে না বসে সেজন্যই বর্ষীয়সীরা সর্বদা সাবধান করে থাকেন।

কিন্তু একথাও আমি বলি : এনি সাচ্ কনডিশনাল অফার—ইট্ ইজ্ স্ট্রিকট্লি কনডিশনড্—ক্যা নট্ লাষ্ট ফর এভার এণ্ড এভার। প্রেমের ভেতরে সর্ত আরোপ করলে প্রেমের মাধুর্য নষ্ট হয়। সেজন্যই তো হিন্দু বিয়ে সামান্য চুক্তিপত্রেই শেষ নয়। ইট্ ইজ্ সামথিং মোর থ্যান থ্যাট।

তাহলে মেয়েদের সেফ্‌গার্ডস রইল কি?

উইজডম্ রিকোয়ার্স সামথিং মোর থ্যান ক্যাজুয়াল কনসিডারেশন এণ্ড ক্যাজুয়াল ডিসিসন্। মেয়েদের সেই বুদ্ধি আর সেই দৃষ্টি অর্জন করতে হবে। আমার মনে হয় এর জন্য আর বর্ষীয়ানদের উপদেশের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতি আপন প্রেরণায় নিজেই আত্মরক্ষার উপায় স্থির করে নেয়।

বক্তৃতার জাহাজ। ফাঁকা বুলি দিয়ে সবকিছু ঢেকে দিতে চাও। ছেলেরা প্রেমের ব্যাপারে ভীষণ ধূর্ত।

সমগ্র ছেলে জাতের ওপর কলঙ্ক আরোপ করো না। প্রেমের দেবী তাতে গোঁসা করে বসবেন।

আচ্ছা তুমিই বল : ছেলেরা আদর করবার জন্য আর মেয়েরা আদর কুড়োবার জন্য একটা বিশেষ বয়েসে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চিত্ত চাঞ্চল্যের দোলায় অনেক সময় যুক্তি ও বিচারবোধ ভেসে যায়। নায়ক-নায়িকা স্থূল আনন্দের জন্য দিশেহারা হয়।

দিশেহারা হওয়াটাই প্রাণবন্যার লক্ষণ। যুক্তি দিয়ে আর যাই চলুক প্রেম চলে না। ভাবনাহীন উচ্ছল যে জয়যাত্রা, প্রাণে প্রাণে ঠোকাঠুকি, ওটাই তো প্রেম। আর তাছাড়া আদিরসের ব্যাপার না থাকলে নায়ক-নায়িকার গ্ল্যামার ক্ষুণ্ণ হবে—পাঠক-পাঠিকাও রুষ্ট হবেন।

তাহলে বল, পাঠক-পাঠিকাকে ভয় কর?

তা' আবার ভয় করি নে। ওরা চায় কথার পর কথা, গল্পের পর গল্প, ঘটনার পর ঘটনা—মাঝে মাঝে চাট্ হিসেবে প্রচ্ছন্ন ও মার্জিত আদিরস।

বিদ্যাসুন্দর জাতীয় রস নয়। কারণ দৃষ্টিভঙ্গী পালটেছে। আদিরস পরিবেশনে গোপনে স্বাধীনপুরুষ ও স্বাধীনা নারীর বলদৃপ্ত আর দুর্বল প্রেমের উভয় চিত্রই দরদ দিয়ে আঁকবে, দেখবে তোমার বই লাইক হট্ কেকস্ বিক্রী হবে।

তুমি কি আর্টের টেকনিক্ মান? টেকনিকের স্রষ্টিকর্তা কে বল দেখি?

টেকনিক মানুষের স্বভাব সৌন্দর্য-বোধের একটা সহজাত প্রকাশ। ধরা-বাঁধা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে ওকে মাপতে যাওয়া বাতুলতা।

তবে টেকনিক নিয়ে ক্রিটিকরা এতো মাথা ঘামান কেন?

প্রভু, উহাদের ক্ষমা করিও। ওঁরা নিজেরাই জানেন না ওঁরা কি করিতেছেন বা কোন্ পথে চলিতেছেন। নন্দনতত্ত্ব-নন্দনশাস্ত্র—ক্রোচে থেকে মলেয়ার অনেক কিছু ঘাটলুম—একটা সঠিক নিশানার সন্ধান কেউ দিতে পারেন নি। বোধহয় সাহিত্য হৃদয়নির্ভর বলে। কিন্তু শিল্পনির্ভর হলে সাহিত্যকে গণিতের ছকে ফেলে একটা ফরমূলায় বন্দী করা চলতো।

এই বৈশ্যযুগে সবকিছু গণিতের অংশ দিয়েই মাপা হচ্ছে। বিজ্ঞান গণিতকে অস্বীকার করতে পারে নি, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়ও গণিতের মূল্য এতোটুকু কমে নি। আমরা পাত্র খুঁজতে গিয়ে শিক্ষা সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে টাকার অঙ্ককেই প্রাধান্য দিই। টাকার অঙ্কই হচ্ছে হালফিল সংস্কৃতি।

আমি কিন্তু কোন মোহ নিয়ে আসি নি। এসেছি প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনায়। বলাকার 'দান' কবিতাটি আজ রাতে আর একবার পড়ে নিও। প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে।

পড়ে দেখবো। কিন্তু:

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
তুমি মোরে কী দিবে দান?

অমিতাভ বলে:

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার।
তবে—সন্ধ্যায় করবী হতে খসা
একটি রঙীন আলো কাঁপি থর থরে

ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।
আমার যা শ্রেষ্ঠধন সেতো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।

হল ঘরের দক্ষিণের দরজা দিয়ে জয়তী এসে প্রবেশ করে। অমিতাভকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে: এ-কি অমিতাভ তুমি কতক্ষণ এলে?

অমিতাভ হেসে বলে: বিনা নিমন্ত্রণেই এলুম। জীবনের এতবড় একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল, অথচ আমাদের কথা তো তোমার মনে পড়লো না? অবশ্য এ-জাতীয় ঘটনা একান্ত নিভৃতেই শোভন।

তাহলে বল, তুমিও সেই ব্যাপার ঘটাতেই নিভৃতে এলে?

আমার বোধহয় এখনও সময় হয় নি। কিছু সময় নেবে।

তোমাদের ছেলেদের আর কিছুতেই সময় হয় না—ফুরসুৎও হয় না।

ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

ব্যাপার আর নতুন কি করে হবে, বল? তোমাদের জোর করে ধরে না পড়লে তোমরা শেষ পর্যন্ত টালবাহনা করে অযথা সময় কাটাও। যখন এসেই পড়েছ আমি আর তোমাকে সময় দিচ্ছি নে।

আমি যে কালই চলে যাব। তোমাদের কথা মনে হলো, উড়ো জাহাজে করে চলে এলুম। ওখানে যে কাজ ছড়িয়ে বসেছি তার একটা হিল্লে না হলে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধের কথা ভাবতে লজ্জা বোধ হয়। তুমি কি আমাকে আত্ম-কেন্দ্রিক হবার উপদেশ দিচ্ছ?

সার্টেনলি নট্। বিয়ে করলেই আত্মকেন্দ্রিক হতে হবে এমন কথা কোন্ বই-এর কোন্ পাতায় লেখা আছে, বল?

ঠিক তা নয়। তবে চিন্তাধারা যে প্রথমাবস্থায় কিছুটা কেন্দ্রীভূত হয় সেকথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবে না।

বিয়ে সম্বন্ধে ছেলেদের এটা একটা কাল্পনিক বিভীষিকা। ডিমেরিট্‌স্-ই শুধু দেখলে—মেরিটস্‌টা দেখলে না?

যুক্তির দিক দিয়ে তুমি হয়ত ঠিক, কিন্তু যুক্তির উর্ধ্বেও একটা রাজ্য আছে। সেখানে কথা অচল।

তুমি কথা দিয়ে ভোলাতে চাও। কিন্তু আমি স্পষ্ট ভাষায় বলব : তোমরা ছেলেরা অত্যন্ত ভীরু। দায়িত্ব নেবার অক্ষমতা থেকেই তোমাদের এই বিরোধের জন্ম।

একথা বলে কিন্তু অবিচার করলে।

অবিচার একটুও করিনি। যা সত্যি তাই বলেছি। সত্য অপ্রিয় হলে শুনতে কষ্ট হয়।

তর্কচ্ছলে আমাকেও বলতে হয় দায়িত্ব অস্বীকার করবার এমন কোন আভাস আমার আচরণে পেয়েছ কি? শাস্ত্রে আছে: সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। অর্থাৎ সুখের জন্য সংযত হতে হবে।

তুমি চটে গেলে দেখছি। শাস্ত্র বচন বলছ। যাই তোমার খাবার ব্যবস্থা করিগে। ইলীনা তোরা একটু বসে গল্প কর। আমি এক্ষুণি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ইলীনা বলে: কেন বাবুয়াই তো রয়েছে। তোর যাবার দরকার কি?

আমি-ই নিয়ে আসছি, বাবুয়াকে দিয়ে ওসব কাজ হবে না। মাননীয় অতিথি। অতএব আমি উঠি।

জয়তী বাড়ির ভেতর চলে যায়।

জয়তীর প্রস্থানের পর কিছুক্ষণের জন্য ইলীনা ও অমিতাভ কোন কথাবার্তা না বলে ড্রয়িং রুমের সোফায় গা' এলিয়ে বসে রইল। দুজনেই যেন দুজনের ভাবে তন্ময়।

এক সময় ইলীনা বলে: কি চুপ করে রইলে যে বড়? কি ভাবছ? কথা বলছ না কেন?

অমিতাভ গম্ভীরভাবে বলে: রবিবাবুর দুইবোন উপন্যাসের উর্মিমালার ভাবী স্বামী নীরোদের কথা মনে আছে তোমার?

মনে থাকবে না কেন? দুদিনের ভাবী স্বামী। উর্মিলার দাদা হেমন্তের বন্ধু। মুখে বড় বড় বুলি।

কিন্তু সেই নীরোদ শঠ হোক, প্রবঞ্চক হোক, বেশ ভাল ভাল কথা

বলতো: দেখ উর্মি, সাধারণ মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যে সব স্তবস্তুতি প্রত্যাশা করে আমার কাছে তা পাবার সম্ভাবনা নেই, একথা জেনে রাখো। আমি তোমাকে যা দেবো তা এইসব বানানো কথার চেয়ে সত্য, ঢের বেশি মূল্যবান।

তুমিও নীরোদের মত ওই জাতীয় কথা আমাকে বলতে চাও নাকি ?

আমি নীরোদের মত প্রবঞ্চক নই। বিলেতে গিয়ে য়ুরোপীয় মহিলাও বিয়ে করিনি। কিন্তু আমি নীরোদের কথার মধ্যে শাশ্বত কৃতী পুরুষের যে প্রচ্ছন্ন দাম্ভিক সুরটি শুনতে পাই তার ভেতরে সত্য আছে।

এ দিয়ে তুমি কি বোঝাতে চাও ?

হোমর একিলিসের মত যুদ্ধপটু ছিলেন না। তাই বলে লজ্জার কিছু নেই। 'বাহিরের ঘটনা মানবজীবনের অংশমাত্র এবং তা-ও তখনই সম্পূর্ণ মূল্য পায় যখন আমরা তাকে অন্তরলোকের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি। সাহিত্য অন্তরলোককেই উদ্ভাসিত করে। শিল্প ও সাহিত্যের আসল ফল চিত্তের পরিশোধন নয়—চিত্তের সম্প্রসারণ এবং অনুভূতির গভীরতা সম্পাদন।'

খুব ভাল কথা।

সুতরাং শুধু বাইরেটাই দেখবে, অন্তরকে বুঝতে চাইবে না ?

অন্তরকে বাইরে থেকে দেখা যায় না বলেই মানুষ গোলমাল করে বসে।

চিত্তের দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন। হাল্‌কা হাসি আর হাল্‌কা কথা দিয়ে জীবনটাকে ভরে দিলে কোন গভীর বিষয়েই আর ভাবা যায় না।

জীবনটাকে সময় সময় একটা সিরিয়াস দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে এরই বা কি মানে আছে ! জীবনের সকল রসে বঞ্চিত হয়ে কাঠখোট্টা শুষ্ক তপস্যায় ধ্যানমগ্ন হব—এও আমার ব্রত নয়।

বিয়ে করবার জন্য জয়তীর আমাকে অতটা প্রেস্ করা ঠিক হয়নি—হাজার হোক আমি পুরুষমানুষ।

তোমরা ছেলেরা তো পুরুষমানুষের দম্ভেই গেলে। তোমাদের আর কোন গুণ না থাক আছে শুধু ওই দম্ভটুকু। রূপ আর রসকে বাদ দিলে মানুষের আর রইল কি ?

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ কতগুলো শুষ্ক আদর্শের বুলি মানুষের জীবনের মূলমন্ত্র হোক্ এ কখনও হতে পারে না।

'সাহিত্য মতের প্রচার করে বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী করে মনের প্রকাশ।' সেজন্যই শিক্ষিত মানুষের কাছে সাহিত্য এত প্রিয়। সাহিত্যকে সাহিত্যের জন্য ভালবাসে না, ভালবাসে নিজের মনের ছবি সাহিত্যের মাধ্যমে দেখতে পাবে বলে।

নিজের কথা বলতে গিয়ে আবার এসব কি কথা টেনে আনছ? তোমার কথাই শুনি। সাহিত্যের কথা এখন থাক।

সাহিত্যকে বাদ দিয়ে তো আর আমি নই। সাহিত্য থেকে আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারিনে।

জি, বি, এস, এর কথা মনে পড়ছে: 'দি রিয়েলি গুড্ ম্যান ইজ্ এ্যাজ রেয়ার এ্যাজ দি রিয়েলি ব্যাড্ ম্যান্।'

কথাটা খুবই সত্যি। কিন্তু বিদ্রূপাত্মক।

যাক্ গে পরের কথায় কাজ নেই। তুমি সত্যি সত্যি কি চাও সেইটেই স্পষ্ট করে বল?

সে কথা কি কেউ জানে, না স্পষ্ট করে বলতে পারে?

জীবনটাকে যদি সব সময় এত সিরিয়াস ভাবে দেখ এবং ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণ করতে থাক, তবে তো সুখ আসবে না। আমার বাবা ছিলেন ইনটিলেক্‌টিউয়্যাস্ অধ্যাপক। যৌবন মধ্যাহ্নে স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তবু তিনি সমাজ, জীবন, কর্ম এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছিলেন। তার জীবনে যেন কোন অভিযোগ দেখিনি। সবই নিশ্চিন্ত মনে মেনে নিয়েছিলেন।

তোমার বাবার কথা বলো না—তিনি নমস্য ব্যক্তি। তাছাড়া তিনি ছিলেন আর এক ধাপ উপরের পুরুষ। তখনকার মানুষের চাহিদা ছিল একটু অন্য রকমের। এত ভ্যারিড্ ও ওয়াইড্ স্বপ্ন, কামনা, কল্পনা বা আকাঙ্খা তাঁদের ঠিক ছিল না। জীব ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। একপুরুষ আগে যা ছিল তার পরের পুরুষ তার চাইতে অনেক এগিয়ে গেছে। এখন এটাই ইভোলিউশনের নিয়ম। কাজেই তুলনা অচল।

তাহলে তুমি ভেবেছ জয়তীকে তোমার কাছে আমার হয়ে ওকালতি করতে

আমিই শিখিয়ে দিয়েছি! কেন, তোমার কাছে যা বলবার সে কি আর আমি নিজে বলতে পারি নে যে তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হবে?

না, তা ঠিক ভাবিনি। তবে 'বুদ্ধির সত্য আর ভাবের সত্য এ দুটোকে পাশাপাশি রেখে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা চলে না।'

সব সময় হেঁয়ালি ভাল লাগে না অমি। আরও স্পষ্ট হও, আরও সহজ হও। জীবনও সহজ হবে।

আমার ভেতরে অস্পষ্টতা কোথায় দেখলে? জুলুম করে একের ইচ্ছের ওপর অপরের ইচ্ছে চাপান প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল এবং সেই প্রসঙ্গেই বলছিলুম।

শুধু ইচ্ছে বলে আর ভদ্রমুখোসের আড়ালটুকু রাখলে কেন? বললেই পারতে স্থূল দেহসর্বস্ব এক নারীকে তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার স্কন্ধে চাপাতে চেয়েছিল আমার বন্ধুটি।

কথাটাকে বিকৃত করলে তাই দাঁড়ায় বটে।

বিকৃত নয়। সরল ভাষ্য করলেই এই রকম দাড়ায়।

প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যেও সময় সময় সহজ কথাবার্তা কেমন বাঁকা-চোরা মোড় ঘুরে দাঁড়ায় ভাবলে অবাক হতে হয়। দুজনেই দুজনকে ভালবাসে। উভয়েরই উভয়ের জন্য আকর্ষণ; তবুও কথার মার প্যাঁচে একটা যেন দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে। কতদূরের পাঁচদোনা নামক এক অপগণ্ড গ্রাম হতে উড়োজাহাজে করে অমিতাভ এলো তার প্রণয়িনীর সঙ্গে মুহূর্তের দেখা করতে, অথচ চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও একত্রে থাকতে পারবে না। কিন্তু এর মধ্যেই যদি আবার বাক্‌যুদ্ধ করে মান-অভিমানের পর্দা খাটিয়ে বিরহের প্রাচীর তুলে বসে, তবে তা ভাল লাগে না। মন চায় অফুরন্ত অবকাশ। সৌন্দর্য উপভোগের সময় মন থেকে সবকিছু ঝেঁটিয়ে বিদায় করেই রস উপভোগ করতে মন চায়। সমালোচক রোজার ফ্র‍্যাঁই, ক্লাইভ বেল অমিতাভের আদর্শ স্থানীয়। কিছুদিন আগে কলকাতায় ইলীনাকে রোজার ফ্র‍্যাঁই ও ক্লাইভ বেলের সমালোচনার গ্রন্থ কিনে দিয়েছে। ইলীনা এমনিতেই রিজার্ভ মেয়ে। নিজের কথা পারতপক্ষে অপরের কাছে কম বলে। অমিতাভের সবচেয়ে ইলীনার এই ডিটাচড্ ও রিজাভড্ ভাবটা ভাল লাগে, আকর্ষণ করে। ইলীনা তার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে পরোক্ষে জয়ন্তীকে সালিশী মানবে—এ-কোনক্রমেই হতে পারে না।

জয়তী যা কিছু বলেছে নিজের খেয়াল খুশী মাফিকই বলেছে। সুতরাং ইলীনাকে দোষারোপ দেওয়া বৃথা।

শিল্পীকে অনেক সময়ই কল্পনা ও বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। শিল্পী তার রচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, অপর পক্ষে দার্শনিক ব্যস্ত থাকেন তাঁর চিন্তা ও অধ্যয়ন নিয়ে। সুতরাং শিল্প ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে যথাযথ উপলব্ধি আমরা সকল শিল্পীর মধ্যে দেখতে পাই না। সৌন্দর্য দর্শন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে অনুপম প্রবন্ধাবলী আমাদের উপহার দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। প্লেটো, হেগেল, রাস্কিন 'প্রতিভা ও কল্পনাশক্তির জোরে' সৌন্দর্য সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন বটে,—কিন্তু তাঁদের কেউ ই শিল্পী ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন রচয়িতা। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ তুলি ও কলম একসঙ্গে ধরে তাঁর উপলব্ধিবোধকে অক্ষরের সমাবেশে এমন এক স্তরে উন্নীত করেছেন যে সে রসের তুলনা হয় না। ওরই ভাষায় বলতে হয় 'চোখে দেখা জগতের সঙ্গে মনে ভাবা জগতের মিল না হলে আর্ট হবার জো নেই, এটাই দেখা যাচ্ছে। আবার মায়া দিয়ে একটা বস্তু যুক্ত হতে পারে কেবল আমারই সঙ্গে, কিন্তু অনেকের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না। ভাবের বস্তু মায়ার অতীত এবং সে সত্যেরই রূপ। তাই তার আবেদন সার্বজনীন।'

ইলীনা তো ঠিক বুঝতে পারবে না। সাধারণ পঁচানব্বই জন মেয়েই বুঝতে পারবে না যে 'মায়া' আর 'ভাবের বস্তু'র মধ্যে তফাৎটা কি? শিল্পী কি সংকীর্ণ সীমারেখা বা পরিধির মধ্যে বাস করে তৃপ্তি পায়? নিয়মের অক্টোপাশে প্রচলিত বিধি ব্যবস্থায় সে কি সুখী? মন তার উড়ে চলে সমাজ সংস্কারের উর্ধ্বে এমন এক মানসলোকে যেখানে মায়া দিয়ে মানুষকে বাঁচাবার তাগিদ নেই। শিল্পী মন স্বাধীন ও বিশ্বজনীন বলেই আশেপাশের প্রচলিত ব্যবস্থা শিল্পীর দিকে ভ্রূকুটি হানে? তুমি কে বটে? কোথায় তোমার ঘর? তুমি কি আর দশটা মানুষের মত নও? আকৃতিতে দশটা মানুষের মতই—সেখানে মিল আছে—কিন্তু আমার মন, তার নাগাল তো তুমি পাবে না—সেখানে সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বে শিল্পী স্তব্ধ, বিস্মিত, ধ্যানগম্ভীর ও আত্মসমাহিত। রবীন্দ্র নাথের কথায়: 'যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপা'।

এ কথাও শেষ পর্যন্ত ভাবতে হলো—কিন্তু কেন ? ইলীনার বিয়েটা একটা জোর করে চালিয়ে দিলেই হলো। যেখানে উভয়েই জানছে এ-বিয়ে আজ না হোক্ কাল সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করবে—সেখানে তৃতীয় পক্ষের অশোভন তৎপরতা বিসদৃশ ও কটু। অমিতাভ ইলীনার কাছে জানতে পেরেছে জয়তী অশোককে অনেকটা জোর করেই বিয়ে করেছে। অবশ্য উভয়েরই প্রেমের কমতি ছিল না ; কিন্তু হঠাৎ লিগালাইজড্ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো কেন ? মেয়েদের আইন ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে একটা অদ্ভুত নীতিপ্রবণতা দেখা যায়। সামাজিক স্বীকৃতি বা অ্যাশূর‍্যান্স্ পেলে ওদের নিজেকে বিলিয়ে দেবার আর এতটুকু দ্বিধা থাকে না। এমনি অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের মেয়েদের। কারণ দেশটা ধর্মপ্রধান, যুক্তিপ্রধান নয়। অন্য দেশের কথা স্বতন্ত্র —কারণ তাদের পরিবেশ অন্য ধরণের।

ছয়

এরপর যেখানে দৃশ্যপট ওঠে সে স্থান কোলকাতা। মাঝে প্রায় মাস তিনেক পেরিয়ে গেছে। ইলীনা জামসেদপুর থেকে ফিরে এসেছে। বাইরের জনহীন প্রান্তর, ধূ ধূ করা আকাশ, ক্ষণে মেঘ কুয়াশা ও অন্ধকারের সমাবেশ কিছু দিনের জন্য ভাল লাগলেও যারা একবার কোলকাতা থাকবার সুযোগ পেয়েছে তাদের বেশী দিন বাইরে মন টেঁকে না। নগরীর এমনি আকর্ষণ।

অমিতাভ আবার পাঁচদোনায় ফিরে গেছে। জয়তী কলকাতায় শ্বশুর ঘর করতে এসেছে। শ্বশুর ঘর করতে যাবার আগে আর ইলীনার সঙ্গে জয়তীর দেখা হয় নি। জয়তীর শ্বশুর বাড়ী হালে আধুনিক হলেও বধূর চলাফেরা সম্বন্ধে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। ইলীনাও ওদের বাড়ী যাবার চেষ্টা করেনি, তবে সুবিধে মত একদিন যাবার ইচ্ছে আছে। অবশ্য ওদের বাড়ীতে ফোন আছে। ফোনে কথাবার্তা বলা চলে, কিন্তু তাও সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

ইলীনা কোলকাতা আসবার আগে অমিতের কাছ থেকে 'পিতার অসুস্থতা' সম্বন্ধে এক টেলী পায়। কাজেই পথে আর কোথাও ইলীনার দেরী করা সম্ভব হয় নি।

অধ্যাপক সোমনাথ অসুস্থ।

করোনারি থ্রমবসিসের প্রথম আক্রমণ কোন রকমে রোধ করেছেন। কোরামিন, এ্যাড্রিনেলিন হাতের কাছেই থাকে।

ইলীনাও পাশে আছে।

ডাক্তারের উপদেশ কোন রকম দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা করা চলবে না। আপনার তো কোন অভাব নাই। সবদিক দিয়েই আপনি পরিপূর্ণ। তবে? কল্পিত অভাব অভিযোগ ও ভয় দূর করতে না পারলে এ-ব্যারামে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ অসম্ভব নয়। এবং ঘন ঘন অ্যাটাক্ মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। টেম-পোরারী সেসেসন্ অফ্ হার্টস্ ফাংশনস্। সব সময় ওকে নানা গল্প গুজব দিয়ে ভুলিয়ে রাখবেন। যেন কোনপ্রকারে ক্রুড না করে।

ইলীনা তার যথাসাধ্য সেবা করতে চেষ্টা করছে।

ইলীনা খবরের কাগজটা হাতে তুলে বলে: বাবা, তোমার ইংরেজী কবিতা অনুবাদ গ্রন্থের রিভিউ বেরিয়েছে। বেশ ভাল লিখেছে।

নিতান্ত ঔদাসীন্য নিয়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠে সোমনাথ বললে: আর এই বুড়ো বয়সে ছোকরা সমালোচক ভাল বলেছে—তাই না রে? কিন্তু তোর বাবা যে আজ নিন্দে সুখ্যাতির বাইরে মা!

এ-কি কথা তোমার বাবা? অসুখ কি কারো হয় না যে তুমি এমন মুষড়ে পড়ছ? রিভিউটা আমি পড়ি তুমি শোন।

পড়্, তাহলে।

'অধ্যাপক সোমনাথের অনুদিত শেলী, বায়রণ, কীটস্ ও সুইনবারর্ণ-এর কবিতাগুলি পাঠ করে আমরা গভীর তৃপ্তি লাভ করেছি। মূল কবিতার বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রেখে ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার এমন সুষ্ঠু সমন্বয় পাকা জহুরীর কাজ। অনুবাদ পাঠ করছি বলে পাঠকের এতটুকু মনে হয় না। কবিতাগুলি বহুপূর্বেই মাসিক ত্রৈমাসিকে বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। এক্ষণে অনুবাদগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে বাঙ্গালী রস পিপাসু পাঠক-পাঠিকাকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক কবিগণের সহিত পরিচয় করবার এক সুবর্ণ সুযোগ ঘটলো। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদেশী কবিগণের রস পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার সুযোগ করে দিয়ে প্রতিটি বাঙ্গালীর নিকট অধ্যাপক মহাশয় প্রীতি ও শ্রদ্ধার বুনিয়াদ পাকাভাবে স্থায়ী করলেন। অনুবাদকের কাজ ও দায়িত্ব সহজ নহে। সেই গুরুদায়িত্ব তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করে ভবিষ্যতের অনুবাদকদিগের দৃষ্টি আরও প্রসারিত করে দিলেন। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।'

কেমন, ভাল লেখেনি, বাবা? এর চাইতে প্রশংসা আর কি করে করবে?

বৃদ্ধ বয়সেও আত্মপ্রশংসা শুনতে মন্দ লাগে না।

ভাল কাজ করলে প্রশংসাটা ন্যায্য প্রাপ্য। তার সঙ্গে বয়সের তুলনা করে তুমি কেন নিজেকে পীড়িত করে তুলছ, জানি না!

ছেলে বেলায় শুনেছি এক জ্যোতীষ আমার কোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। তিনি বলতেন: আমার জীবনে স্যাটার্ণের ইনফ্লুয়েনস্ বেশী, কাজেই সাকসেস্

লেট্ ইন্ লাইফ। কথাটা শেষ জীবনে মিলিয়ে দেখেছি—অনেকাংশে ঠিক। কর্মজীবনেও দেখ আই, ই, এস্ ক্যাডারে উঠতে গিয়ে মধ্যজীবন অতিক্রান্ত হয়েছে—তা-ও আবার কত ঝামেলা। জীবনটাই এমনি—কেমন যেন গোলমেলে। এমন আলো আঁধারের সমাবেশ খুব কম কুষ্ঠীতেই মেলে।

এটুকু বলেই চুপ করে রইলেন অধ্যাপক। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ইলীনার মনে হলো মায়ের কথা মনে করেই পিতা গোপনে চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যৌবন মধ্যাহ্নে স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। কাজেই সোমনাথ ইলীনার কাছে মা-বাবা উভয়ের স্থানই গ্রহণ করেছে।

ইলীনাই পিতার কথার জের ধরে বলেঃ বাবা, কি যেন বলছিলে? চুপ করলে যে বড়?

না, কি আর বলব! জীবন ভরে শুধু অধ্যয়ন ও চিন্তাই করে গেলাম। মৌলিক সৃষ্টির কাজে হাত দেই নি। আলস্যও যে কিছুটা না ছিল তা' নয়। মাঝে মাঝে কবিতা অনুবাদ করতে মন্দ লাগতো না। তারই ফলে এই বিদেশী কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ ধীরে ধীরে জন্ম নিলো। নিছক খেয়াল বশেই শিল্পীর মন নিয়ে কাজ করে গেছলুম—তাই বোধহয় তর্জমা এত উৎরে গেছে। মানুষের স্প্যান অফ লাইফ এত সর্ট যে ইচ্ছে থাকলেও সব কাজ শেষ করা যায় না। মনে হয় এইতো সেদিন এলুম পৃথিবীতে —এরই মধ্যে সবশেষ। বড্ড তাড়াতাড়ি যেন জীবনের খেলা শেষ হয়ে গেল। একথা যেন কোনক্রমেই মানতে ইচ্ছে করে না। মনটা তো এখনও সবুজের পূজারী। বাইরের খোলসটাতেই শুধু বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে— মনে তো একটুও পড়েনি। তারপর মানুষের জীবনের কিছু ঠিক নেই। তোমাকে পাত্রস্থ করতে পারলে মনে শান্তি পেতাম। মেয়েদের জীবনে একটা অবলম্বন প্রয়োজন। ছেলেরা এমনিতেও জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

তুমি এসব চিন্তা করছ কেন বাবা? তুমি তো আমাকে তোমার মনের মত করে শিক্ষা দিয়েছ। আর আমিও কচি খুকিটি নই। জীবন চালিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে ব্যবহারিক বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট হয়েছে। তবে কেন তুমি নিজেকে এত ক্লিষ্ট করছ? তোমার এখন এসব কথা ভাববার নয়।

পিতা হলে বুঝতিস। মেয়ের দায়িত্ব যে কি সে তো তুই বুঝবি নে

মা! প্রত্যেক পিতামাতাই মেয়েদের স্বামীর ঘরে দেখতে চায়। এতে অশোভন কিছুই নেই।

তুমি এসব কথা কিছু ভাববে না বাবা। তাহলে আমি তোমার'পরে রাগ করবো।

পাগলী মেয়ে, বুড়ো ছেলের ওপর শেষে রাগ করবি। হ্যাঁ রে ভাল কথা অমিতাভর খবর কি? ওর চিঠি-পত্র পাস তো? সেই ওদের দেশের গাঁ পাঁচদানায় গিয়ে বসে আছে? সেখানে কি করে?

কি করে তা সঠিক জানি নে। তবে যতটুকু জানি দেশের কাজ ও আত্মদর্শন উপলব্ধি করা।

শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ্ ডিভাইনে' দেখেছিস 'জগতে এত দুঃখ কেন' হতে আরম্ভ করে 'সমষ্টি মানবের সার্থকতা' পর্যন্ত বহু তথ্যকে তিনি সরলভাবে বর্ণনা করছেন। একজন সাধারণ গৃহস্থও দিব্যজীবনের পথে অগ্রসর হতে পারেন—তবে সর্ত বা হাইপথেসিস আছে যেমন সরল বিশ্বাস ও অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া এ-পথে অগ্রসর হওয়া চলবে না। যেহেতু যুক্তিতর্ক ও বিজ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম বিশ্বাসেরই গোড়ার কথা: অন্ধ বিশ্বাস ও প্রগাঢ় সংস্কার অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়। অবশ্য আমাদের শাস্ত্রেও আছে: বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। দিব্যজীবনের মূল ভিত্তিতেও বিজ্ঞানহীন বিশ্বাসের ইমপেটাস্ পাবি। তাই বলছিলুম: অমিতাভের যে আত্মশুদ্ধির জন্য এই অজ্ঞাত-বাস—সে কি যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে অকপট ভক্তের স্থান গ্রহণ করতে পারবে! দেশের কাজ হয়ত চলতে পারে বা করতে পারে তাতে বাঁধা নেই।

সে কথা তো বলতে পারব না, বাবা। তবে এটুকু বুঝি যিনি যে কাজ করে তৃপ্তি পেতে চান—তাঁকে সে কাজে বাধা দেবার প্রয়োজন কি?

একটু একটু আছে বৈ কি? তোর ইচ্ছেও ফেলনা নয়। আর নারীচিত্তও এমন কিছু খেলনা নয়।

তুমি বিচার করছ পিতার সন্ধানী চোখ দিয়ে, কিন্তু হৃদয়াবেগের উত্থান পতন সেতো চির অবুঝ। ভক্তি এবং প্রেম এ-দুটোতেই অন্ধ-বিশ্বাস না থাকলে বোধহয় তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

যা ভাল বুঝিস কর্। তবে তোর একটা স্থিতি হলে আমি মনে তৃপ্তি পেতুম। অমিতকে রেখে গেলে আমার তত্ত্বাবধানে—আমি যতই ওকে দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি—ও একটি বিস্ময়—ও—কাজ করে কোন ফললাভের আশা না রেখে। তাছাড়া অনেক আলাপ আলোচনাও করে দেখেছি: ওর মণীষা এত গভীরে যে সাধারণ মানুষ ও মনের নাগাল পাবে না।

সে আমি জানি বাবা। সেজন্যই তো নিশ্চিন্তে ওর হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে আমি জামসেদপুর যেতে পেরেছিলুম।

যেমনি মার্জিত রুচি তেমনি সংস্কৃতিবান মন। আমার তো খুব ভাল লাগে ওকে। সময় সময় মনে হয় ও অমিতাভের চাইতেও অনেক উঁচুতে। না-ই বা লিখতে পারুক—কিন্তু ভাবুক তো—একটি উচু দরের ভাবুক।

আমি সবই স্বীকার করি বাবা। তোমার বিচারে এতটুকু ভুল নেই। এত কালচারড্ মনের ছেলে যে-কোন দেশেই দুর্লভ। সে কিছু বলবে না। শুধু ভাববে আর কাজ করে যাবে। এতটুকু হ্যাংলাপনা নেই।

তাই সময় সময় মনে হয় তোর পছন্দটা যদি অমিতাভ না হয়ে অমিত হতো, তবে বোধ হয় মন্দ হতো না।

কিন্তু বাবা, যুক্তি দিয়ে তো ভালোবাসা যায় না। একটি লোককে বিচার করতে হলে যেমন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে হয়, ঠিক তেমনি প্রেমের ব্যাপারেও। একটি মানুষকে আমাদের ভাল লাগে তার সামগ্রিক দোষগুণ নিয়ে—এখানে যুক্তিটা ঠিক খাপ খায় না।

ঠিকই বলেছিস মা, আমারই ভুল। ভালবাসা যুক্তি দিয়ে চলে না, তবে অভিবাবক যাঁরা তাঁরা ব্যবহারিক দিকটাও বিচার করতে বসেন বলেই দ্বন্দ্ব লাগে। অবশ্য আমি তোর মতের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলব না।

সে আমি জানি। কারণ তোমার সংস্কারমুক্ত মন। তুমি কখনও জুলুম করে একের ইচ্ছের পরে অন্যের ইচ্ছে চাপাবে না।

এর ভেতরেও স্বার্থপরতা আছে। কারণ যার সুখের জন্য আমি বিয়ে দেবো সে-যদি খুশী না হলো, তবে আর সবাইকে খুশী করবার আমার তাড়া নেই। তুই আমার নয়নের মনি, আমার অস্তিত্বের সবটুকু তুই। তোর মায়ের মৃত্যুর পর এতদিন যে আমি বেঁচে আছি—সে-ও বোধহয় তোর জন্য।

ইলীনা কাগজ ফেলে দিয়ে আরর্ম চেয়ারের হাতায় বসে গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে বাবাকে আদর করতে থাকে। যেন ছোট্ট শিশু আব্দারে পিতাকে বিভ্রান্ত করবার জন্য নানা কৌশলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে।

এমন সময় অমিত এসে উপস্থিত হয়।

অমিতকে দেখতে পেয়ে ইলীনা সংযত হয়ে নিজেকে গুছিয়ে বসে।

অমিত বলে : কি ব্যাপার ?

ইলীনা বলে : ব্যাপার আর নতুন কি হবে বল ? আজকের কাগজে বাবার বই-এর রিভিয়ুটা দেখেছ ?

হ্যাঁ, আমি দেখেছি। একটুও বাড়িয়ে বলিনি। যা সত্যি তাই লিখেছে। উনি যে কেন আর লিখলেন না তাই অনেক সময় ভাবি।

সোমনাথ বলে : লিখব বললেই কি লেখা চলে অমিত। তোমার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যদি সুস্থ না থাকে—তারপর ভেতর থেকে যদি তোমার লিখবার মত তাগিদ না আসে—তবে লিখবে কি করে ? পড়া জিনিসটা সহজ। আরাম করে শুয়ে বসে শেষ করা যায় ; কিন্তু লেখাটা যে সাধনা, ওটা সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য। সেজন্যই শিল্পীকে আমরা সমীহ করি, শ্রদ্ধায় মাথা নোওয়াই।

অমিত বলে : সেকথা আমি একশ'বার স্বীকার করি। আপনার মতে আমি সম্পুর্ণ একমত। তারপর আপনি আজ আছেন কেমন ? বাজে চিন্তা আপনি মোটেও করবেন না। আর চিন্তা করবার আপনার দরকারটাই বা কি ? ইলীনা পাশে রয়েছে। বন্ধু বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীর অভাব আপনার নেই। আপদে বিপদে সব সময়ই আপনার পাশে আছে।

তুমি ঠিকই বলেছ অমিত। তবু ব্রেনের ভেতর চিন্তা এসে ভিড় করে। ব্রেন্ তো ভ্যাকেণ্ট বা ফাঁকা থাকতে পারে না। একটা না একটা কিছু আসবেই।

কিন্তু আপনার যা ব্যারাম তাতে তো অনাবশ্যক চিন্তাভাবনা করা একেবারে নিষেধ।

সংসারে নিষেধ অনেক কিছুই থাকে—কিন্তু সব নিষেধই কি মন মেনে চলে ? 'জগতে কোন খাঁটি জিনিস, কোন সাধু প্রচেষ্টা, কোন সত্যজ্ঞান, নষ্ট হয় না, অমিত।'

হঠাৎ এ-কথা বলছেন কেন ?

বলছি, মহাপুরুষদের কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে। 'তোমার কাজটি যদি খঁাটি হয় তবে তা' বিশ্বমানবের সম্পত্তি হয়ে থাকবে।'

ইলীনা উঠে বলে : তোমরা গল্প কর, আমি তোমাদের চায়ের ব্যবস্থা করি।

অমিত বলে : আমার কিন্তু চা-পানের বিশেষ ইচ্ছে নেই। বরং এসো সকলে মিলে বসে গল্প করা যাক্।

তুমি চা' না খেলেও আমরা তো খেতে পারি !

সরি, তোমাদের কথাটা আমার খেয়াল হয় নি।

যাক্ বেশী সময় নেব না। শীগ্গীরই ফিরে আসব।

সোমনাথ ও অমিত কিছুক্ষণ সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে টুকরো টুকরো আলাপ করে চলছিলো। ইতিমধ্যে নিজেও চাকরের হাত দিয়ে প্রচুর চা ও খাবার নিয়ে এসে উপস্থিত হয়।

চা-পান ও খাবার খেতে খেতে নানান বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। ইনফ্লেশন, ডি-ভ্যালুয়েশন, দেশের সাম্প্রতিক শাসন ব্যবস্থা সব কিছু নিয়েই কথাবার্তা হয়। সোমনাথ অমিতের কথার জের ধরে বলে : নেহেরু সরকার কি করবে ? দেশের মানুষ যদি তৈরী না হয়—স্বার্থ বোধ যদি মানুষকে অন্ধ করে তোলে, তবে একা প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর সরকার কি করতে পারেন ?

অমিত বলে : শাসন ব্যবস্থা তো পুরাণো কাঠামোর মাধ্যমেই চালু করতে হলো !

সোমনাথ : তাছাড়া উপায়ই বা কি ছিল, বল ? সমস্ত বিভাগে নতুন লোক নিযুক্ত করলে তো হোলসেল ডেসট্রাকশন হতো। প্রথমতঃ কর্মে অনভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়তঃ চুরি—এই দুয়ে মিলে ধ্বংসের মুখ আরও প্রশস্ত হতো।

ইলীনা বলে : দেশের শিক্ষিত লোকদের চারিত্রিক দুর্বলতা ও নীচু মনোবৃত্তি দেখে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শোনা যায় শেষ বয়সে মিস্‌য়্যানথ্রোপ হয়ে পড়েন অর্থাৎ মানবজাতিকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করতেন।

অমিত বলে : কেন সে তো ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারও বলেছেন : এই শু-খেকো জাতের কিছু হবে না।

সোমনাথ বলে : কথাটা ঠিক। তবে একটা জাতের মধ্যে সকলেই মন্দ হতে পারে না, আবার সকলেই ভাল হবে সে-আশাও করা যায় না। মন্দের পার্সেণ্টেজ-টা বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যাসাগরের দেশ সেবাও নিষ্ফল হয় নি—বহু যুবক যুবতী তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা সৎকাজে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। ডাঃ মহেন্দ্র লালের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণাগারে বসে রমন জগৎ—বরেণ্য হলেন। কাজেই দেশের পুরুষদের আদর্শ ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা চলে না।

অমিত বলে : সেদিন স্যার যদুনাথের জীবন দর্শন পড়তে গিয়ে দেখলাম একটা জায়গায় তিনি বলছেন : যে যুবক-সাধক মহা-আদর্শ বরণ করবে, তাকে প্রথমে চারিদিক হতে দৈন্য হিংসা, দূর্ণাম এবং নানারকমের বাধা নীরবে সহ্য করতে হবে। এজন্য তার পক্ষে চাই একটি অন্তর্জগত অর্থাৎ মনের মধ্যে একটি দুর্গ সৃষ্টি করা, সেখানে বসে থেকে তার চিত্ত স্নিগ্ধতা শান্তি ও বল পেতে পারে। সেই জগতটা হচ্ছে মনীষীগণের রচিত সাহিত্য।

ইলীনা হেসে বলে : আমি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। একটি অন্তর্জগত বা দুর্গ কে কতটা তৈরী করতে পারে জানি নে—সেটা বোধকরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপেক্ষা রাখে; বই ছাড়া কোন ভদ্রব্যক্তির যে এক মুহূর্তও চলে না সেকথা বলাই বাহুল্য। এখানে শত্রু মিত্র কারো প্রবেশাধিকার নেই। এ-এক নতুন জগৎ যেখানে পাওয়া যায় নতুন প্রাণের স্পন্দন।

সোমনাথ বলে : সবই ভাল মা। তবে আমি যেটুকু বুঝি তাতে মনে হয় দেশ স্বাধীনতার পর বড় বড় পরিকল্পনার পরিবর্তে দেশে শিক্ষার যাতে প্রসার হয় সেই ব্যবস্থাই সরকারের করা উচিত ছিল। এ-ব্যাপারে ফাণ্ডস্ নেই বললে চলবে না। যেখান থেকে পার টাকা ধার কর্জ করে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দাও। তাহলে দেখবে সবকিছু ব্যবস্থা আপনা থেকেই গড়ে উঠবে। নিজের ভাবনা নিজেরা ভাবতে শিখলে আর সরকারের মাথা ব্যথার কারণ নেই!

অমিত বলে : সে কথা আর মিথ্যে কি! সরকার ত আর আজ বিদেশীর নয়। নিজেরাই নিজেদের ভাল মন্দ তৈরীর ভার স্বচ্ছন্দে নিতে পারে।

ইলীনা বলে : শিক্ষা পেলে তবে তো নিজেদের ভার নিজেরা নিতে পারবে। শিক্ষা পেলেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছে জাগবে। 'শিল্পী হলো স্রষ্টা। বৈজ্ঞানিক দেখেন বস্তু, সাহিত্যিক দেখেন বস্তুর আমিত্ব।' কিন্তু সাধারণ মানুষ শিক্ষা পেলে করবে কি—না জীবনের যে প্রাথমিক জীবনধারণের—কতগুলো নীতি আছে—যথা, খাওয়া, শোওয়া, থাকা ও বাঁচা—তার জন্য আর অপর মানুষের মাথা ঘামাতে হবে না।

এমন সময় সোমনাথ বলে : আমি একটু একা একা বিশ্রাম করি। তোমরা বরং লনে গিয়ে বসগে।

ইলীনা বলে : কেন বাবা, শরীর খারাপ লাগছে না তো?

না মা, আমি ভালই আছি। কোন চিন্তা নেই। তোমরা গল্প করগে— আমি একটু চুপচাপ থাকতে চাই।

চুপচাপ থাকতে চাও ভাল, কিন্তু ক্রুড্ করতে পারবে না।

আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

লনের মাঝখানে গিয়ে ওরা পাশাপাশি একটি বেঞ্চিতে বসে। আকাশ নির্মল। পঞ্চমীর চাঁদের ক্ষীণ রেখা আকাশে দেখা যায়। কিন্তু ক্ষুদে নক্ষত্রের ভিড়ে সমস্ত আকাশ জমজমাট। মৃদুমন্দ সান্ধ্য বাতাস হাওয়া দিচ্ছে।

ইলীনাই প্রথমে কথা বললে : বাব্বা : মেয়েরা এত গুরুগম্ভীর আলোচনা কতক্ষণ সইতে পারে, বল?

অমিত বলে : কেন, তোমরা তাহলে কি আলোচনা করতে চাও?

সত্যি কথা বলতে বাপু আমার লজ্জা নেই। আমরা প্রেমের কথা শুনতে চাই। নরনারীর প্রেম গো বুঝলে?

তাহলে তোমাকে প্রেমের কথাই শোনান উচিত। অভয় দিলে শোনাতে পারি।

অভয় তো অনেক আগেই দিয়েছিলুম। কিন্তু পুরুষের যে সাহস

দরকার সে সাহসের অভাব পুরুষ চরিত্রে দেখতে পেলে মেয়েরা খুব খুশী হয় না, জানলে?

হিসেবে ভুল হলে যে ছেলেদের আবার প্রাণের দায়ে দৌড়োতে হয়।

হৃদয়ের কারবারে ওটুকু হিসেব ছেলেমেয়ে উভয়েরই বোঝা উচিত।

অনভিজ্ঞ কারবারী ব্যবসায়ে ফেল হবে এ-আর বেশী কথা কি।

নরনারীর টোটেম আর টাবুতে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও যারা বিরোধের আভাস পায় তাদের কি বলে, জান?

শুনেছিলুম বটে। কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারছি নে। তুমিই বল না কেন, না হয় আর একবার শুনে রাখি।

শুনবে তাহলে? কবি বলেছেন: তাদের প্রকৃতির গুপ্তচর।

হয়ত ঠিকই। কিন্তু শুধু দেহ-বিপণি নিয়ে মানুষের জীবন নয়। তারপরেও আছে জীবন।

ঠিকই বলেছ। আমিও তাই বলি। জাষ্ট লাইক ফুড্ এণ্ড ড্রিংক ফাণ্ডামেণ্টাল চাহিদাটাকে তোমার প্রথমত মেটাতে হবে, তারপর অন্য চিন্তা। একে বলে মানব জীবনের ধর্ম।

রিলিজিয়ন অফ্ ম্যান্। হিউবার্ট লেকচারস্ নয়। একে বলে ইলীনা ম্যানিফেষ্টো। কি বল? এরপর কি পরিকল্পনার অধ্যায়ে আসবে? না. হুকস্ অফ্ নেচার—ফেমিন, পেসটিলেনস্, ওয়ার। একধারে সৃষ্টি অপরধারে সংহার।

তুমি ঠাট্টা করছ অমিত?

এতটুকু নয়। যা নিছক সত্য তাই বললুম। কথায় আছে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। জন্ম আর বিবাহটাকে মানুষ কিছুটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মৃত্যু? তার ভাষ্যকার কোথায়?

তুমি বড্ড সিরিয়াস হয়ে উঠছ।

মোটেও না। ধর তোমাদের বাড়ির পাশে যদি কোন বাড়ি থাকতো (ভাগ্যিস নেই) এবং আমাদের এমনি নিরালায় বসে আলাপ করতে দেখতো—তাহলে হয়ত অনেক কিছু ভেবে নিতো অথবা তুমি তাদের কল্পনাতে বাধা দিতে পারতে না। সত্যি সত্যি প্রেমিক—প্রেমিকারা কি আলাপ করে গো—আমার ত কোন ধারণা নেই।

প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে আমাকে তুমি ভোলাতে চাইছ।

না, না—তুমি কিন্তু আমার প্রতি অবিচার করছ।

আচ্ছা অমিত, আমাকে একটি সত্যি কথা বলবে?

বল?

তুমি কেন নিজেকে এত লুকিয়ে লুকিয়ে ঘোর। নিজের কথা কেন তুমি কিছু বলতে চাও না?

বলবার মত কিছু কি আছে যে বলব?

তোমার জীবনের প্রিনসিপুল্ কি, ক্রীড্ কি, ব্যারিকেডস্-ই বা কি কি আমার জানতে ইচ্ছে করে।

অবলা নারী! এই অবুঝের মত ইচ্ছে কেন? শেষ কালে কি দেহ সর্বস্ব কথা সাহিত্যিকের ভাষায় আমাকে জবাব দিতে হবে।

তুমি হেঁয়ালি করে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছ। কিছুই কি আমাকে জানতে দেবে না?

এমন সময় চাকর দৌড়োতে দৌড়োতে লনের কাছে এসে বলে: জল্দি চলিয়ে মিশিবাবা সাহাবকো তন্দুরস্ত আচ্ছা নেহি।

মুহূর্তের মধ্যে ইলীনা ও অমিত সোমনাথের পাশে এসে দাঁড়ায়।

ইলীনা কোরামিনের ফোটা মুখে দেয়।

একটু পরেই সোমনাথ চোখ মেলে তাকায়। বলে: কি ব্যাপার?

তোমার শরীর আবার খারাপ করেছে বাবা। চুপচাপ যেমন শুয়ে আছ তেমনি শুয়ে থাক। কোন কথা নয়।

আবার খারাপ করেছে। কই বুঝতে তো পারলুম না।

ঠিক আছে। কিন্তু আর কোন কথা নয়।

অমিত গিয়ে পাশের ঘরে ডাক্তারকে টেলিফোন করে দেয়। যতক্ষণ ডাক্তার না আসে বারান্দায় পায়চারি করে। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাক্তার যখন এসে পড়ে তখন অমিত ইলীনাকে ইশারায় ডেকে পাশের ঘরে গিয়ে বসে। তিনজনে মিলেই রোগী সম্বন্ধে আলোচনা চলে।

ডাঃ ব্যানার্জি হার্ট স্পেশালিষ্ট। তিনি বলেন: করোনারি থ্রম্বসিসের ওষুধ তো সত্যিকারের কিছু আর বেরোয় নি। কি ওষুধ দেবো বলুন? ওই এ্যাড্রিনেলিন ও কোরামিন হাতের কাছে রাখবেন। তাহলেই প্র্যাকটি-

কালি ডাক্তারি দায়িত্ব শেষ হলো। এরপর যা কাম্য তা হচ্ছে: পরিপূর্ণ বিশ্রাম, অনাবশ্যক চিন্তা বা অন্য কোন প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ করা একেবারেই চলবে না। বলুন দেখি ওঁর মনে কি কোন দুঃখ বা অনাবশ্যক চিন্তা আছে কি না?

অমিত বুদ্ধি করে জবাব দেয়: চলুন না পাশের ঘরে। রোগীকেই সরাসরি জিগগেস করবেন।

বেশ তো তাই চলুন। করোনারি থ্রমবোসিস্ সম্বন্ধে সম্প্রতি আমেরিকায় কিছু কিছু গবেষণা হচ্ছে। কারণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এই রোগে আক্রান্ত হবার পর ওখানে রিসার্চ চলে। কাজেই ও-রোগের ওষুধ আমাদের দেশে আসতে এখনও অনেক দেরী।

কথা বলতে বলতে ডাক্তার, ইলীনা ও অমিত সোমনাথের কাছে এসে উপস্থিত হয়। ডাক্তার ব্যানার্জি ব্লাড্ প্রেসার দেখলেন। নাড়ী দেখলেন ষ্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করলেন। তারপর গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন: বলুন দেখি, আপনার আর এখন কি কি অসুবিধে হচ্ছে?

সোমনাথ ডাক্তারের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন: অসুবিধে, কোথায়—কিছু তো বুঝতে পারিনে।

আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিগ্গেস করব, কিছু মনে করবেন না। ডাক্তারের কাছে কিছু লুকোতে নেই। বলুন দেখি আপনার মনে এখন কি জাতীয় চিন্তা আসে?

চিন্তা। তার তো কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে সব চিন্তা ছাপিয়ে আমার মেয়ে ইলীনার বিয়ের কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়। ওর একটা স্থিতি দেখতে পেলে আমি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতুম।

ঠিক বলেছেন। পিতার পক্ষে এ জাতীয় চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? বাঁধাটা কোথায়? পাত্রও তো শুনেছি ঠিক আছে।

হ্যাঁ, কথাটা সত্যি বটে। তবে আজকাল তো আর গৌরীদান প্রথা নেই। পাত্রপাত্রী উভয়েই সাবালক এবং উচ্চশিক্ষিত। তাঁরা নিজেরা তাঁদের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। সুতরাং অভিবাবকের পীড়াপীড়ি এক্ষেত্রে সাজে না।

ইলীনার দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ় ডাক্তার বানার্জি বললেন: এটা ঠিক নয়

মা। বাবাকে যদি বাঁচাতে চাও, তবে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা চলবে না।

বেশ তো অমিতাভকে একটা টেলি করে দি—বলে সমর্থনের ভঙ্গীতে অমিত ইলীনার দিকে তাকাল।

সোমনাথ বলে : তাই দাও অমিত। একটা ফোনোগ্রাম করে দাও পাশের ঘরে গিয়ে।

হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি করে দিচ্ছি।

ডাক্তার বিদায়ের পরে ইলীনা অমিতকে বলে : তুমি আজ রাতে এখানে থেকে যাও। আমি বড্ড একা ফিল্ করছি।

বেশ তো আমি থাকবো। আগামী পরশুই হয়ত অমিতাভ এসে পড়বে।

রাতের খাবার পর বাবাকে বিছানায় শুইয়ে ইলীনা ও অমিত বারান্দায় দুটি চেয়ার নিয়ে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে।

অমিতই এক সময় বলে : বুঝলে ইলীনা, নারী বিবাহ চায় আবার মাতৃত্বও চায়। কারণ মা হয়ে মহীয়সী নারীর পর্যায়ভুক্ত হতে না পারলে তার দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু এই দুঃখ কেন? ছেলেকে মানুষ করলে, বড় হলো—কিন্তু ছেলে পর হয়ে গেল। ছেলে বাপকে বললে : তুমি তোমার কর্তব্য করেছ। ছেলেকে ভালবেসেছ তোমার নিজের খাতিরে। আমার কাছে তোমার কোন পাওনা নেই।

ইলীনা চুপ করে শুনে যায়। ভাবে : অমিত কার কথা বলছে—নিজের কথা কি?

অমিত বলে চলে : পিতা পুত্রকে ভালবাসে পুত্রের জন্য নয়, পিতা পুত্রের মধ্যে নিজের আত্মার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে খুশী। এই কি জীবন? সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল রহস্যের গোড়ার কথা যদি এই হয় তবে তাকে বড় আত্মকেন্দ্রিক মনে হয়—এ যেন বড় সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয়।

ইলীনা বলে : অমিত, আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে তুমি কি বলতে চাইছ? কার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ?

অভিযোগ আমার কারও বিরুদ্ধেই নেই ইলীনা।

তবে?

গতানুগতিক এই সাংসারিক জীবের সঙ্গে আমি যেন ঠিক নিজেকে মিশ খাইয়ে নিতে পারি নে। কোথায় যেন দ্বন্দ্ব, কোথায় যেন গরমিল? অতীতের সুসমৃদ্ধ সমাজবাধন ধীরে ধীরে দৈনন্দিন জীবনে জটিলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ভারতের যৌথ পরিবার প্রথাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতাই আজ আমাদের বিষয়ী মানুষের আদর্শ। হৃদয়ের দাঁড়াবার স্থান নেই আর যেটুকু আছে মেকানিকাল ওয়েতে একটা সামঞ্জস্য বিধান।

ইলীনা বলে: অমিত, তুমি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পড়েছ?

না পড়িনি।

শান্তিনিকেতন পড়ে দেখো। হাইয়েষ্ট ফিলসপি অফ্ লাইফ্ তুমি দেখতে পাবে!

যথা।

যথা: আত্মা যেদিন অমৃতের জন্য কেঁদে ওঠে তখন সর্বপ্রথমেই বলে, 'অসতো মা সদ্‌গময়—আমার জীবনকে আমার চিত্তকে, সমস্ত উশৃঙ্খল অসত্য হতে সত্যে বেঁধে ফেলো—অমৃতের কথা তারপরে। বন্ধনহীন অসংযত অসত্যের মধ্যে আমাদের মন হাজার টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলতে দিয়ো না। তাকে অটুট সত্যের সূত্রে সম্পূর্ণ করে বেঁধে ফেলো—তারপর সে হার তোমার গলায় যদি পরাতে চাই তবে আমাকে লজ্জা পেতে হবে না।'

এ-কি ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে—না 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা।' অমিতাভ এবার এসে পড়লে অসত্য হতে সত্যকে বেঁধে ফেলো। বন্ধন হীন অসংযত অসত্য ভাল কথা নয়।

ইলীনা হেসে বলে: কবি তো সকল প্রেমের কবিতাতেও ঈশ্বরকে জড়িয়েই তার বক্তব্য শেষ করেছেন। 'উপনিষৎ—আনন্দরূপমমৃতম—ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায়, যা যায়, তাতে আমাদের আনন্দ নেই। যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অ... দেখি, অমৃতকে দেখি, সেখানেই আমাদের আনন্দ। এই অসীমই ...;

তাঁকে দেখাই সত্যকে দেখা।' যেখানে তা না দেখবে সেখানেই বুঝতে হবে, আমাদের নিজেদের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্কারের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেজন্যই তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছি নে।' শিল্পীর দায়িত্ব সহজ নয়ঃ 'মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়াই শিল্পীর কর্তব্য।'

অমিত বলেঃ সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, অংশ ও সম্পূর্ণ এসব জিনিস আমি ঠিক বুঝি না। যেটুকু বুঝি—বলতে পার, আনন্দের পেছনে জয়যাত্রা। সকলেই আমরা সেই আনন্দের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি—আমাদের লক্ষ্য আনন্দ কিন্তু নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী। তারপর আর একটা কথা সত্যিকারের প্রেম কখনও আসক্তির অনলে পুড়ে মরে না—কারণ আসক্তির অনেক উর্ধ্বে প্রেম। কবি নিজেও অনেকভাবে একথা তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছেন।

তোমার নিজের কথা বল অমিত—আমরা ক্রমশ বিষয়বস্তু থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি।

গতানুগতিক সংসারযাত্রা আমার তেমন ভাল লাগে না। নির্জন লোকালয়হীন প্রান্তর আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। তুমি বলবে, ভীরুতা—নয়ত বলবে, রিক্ত সন্ন্যাসের নিভৃত আয়োজন।

আমি কিছুই বলব না অমিত। তবে এটুকু বলবঃ মানুষ যেমন করে বেহালা বাজায়, সেতার বাজায়, ভায়োলিন বাজায় তেমনি করে পুরুষ যদি নারীকে বাজাতে না জানে তবে সে পুরুষের জীবন এমনি ব্যর্থ ও উদ্দেশ্যহীন হয়। বলতে পার সরম ও সংকোচ ত্যাগ করে নারী হয়ে এসব কথা আমি কি করে বলছি! 'আর তাছাড়া, মেয়েদের হৃদয়ের অন্দরমহলের আযৌবন অবরুদ্ধ' আশা ও কামনা হল নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেওয়া। আমাকে কর তোমার বীণা—একজন বাজতে আর একজন বাজাতে।' কিন্তু আমাদের সমাজে এমন দিন কবে আসবে যখন নারী পুরুষ সবাই মিলে তাদের জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপারে নিঃসংকোচ প্রত্যক্ষ আলোচনা করে ফয়শালা করে নিতে পারবে? এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার!

কেন তুমি আমি তো আলোচনা করতে পারছি—সেইটেই কি যথেষ্ট নয়?

না যথেষ্ট নয়। দুশো বছরের ইংরেজ রাজত্বে যে দেশে শতকরা সতেরো

আঠারো জন নাম স্বাক্ষর করতে শিখেছে সেদেশে তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ অতি অল্প।

দেশ-জাতি-শিক্ষা সবশুদ্ধ একসঙ্গে ধরে টান দিলেই গোলমাল হবে। একটা একটা করে অগ্রসর হও।

সে কথা তুমি বলতে পার ; কিন্তু সবই যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

খুবই সত্যি কথা। কিন্তু আজকের এই এ্যাটমের যুগে মানুষের ধ্যান ধারণা, আদর্শ, মানবতা বোধ—সব কিছু পালটে যাচ্ছে। আমরা পূর্বের সংজ্ঞাগুলি নিয়ে তো আর খুশী নই। চোখের নিমিষে কত কি ঘটে যেতে পারে! এই ধর না কেন 'কনসেপশন অফ্ গড' কতদিনের? মানুষ হয়ত তুই লক্ষ বছরের অধিক পৃথিবীতে বাস করছে হয়ত বা তারও অনেক বেশী সে খোজই বা কে রাখে। গড়ে তুলেছে শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা। এ্যাটম্ যদি পৃথিবীকে নিঃশ্চিহ্ন করে দিতে চায় তবে সেটা কি ভাল হবে? এত দিনের ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সব জিনিস মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে—কোন চিহ্ন থাকবে না। তবে আমাদের গর্ব করবার আর রইল কি?

ধূলিস্যাৎ কেন হবে? আলোচনার মাধ্যমে সব কিছু বোঝাপড়ার একটা সুযোগ এসেছে। যেহেতু মুহূর্তে আমরা সবকিছু ধ্বংস করতে পারি বলেই ধ্বংসের আগে দশবার ভাবব দশবার আলোচনা করব। আমাদের পূর্ববর্তীরা এ-বলে বঞ্চিত ছিলেন। রিপুর তাড়নায় পশুর মত মনে হলো: রক্ত চাই— আর কথা নাই। সাজ সাজ রব। মানুষ আবার বিবেচনা শক্তি ফিরে পাবে—কারণ হাল আমলে মতামত রিভিউ করবার সুযোগ আছে।

বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন: মানব সেবা ধর্ম। স্বামীজীর ভাই ডক্টর ভূপেন দত্ত একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন: মাই ব্রাদার ওয়াজ এ সোসালিষ্ট আণ্ডার দি গার্ব অফ্ এ মংক। অবশ্য বিবেকানন্দ নিজেও এ-জাতীয় কথা বলেছেন। এ্যাটম্ যুগে সব কথাই বাতিল হতে বসেছে। তুমি কার, কে তোমার? সমস্ত তত্ত্ব কথাই ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে 'রঙের নিমেষ' পৃথিবীকে এক জ্বালাময়ী মরুভূমিতে পরিণত করবার ষড়যন্ত্র করেছে। 'হে যুদ্ধ বিদায়' বা 'শান্তি চাই' বলে বই-এর পর বই-এর পাহাড় রচনা করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধি কি করে ফিরে আসবে? আলোচনার মাধ্যমে কি সব জিনিস মীমাংসা হবে?

কেন হবে না অমিত? সব হবে। মানুষের 'যুক্তিবাদ' আছে বলেই মানুষ মানুষ। যুদ্ধের সময় মানুষও পশু হয়ে যায়! তাই মানুষের যুদ্ধকে এতো ভয়। কারণ তখন মানুষ হিংসায় উন্মত্ত। কোনদিকে দৃকপাত নেই। রক্তের বদলে রক্ত চাই। কিন্তু রক্তের বদলে রক্ত তো পশুর চাহিদা। ওতে শালীনতা নেই, সংস্কৃতি নেই, রুচি নেই। যা আছে তা স্থূল পাশব একটা পিপাসা যার তুলনা নেই।

তাইতো সময় সময় পৃথিবীটাকে মনে হয় অর্থহীন।

কিছুই অর্থহীন নয়। কিন্তু শুস্ক জীবন থেকেও আনন্দ-কে বের করবার কৌশল শিখে নিতে হবে। শিল্প বল, সাহিত্য বল, ললিতকলা বল এসব দিকে আমাদের সম্ভোগ পিপাসা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে না পারলে সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কল্যাণও ব্যাহত হবে। রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির সঙ্গে যদি কল্যাণবোধ জড়িত না থাকে তবে দেশ ও দশের পক্ষে দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

ব্যক্তি স্বার্থবোধকে আমরা বড় করে দেখি বলেই আমাদের জীবনের যত কিছু প্রচেষ্টা সব আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। আমরা নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, পরছিদ্রান্বেষী। পরনিন্দা ও পরচর্চাই আমাদের অবকাশ বিনোদনের একমাত্র মুখরোচক সরস বিষয় বস্তু। যাও তুমি সভাসমিতি করতে বা কোন একটা ভাল কাজ করতে—দেখতে পাবে পদে পদে তোমার কত প্রতিবন্ধক? জাতি হিসেবে গৌরবের কিছু দেখি না।

কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যেও না অমিত—বলতে পারো আমাদের চরিত্রে বহুবিধ দোষ ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণের বীজ কোথায় লুকিয়ে ছিল? আচার্য যদুনাথ বলেছেন: ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করেছে তার প্রাণের বীজ ছিল নব্যগঠন ও চরিত্র গঠন, জাতীয় ঐক্য (বর্ণ-ভেদের বিরোধী) এবং ব্যবসায়ে আত্মনির্ভরতা। এই চিরসত্য আমাদের প্রথম যুগের নেতারা প্রচার করেন, কিন্তু আজ আমরা তা ভুলে গেছি।

একটি দেশকে বড় করতে হলে সেদেশের মানুষের 'মনুষ্যত্ব' বিবেক ও মননশীলতা'র যাতে উন্নতি বিধান করা যায়—সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে সেদিন রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতায় দেখলুম তিনি বলেছেন: সমাজ বলতে আসলে মানুষই বুঝায় না, তার কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন বুঝায়

না। সুতরাং সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রযত্নে মানুষকে বড় করতে হবে। মানুষকে বড় করা বলতে বোঝায় তার মনুষ্যত্ব, বিবেক ও মননশীলতার উন্নতি বিধান করা। বিজ্ঞান প্রভাবে মানুষের মনে জন্মেছে ক্ষমতার নেশা, জন্মেছে আহরণের লোভ। যারা আহরণ করতে পেরেছে তারা হচ্ছে প্রমত্ত, যারা বঞ্চিত হচ্ছে তারা হচ্ছে আশাহত হীনমন্যতাগ্রস্ত। কাজেই ব্যক্তিমানুষের নৈতিক পুনর্বসতি চাই। সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বাঁধ ও যানবাহনই এজন্য যথেষ্ট নয়। বরং এগুলি মোটেই সর্বাগ্রগণ্য নয়। আসল জিনিস হলো মনুষ্যত্বের পরিপোষক শিক্ষা ও সংস্কৃতির।

রাধাকৃষ্ণনের এ বক্তৃতা আমি পড়েছি। এ-প্রসঙ্গে সেদিনের লীডিং এডিটোরিয়ালটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে: যে কোন শিক্ষাই মানুষকে দেওয়া হোক, তার ভিত্তিটা মানবাত্মিক বিদ্যে দিয়ে গড়ে দিতে হবে। মানবাত্মিক জ্ঞানভ্রষ্ট হলে মানুষ কিছুতেই মানবিক মহত্ত্বে পৌঁছিতে পারবে না। আবার এও ঠিক, অর্থকরী সম্ভাবনা-শূন্য হলে এ-যুগে মানুষ শিক্ষার সঙ্গে কিছুটা বৃত্তিমূলক শিক্ষারও সংযেজন দরকার। কারণ দুই-এর সুষ্টু সমীকরনেই হবে শিক্ষার প্রকৃত সমুন্নতি এবং সব রকম শিক্ষার শ্রমমূল্য এক করার দ্বারাই সমাজে শ্রেণীভেদ দূর করা সম্ভব—একথাও বলেছেন বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় 'আমরা শুধু বাক্যেই দিগ্বিজয় করছি।' আসল ব্যাধি যে কোথায় তা আমরা জানি না এবং প্রতিকার যে কি সে সম্বন্ধে ও আমাদের কোন গবেষণা নেই।

অমিতের মাথায় এবার একটু দুষ্টু বুদ্ধি চাপলো। পঞ্চমীর চাঁদ অনেকক্ষণ ডুবে গেছে। একটা আলো আঁধারি আবছা আবছা ভাব। মানুষের আকৃতি সিলিয়ুটের ক্ষীণ রেখার মত প্রতীয়মান। এমন সময় অমিত বলে: ইলীনা তোমার পেছনে ওটা কিসের ছায়া-ঠিক যেন মানুষের মত।

যেমনি একথা বলা আর অমনি ইলীনা হুড়মুড় করে নিজের চেয়ার ছেড়ে অমিতের চেয়ারের ওপরে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে।

এ-ব্যবস্থায় অমিত নিজেও কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কারণ ইলীনা এতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে—অমিত তা আশা করতে পারে নি।

অমিত বলে : কি পাগলামি করছ? আগে ঠিক হয়ে বস দেখি। ওঠ বলছি।

না আমার ভয় করছে।

আমাকে জড়িয়ে থাকলেই কি ভয় কমবে। স্বাধীন জেনানার পক্ষে এ-হেন বুলি শোভা পায় না। মুখে বড় বড় বাদ। বিশ্বজয়ের প্রশ্ন—বিশ্বচিন্তায় সমগ্র মনপ্রাণ—তার কিনা সামান্য ছায়া দেখে ভয়! চমৎকার ব্রেভো! তোমরা একা চলো ফেরো কি করে? এই তো জামসেদপুরে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে এলে—সেখানে একা একা ভয় করেনি।

ন'—তা করেনি। এই বলে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আবার গিয়ে চেয়ারে বসে। তারপর বলে : ছায়ার কথা সেখানে তো কেউ এমন করে তোমার মত বলেনি—ভয়ও দেখায় নি!

তা ছায়া দেখে অতভয় করবার কি আছে?

না, নিশীথে নিরালায় ছায়া দেখে ভয় করবে না তো—ভয় করবে কাকে? ছায়ার কথা শুনলে গা ছম্ ছম্ করে যে।

ছায়া দেখে আবার ভয়টা কিসের? ভয় করবে মানুষরূপী জীবন্ত দানবকে।

কেন, তোমাকে ভয়টা কোথায় শুনি?

কারণটা আমারও রক্ত মাংসের শরীর। সংযমী বলে অতটা বিশ্বাস থাকা ভাল নয়—শেষকালে বিপদে পড়বে।

ও জাতীয় বিপদ ঘটলে নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করতুম। সে সুখ কি আর আমার কপালে আছে?

তোমার মা থাকলে বলতেন : প্রেমের ব্যাপারে মেয়েদের এত চঞ্চল হলে চলে না—মেয়েদের একনিষ্ঠ হবার প্রশ্ন আছে।

একনিষ্ঠ হতে পারলে সামাজিক সুবিধে আছে সেকথা মানি। কিন্তু মন পুরুষের মত নারীরও বহুনিষ্ঠ হতে বাধ্য।

চুপ্ চুপ্—একথা শুনতে পেলে সমাজকর্তারা মনে ব্যথা পাবেন।

সেদিন কি আর আছে—হিন্দু বিয়েতে ডিভোর্স বিল পাশ হয়ে গেল।

আইন দিয়ে বহুদিনের মনোবিকারকে একদিনে উচ্ছেদ করা চলে না। বাল্যবিবাহ বন্ধ করবার জন্য সর্দা বিলও এক সময় পাশ হয়েছিল, কিন্তু বিয়ে কি সত্যি বন্ধ হয়েছে ? এসব জিনিসের একমাত্র—প্রতিকার হলো শিক্ষা—একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে শিক্ষিতেরা ধীরে ধীরে বিয়ের বয়স নিজেরাই পিছিয়ে দিচ্ছেন—এর জন্য আইনী আশ্রয় নিতে হয় না।

সার্থক তোমার গবেষণা। যেন পাঁচ বছরের শিশুকে তুমি বোঝাচ্ছ।

পাঁচ বছরের শিশু আমি না তুমি পাঁচ মিনিট আগেই তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

তাই নাকি বন্ধু।

'আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।
ওরে মন,
যাত্রার আনন্দ গানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।'

এক নিঃশ্বাসে কবিতাটি আবৃত্তি করে ইলীনা যেন একটু পরিশ্রান্ত বোধ করে।

অমিত বলে : কি গো, উচ্ছল যৌবনের জয়গানে মন যে ভরপুর। বার্ধক্য-কে কি সত্যি সত্যি রোধ করতে পারবে ? এই তো আর দেরী নেই, অমিতাভ এলেই দুই হাত এক করে দেব—'জীবন যথাকালে সরস, সফল ও পরিণত হবে।'

ইলীনা হেসে বলে : কিন্তু তোমাকেও আমার ভাল লাগে অমিত।

বেশ তো ভাল লাগে বলেই তো তোমার কাছে আছি।

কিন্তু তুমি যেন কাছে বসে থাকার চাইতে আরও বেশী কিছু।

সেটুকু বিভ্রম। বোধ হয় রাত্রির মাদকতা। এখন বিশ্রাম কর গে। বাবাকে একবার দেখে সোজা শুতে চলে যাও। আমি বসে আছি। কোন

চিন্তার কারণ নেই। বাকী রাতটুকু পাহারা দেব। সকালে ঘুম থেকে উঠে তুমি বসো।

তুমি একা একা বসে থাকবে। কিন্তু কেন?

আর কিন্তু নয়। আর কোন কথা নয়। এবারে নিঃশব্দে লক্ষ্মী মেয়ের মত চলে যাও।

ইলীনাও আর দ্বিরুক্তি না করে ছোট্ট মেয়ের মত অমিতের উপদেশ পালন করতে পাশের ঘরে প্রস্থান করে।

সাত

সকালে বসে বসে ইলীনা অন্যমনস্কভাবে একটি সাপ্তাহিকের পাতা উল্টে যাচ্ছিল।

সাপ্তাহিকটি রিডিং ম্যাটারস্-এর চাইতে বিজ্ঞাপনের চটক বেশি। বোধ-হয় গরু হারালে গরু খুঁজে পাওয়া যায়। কত বিচিত্র ধরণের হরেক রকমের বিজ্ঞাপন।

'সামনে কারখানা। কিন্তু আকাশের দিকে তার চোখ! সেখানে কী দেখল সে? আকাশের গা ঘেঁসে দীর্ঘ পথ চলে গেছে। অসংখ্য সাদা পায়রা উড়ছে। কাঁটার মুকুট পরে ওই মানবকুল আগে আগে যায়।····সেই মৃত্যুঞ্জয় মানবপুত্রের আনন্দ ভাস্বর ইতিবৃত্তি।'

আবার চোখে পড়েঃ 'গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাস রাশিয়ার সিংহাসনে বসলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত রুশ সম্রাটের শাসনকাল সুরু হলো! ঘোষণা করলেন তিনিঃ ফটকের বাইরে বিপ্লব অপেক্ষা করছে আমি জানি। আর এও আমি জানি ফটকের বাইরেই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে। আমার শাসনের বরফের তলায় চাপা পড়বে সে।

'একশো বছর পরে দক্ষিণ কলকাতার বিনয় ঘোষাল তাঁর রোয়াকের ওপর সিমেণ্ট ঢালছিলেন। রোয়াকের বুক মসৃণ হলো। ছেলেরা বসলে আর উঠতে চায় না। বিনয় ঘোষালের শাসনকাল সুরু হলো এই যাট সালেই। নতুন শাসনের রোয়াকে বসে ঘোষণা করলেন তিনিঃ প্রতিবাদ করিস নে, গরম গরম জিলিপী খাওয়াবো। প্রতিবাদ করলে রোয়াকের তলায় চাপা পড়বি তোরা।

'নিকোলাসের রোয়াক আর নেই, গলে গিয়েছে।

'কিন্তু রোয়াক?'

কোলকাতার রকবাজী ছোকরাদের কাহিনী জানা আছে ইলীনার। মনে মনে হাসি পায়। ভাবেঃ বিজ্ঞাপনের কত কায়দা! শিল্পকে পণ্য করতে গিয়ে কোথায় রাশিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাস আর কোথায়

কোলকাতার রকবাজী ছোকরা। অবসর মুহূর্তে বিজ্ঞাপন পড়তে খুব ভাল লাগে ইলীনার। বিজ্ঞাপনের অপূর্ব শব্দ চয়ন যেন হাতছানি দিয়ে পাঠককে আকর্ষণ করে। আমাদের সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে শান্তির প্রলেপ দেয় বিজ্ঞাপন। পাঠকের সঙ্গে লেখক ও প্রকাশকের যোগসূত্রের এইতো একমাত্র সেতু।

আর একটি ভারী মজার বিজ্ঞাপন :

কোথায় দাঁড়িয়ে আমরা ভালবাসব!

গল্প নয়, গল্পের চেয়েও দামী। সোনার চেয়েও দামী। হীরা মুক্তা পান্নার চেয়েও দামী। সাত রাজার ধন এক মানিকের চেয়েও দামী। হারিয়ে যাওয়া একটি ছেলের উদ্দেশ্যে একটি মেয়ের চিঠি। চিঠির শেষে সে লিখেছে : রিতা, আমার পুরো দেখা আজও শেষ হয়নি। কিন্তু জন্মভূমি আমি পেয়েছি। তুমি কি তোমার স্বদেশ খুঁজে পেলে, রঞ্জন? তোমার জন্য এখনও অপেক্ষা করে আছি, অপেক্ষা করে থাকব। মনে আছে তুমিই তো বলেছিলে, জন্মভূমি নইলে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে ভালবাসব!'

সত্যিই তো প্ল্যাটফরম চাই।

'অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তার প্রেম। সে প্রেম কাহিনী সকল মনের সর্বকালের আনন্দ। সে প্রেমের রূপ বিচিত্র, সুন্দর ও সুমহিম।'

তাই তো। তাই তো।

দেশ কোথায় চলেছে?

'একটি তরুণ প্রেমিকের তীব্র আকাঙ্খা একটি কুমারী মেয়ের কোমল সুখস্বপ্ন, তারপর অন্ধকার প্রান্তরে প্রত্যয় এবং সংশয়ের বিক্ষুব্ধ ওঠাপড়া এবং সর্বশেষে প্রত্যূষে আলোর আভাস—হাজার শ্রোতার অস্তিত্ব মানুষের এক নিত্য, আদিম, সমগ্র অভিজ্ঞতায় পরিশ্রুত হলো।'

সকালের ডাক ব্যেরা এসে টিপয়ের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে যায়।

সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই নিজের নামের খামখানা তুলে নিয়ে পড়তে বসে।

জয়তীর চিঠি। কোলকাতায় বসেই কোলকাতার মানুষকে চিঠি লিখছে। ফোনেও কথা বলতে পারতো। ভারী লজ্জাবোধ হলো ইলীনার।

অনেকদিন হয়ে গেল তার কোন খবর জানি নে। আশাকরি কুশলেই আছিস্।

তোর নিশ্চয়ই জানবার সাধ আমার শ্বশুর বাড়ী কেমন লাগছে। তা তো

তোর জানতে ইচ্ছে করবেই—একে তুই 'প্রসপেকটিভ্ উড্ বি ব্রাইড'—তারপর তুই আমাকে ভালবাসিস।

কিন্তু মুস্কিলটা দাঁড়িয়েছে এই যে কোথা থেকে ঠিক আরম্ভ করা যায় ঠিক নিজেই বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না।

আসলে জানিস্ বাংলাদেশে শ্বশুর বাড়ির রূপ এতটুকু বদলায় নি। শুনি আগে নাকি আরও কড়াকড়ি ছিল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যেটুকু পালটেছে তাকে উল্লেখযোগ্য বলা চলে না।

যেমন কেরাণী সমস্যা ঠিক তেমনি বাংলার বধূ সমস্যা শুনে শুনে মানুষের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ফলে মানুষের ক্যালাস মনে স্পন্দন জাগান সহজ নয়। ভাষার কতটা গিটকিরি বা হৃদয়াবেগের কতটা আবেগ থাকলে লেখা মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পারে জানি নে।

জানিস্ তো আমি সহজ মানুষ সহজ সুরে কথা বলতে ভালবাসি। কিন্তু তার ফল ফলে উল্টো। খালি সমালোচনা আর সমালোচনা। যার ফলে সুন্দরের জন্ম অসম্ভব। সমালোচনার নামে পরনিন্দা পরচর্চা নামে মানুষের দুটি অতি মুখরোচক বিষয়বস্তু নিয়ে এ-বাড়ির সকলেই কম বেশী তাতিয়ে এবং মাতিয়ে রাখে।

ফলে কথা একরকম বলি না বললেই চলে। শুধু শুনে যাই। কোথায় যে এর আরম্ভ, আর কোথায় এর শেষ তা-ও অধিকাংশ সময় বুঝে উঠতে পারি নে।

এ-বাড়িতে অন্তরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নি। যেটুকু আছে তা হচ্ছে যন্ত্র যুগের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা।

অশোকের ভাইরা তো আমার সঙ্গে কথা বলে না। বোনরাও না বলার মধ্যেই। কথা জিগগেস্ করলে সংক্ষিপ্ত 'হুঁ', 'না',র মধ্যে তার পরিসমাপ্তি। আমিও মেজাজের তালিম দিতে দিতে দিন কাটাই। ভাবি, যদি মন পাওয়া যায়। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। না আছে রুচির মিল, না আছে ভাবের মিল, না সাংস্কৃতিক মিল। এক পরিবারের লোক অপর পরিবারে এলে নিজেকে গুছিয়ে বসতে কিছুটা সময় নেয়—যদি পরিবারের সকলের সহানুভূতি ও অভ্যর্থনা পাওয়া যায়। তুই হয়ত বলবি : কেন অশোক তো রয়েছে ? কেউ কথা না বলে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'—

তোর মন তো মনে মনে কত কথা বলে চলেছে—তবে তোর আবার এই রঙ্গবিলাস কেন? সে তুই দূর থেকে বুঝবি নে ইলীনা। আগে সংসার হোক তখন বুঝবি। স্বামীর ভাইবোন এরাও কত প্রিয় বস্তু। কিন্তু যেখানে কোন কালচারাল এ্যাফিনিটি নেই সেখানে হাত মিলোবি কি করে হৃদয় বিনিময় করবি কি করে? আপোষ করবি কি করে? সবাই এক একটি ক্ষুদে বিচ্ছু। রাগে মট্ মট্ করছে সব। অথচ কিসে ওদের এত রাগ তার কারণ-তত্ত্ব পাওয়া মুস্কিল।

এক হতে পারে যদি ভাবে: দাদা বিয়ে করে পর হয়ে গেছে। কিন্তু পর হবে কেন—তুই-ই বল? যৌবনের ধর্ম বজায় রাখতে গিয়ে ছেলেরা একটু গোমড়ামুখো হয়। সেটুকু ধরতে নেই। এ কথা তো মা-ও বুঝিয়ে বলতে পারেন। কারণ বধূজীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথ একদা তাঁকেও অতিক্রম করতে হয়েছে। তবে আমার শাশুড়ীর কথা স্বতন্ত্র, তাঁকে বিশেষ শ্বশুর ঘর করতে হয় নি।

এইসব ঝামেলা আর কি! তোর বোধ হয় ক্লান্ত লাগছে। ভাবছিস্ হয়ত জয়তীটা নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা নিয়ে অপরকে পীড়িত করবার বেশ ফাঁদ পেতেছে। কিন্তু তা নয় রে—তুই যে আমার কাছে আমার আত্মার চাইতেও বড়। তাই তো তুই আমার আত্মীয়। তোর কাছে কথা বলতে পারলেও মনটা কিছু হালকা লাগে। তাই তোকে মাঝে মাঝে বিরক্তি করি।

'সৃষ্টির মূলে আনন্দ—সৃষ্টির কেন্দ্রে আনন্দ। আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেই জীব সমূহের সৃষ্টি, আনন্দের মধ্যেই তাদের স্থিতি, পুনরায় আনন্দের মধ্যেই—তাদের লয় বা পরিণতি। শুধু ভারতীয় দর্শনের অনুভূতিতেই এ-সত্য সীমাবদ্ধ নয়, দেশান্তরের অনুভূতিতেও তার পরিব্যাপ্তি।' এখানে আনন্দ নেই-রে। এ-বাড়িতে আনন্দ নেই। আমার শাশুড়ীকে দেখে মনে হয়: মেয়েদের নিয়ে তিনি সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টায় আছেন। ছেলেদের অভাব অভিযোগের দিকে তাঁর নজর নেই। সকল সময় মেয়েদের সুখ সুবিধের দিকে দৃষ্টি। ছেলেরা খেলো কি না খেলো—বাড়িতে এলো কি না গেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। এ-এক অদ্ভুত ব্যাপার—নিজের চোখে না দেখলে তুই বিশ্বাস করতে পারবি নে।

আমার বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে গেলে বিধিনিষেধের অন্ত নেই। পারমিট বা ভিসার প্রয়োজন আছে। যদিও শ্বাশুড়ী মুখে বলবেন : যখন যেখানে খুশী যাও—কোনও বাধা নেই। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। তুমি রাত সাড়ে দশটায় স্বামীর সঙ্গে বেড়িয়ে বাড়ি ফের তুমি দেখতে পাবে : সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ এবং শ্বাশুড়ী ননদদের আষাঢ়ের মেঘের মত থম্‌থমে মুখভাব। তখন ভারী বিশ্রী লাগে। অথচ এধারে বাড়ির সাধারণ খাওয়া দাওয়া শেষ হয় রাত এগারোটায়।

একটা কথা আমি ভাবি : মায়েরা ছেলের বিয়ের পরেও ছেলের দাবী সহজে ছাড়তে চান না। কারণটা খুবই সুস্পষ্ট। শ্বাশুড়ীরা নিজেদের বধূ জীবনের কথা ভুলে যান। তারপর যে ছেলেকে এত কষ্ট করে মানুষ করলাম, তার সব ভার এসে গ্রহণ করবে অন্য একটি দূর সম্পর্কীয়া মেয়ে—এযেন কেমন ভাল লাগে না। সংসারের নিয়মই তো এই। কন্যা বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। অধীন কথাটা ভাল নয়। শ্রুতিকটু। তাছাড়া আধুনিক শ্বাশুড়ীরা হাল ফ্যাশনের ননদের পাল্লায় পড়ে পুত্রের অধীনতা স্বীকার করতে দস্তুরমত লজ্জাবোধ করেন। আমি শ্বাশুড়ী—ছেলের মা—আমার একটা পদমর্যাদা আছে। কনের মা যে পদমর্যাদায় খাটো সে বিষয়ে ছেলের মা সবসময় সচেতন। কারণ অতীতে সমাজবিধানটা ওই রকমই ছিল। বিয়ের পর দুটো পরিবারে মাখামাখি হয়, হৃদ্যতা হয়, একটা পরস্পর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে; কিন্তু যেখানে দুর্জয় পদমর্যাদা বোধ অভ্রভেদী প্রাচীর তোলে সেখানে সুস্থ সহজ সামাজিক সৌজন্যবোধ বাধা পায়। আসলে মানুষের প্রকৃতিটা সকলেরই প্রায় এক জাতের। যখন নিজের স্বার্থবোধে ঘা পড়ে বা নিজের ভাগে কম পড়ে তখনই মানুষ উগ্র ও হিংস্র হয়ে ওঠে।

যাক্, কি বলতে কি বলছি। বড় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। অথচ না বলেও তৃপ্তি নেই।

সেদিন আমার বালিগঞ্জের পিসি আমাকে দেখতে এসেছিলেন আমার এখানে। বাড়ি তখন খালি। শ্বাশুড়ী ও ননদরা সবাই সিনেমায় গেছে। পিসী শুধোলেন : জয়ন্তী তোর শ্বাশুড়ীর বয়স কতো? এখনও সিনেমায় যান। বললুম : এটা একটা ধর্মমূলক ছবি, পিসী। শ্বাশুড়ী সিনেমায় কম

যান; তবে ননদ আর দেবরদের সপ্তাহে দুটো ছবি দেখা চাই। সে রাত ছ'টা বা ন'টার শো যাই হোক—তাতে কোন বাধা নেই। সিনেমা দেখাটাই মুখ্য, সময়টা গৌণ।

তা বেশ।—বললেন পিসী। কিন্তু তোকে খালি বাড়িতে ফেলে সব চলে যান, তোকে ওদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করে না।

সত্য গোপন করেই বললুম: তা মাঝে মাঝে করেন বৈ কি। তবে আমিই যেতে চাই নে।

কথাটা বলেই মনটা খচ্ খচ্ করতে লাগলো। গত সপ্তাহে 'এলিটে' হেমিংওয়ের 'ফেয়ারওয়েল টু আরমস্' বিশ্বরূপাতে 'ক্ষুধা' এবং ষ্টারে 'শ্রীকান্ত' দেখেছেন সদলবলে এ পাড়ার ও-পাড়ার বন্ধু বান্ধব নিয়ে, কিন্তু নিতান্ত চক্ষু লজ্জার খাতিরেও আমাকে একবার বলা হয় নি। অবশ্য বললেও যেতুম না। তবু ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই রকম।

চিঠি আর বড় করব না। ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার ভয় আছে।

তবে সবচেয়ে ক্লাইম্যাকস্ ব্যাপার হচ্ছে: আমার ও অশোকের ব্যাপার নিয়ে শাশুড়ী এক ননদকে দিয়ে উপন্যাস লেখাতে সুরু করেছেন। সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আবার অশোকের চোখে পড়ে। সে তো কিছুটা দেখে শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সত্য ঘটনা বিবৃত করলেই সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় না। খুবই দুর্বল এবং কাঁচা হাতের লেখা। সত্য ঘটনা হোক তার মধ্যে কতটুকু নেবো আর কতটুকু আর্টের খাতিরে বাদ দেব তার টেকনিক্ জানতে এবং লিখতে সময় লাগে। বই হিসেবে বেরুলেও জনসাধারণের কাছে এ-বই জনপ্রিয় হবে না—সেকথা হলপ করে বলা চলে। সাদামাঠা কথার ভেতরেও কথা আছে। যেমন আর্টের খাতিরে আর্ট।

অশোক বলছিল: আমি তো আর লিখতে পারি না—তুমি বরং প্লট-টা ইলীনা মারফৎ অমিতাভের কাছে পাঠিয়ে দিও। অনুরোধ অমিতাভ যেন এই প্লট নিয়ে একটি বলিষ্ঠ উপন্যাসের খসড়া করে যা ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে জলন্ত ও শিক্ষামূলক উদাহরণ হয়ে থাকে। জাত শিল্পীর হাতে পড়লে শিল্প যে শ্রীমণ্ডিত হবে তাতে আর ভুল কি!

বিলেতে প্রসিদ্ধ লেখক জোনাথন সুইপট্ ক্রোধ ও ক্ষোভ মেটাতেন

সাহিত্যের মাধ্যমে। মনে কর একটি লোকের সঙ্গে তাঁর পাঁচ বছর আগে মন কষাকষি হয়েছে। সে লোকটি হয়ত সে ব্যাপার ভুলেই গেছেন। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে তার সম্বন্ধে সাহিত্যের মাধ্যমে একটা কিছু জোরালো ভাষায় লিখে ফেললেন। রেফারেনস্ চলে গেল দীর্ঘ পাঁচ বছর অতীতে। অশোকের ভাবটাও বোধ হয় অনেকটা সুইপট সাহেবের মত। ইচ্ছেটা শিল্পীকে দিয়ে শিল্পের মাধ্যমে সামাজিক গলদটাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। তুই যদি ভাল মনে করিস্, তবে অমিতাভকে লিখে দিতে পারিস। অবশ্য আমার কিন্তু এসব জিনিস ভাল লাগে না। যেখানে কালচার মানে পরনিন্দা ও পরচর্চা সেখানে সুন্দরের জন্মলাভ কি করে হবে, বল? আর সুইপটের দেশের লোক হিউমার বুঝতে পারতেন—কিন্তু আমাদের দেশের লোক ছাপার হরফে নিজের রচনা দেখতে পেয়ে সূক্ষ্ম রসবোধ দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিতে পারবেন না। একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং সাময়িক শত্রুতায় সে সম্পর্ককে কলুষিত না করে আর উপায় থাকে না। একেই বলে কালচারের অভাব।

অশোক বলে: মেয়েদের স্বাধীনতা ভাল; কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার ঠিক নয়। আমি নিজে নারী হয়েও একথা অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন করি। সংসারে শোভন অশোভন দুটো জিনিস আছে। আমি কোন কিছুই মানব না যেহেতু আমি স্বাধীন—তাকে স্বাধীন বলে না—একে বলে স্বাধীনতার নামে উশৃঙ্খলতা। প্রচণ্ড ক্রোধ, উশৃঙ্খল আচরণ আর নিন্দা চর্চা এ তিনের যেখানে সমাবেশ সেখানে 'আকাশের নীলিমা ও ঘাসের শ্যামলিমা' জাতীয় কালচার একস্‌পেক্ট করতে পার না। এস্‌থেটিক কালচার কোথায় সম্ভব? অশোকের মত: পিতা জীবিত থাকলে এমন একটা পারিবারিক ভাঙ্গন এবং ভগিনীদের আকাশস্পর্শী দাপট দানা বাঁধতে পারতো না।

যাক্ এসব খুবই ব্যক্তিগত এবং ঘরোয়া ব্যাপার। তোরও তো ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

সবশেষে আর একটা কথা বলেই আজ শেষ করব। সেই যে অশোক আর আমাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি লেখা হচ্ছে তাতে আমার রূপের যে চমৎকার বর্ণনা আছে তা পড়ে মনে হয় পুরীর মহাসমুদ্রে দিকদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যাই। শীতল জলে দেহ-মন-প্রাণ-জুড়িয়ে যাক্। বর্ণনার এ—কালিমা

সুনীল জলধি ব্যতীত আর কেউ মুছে দিতে পারবে না। উপমা কালিদাসস্থ না হলেও জয়তীস্থ, সে-কথা ভুলে যাস নি।

এদের চরিত্রে আর একটি প্রধান দোষ : নারী-পুরুষে কথা বললেই ভাবে প্রেম। ঘনিষ্ঠ হলে ভাবে বিবাহের পূর্বাভাস। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গীটা খুব প্রশস্ত নয় বলা চলে।

সম্ভব হলে ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলিস্। গাইডে ওঁর নাম পাবি।

চিঠি-পাঠ সমাপ্ত করে ইলীনা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

হায়, জয়তী বিয়ের পরেও খুঁটিনাটি সুখ দুঃখের আবর্তে পড়ে জীবনটাকে একটা সুষ্ঠু পরিণতির দিকে চালিয়ে নিতে পারেনি, এইটেই দুঃখের। মানুষ শান্তি কামনা করে, সুখ প্রার্থনা করে, নির্বিরোধী হতে চেষ্টা করে কিন্তু কি করে তা সম্ভব—জানি না। 'আশা' মরীচিকার মত মানুষকে হাতছানি দেয়—বলে : চলো, চলো আরও এগিয়ে চলো।

আট

জামসেদপুর থেকে আবার পিতৃভূমি পাঁচদোনায় ফিরে এলো অমিতাভ।

কিসের আশায় জামসেদপুর গিয়েছিল অমিতাভ? মনে মনে বিশ্লেষণ করে সে। শুধু ইলীনার জন্যই! জীবনে ইলীনাকে পাওয়াই কি সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া! না তার পরেও আছে জীবন! পুরুষের জীবনে নারীকে হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু সকল পাওয়ার শেষ পরিণতি কি, পরিসমাপ্তি কি? সবশেষে ইলীনা-জয়ন্তী এদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, মন কষাকষি করতে হলো। এসব জিনিস সভ্য সমাজের পরিপন্থী। বিশেষ করে নারীর সম্মুখে ক্রোধ সংবরণ করাই কালচারের লক্ষণ। সেদিন অমিতাভেরও কেমন জিদ চেপে গেল উত্তর প্রত্যুত্তরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো—যার জন্য পরে তাকে মনে মনে অনুতপ্ত হতে হয়েছে। মানুষ যেখানে লাভ লোকসানের হিসাব কষে সেখানেই জ্বালাটা বেশী অনুভব করে, কিন্তু মানুষ যেখানে লাভ লোকসানের উর্ধ্বে সেখানে কোন ক্ষোভ বা উত্তাপ নেই। কি যেন মনে হয়: সমস্ত জীবনটাই কি চোরাবালির ওপর তৈরী? না এর পরেও কিছু আছে?

'কোমলতায় ও সৌন্দর্যে অনুপমা' বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এই নারী। বারে বারে পুরুষকে দুর্বার হাতছানি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। প্রচণ্ড নেশা লাগায় পুরুষের জীবনে। আদম আর ইভ্। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে। নিস্তরঙ্গ জীবনে এলো আলোড়ন, সংঘাত, সমস্যা ও দ্বন্দ্ব। ফল ভক্ষণ না করে যদি আদম ও ইভ্ নিরবচ্ছিন্ন নিষ্পাপ জীবন অতিবাহিত করে চলতো, তবে তাই কি ভাল ছিল—না ফল ভক্ষণের পর দ্বন্দ্বমধুর তরঙ্গায়িত জীবনে যে কুটিল বাঁকাস্রোত দেখা দিল—তাই বেশী সুখের হলো।

এ-পৃথিবীতে স্থায়ী কি? কি থাকবে শেষ অবধি? মহাকালের রথচক্রে সবই তো ধ্বংস হবে। তবে? সব স্ফুলিঙ্গেরই স্থায়ীত্বের একটা সীমারেখা আছে। য়্যামিবা থেকে যে মানুষের জন্ম—অবিস্মরনীয় হবার দুঃসাহস তার বড় সোজা নয়।

আমি মানুষ।

আমি ক্ষণিকের জিনিসকে চিরন্তনের কোঠায় ধরে রাখবার কৌশল আবিষ্কার করেছি।

তুমি মানুষ। তোমার অহংকারের শেষ নেই জানি। কিন্তু মাটির দেহ তোমার মাটিতে মিশে যাবে। যে সাময়িক সামাজিক সম্মানে তোমার দম্ভের শেষ নেই। কিন্তু সে দম্ভ করবার আদও তোমার অধিকার আছে কিনা সেটা ভাববার কথা। তুমি কে গো? তোমার শক্তি কতটুকু? তোমার অন্তরালে যে প্রকৃতিদেবীর শাসন চলেছে, তাঁর একটি সামান্য ভ্রূকুটিতে তুমি কোথায় ভেসে যাও—তার হুস্ কি তোমার আছে?

'ঘটনাকে আর্টের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য কল্পনাকে তার উপর সম্ভাবনার আস্তরণ বিস্তার করতে হয়।'

নিকুচি কর ঘটনা, নিকুচি কর আর্ট। যে মানুষের সমাজে ভাল খাওয়া শোয়া ও থাকার ব্যবস্থা নেই—সেখানে আবার সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে অমিতাভ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কি করা যায়—কি করা যায়? মানুষের মনের মধ্যে আনন্দের রাজধানী তৈরী করতে হবে। নতুবা মানুষের শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই। কিন্তু মনের মধ্যে আনন্দের রাজধানী করবার যে শিক্ষা তাতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কি স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকের মন্ত্রে দীক্ষা নেবে অমিতাভ? না তা-ও তো নয়।

এমন সময় একটি ছোট্ট লেডিজ ছাতা মাথায় দিয়ে প্রান্তিকা এসে হাজির হয়।

বেলা দুপুর বারোটা। আকাশে প্রখর সূর্যতাপ।

অমিতাভ চিন্তামগ্ন ও বিষণ্ণ।

প্রান্তিকার উপস্থিতি অমিতাভের নজরে আসে না।

প্রান্তিকা প্রশ্ন করে: কি এত চিন্তা করছেন? খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে।

ঈষৎ হেসে অমিতাভ জবাব দেয়: আমি তো একটার আগে খাই নে। তবে আপনি এই দুপুর রোদে এত কষ্ট করে এলেন কেন?

আসি প্রাণের দায়ে। একলা পুরুষ মানুষ কি খান, কি করেন—এসব জিনিস মাঝে মাঝে তদারক করা ভাল। নইলে তো কোলকাতায় গিয়ে দোষারোপ করবেন—বলবেন: গ্রামের মেয়েরা অতিথি সেবা করতে জানে না।

না, না—আপনি মিছেমিছি বিব্রত হবেন না। আপনি বিব্রত হলে আমার কুণ্ঠার শেষ নেই।

আমি হেঁসেল দেখি গে। কি কি রান্না হয়েছে আমি নিজেই তদারক করব।

কি পাগলামি করছেন? লোকে শুনলে বলবে কি? শরৎ সাহিত্যের নায়িকার মত হেঁসেল আঁকড়ে থাকলে পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বলবে।

শরৎ সাহিত্যের নায়িকারা হেঁসেল আঁকড়ে বসে থাকতো এ খবর আপনি পেলেন কোথায়? আমার তো জানা নেই।

হেঁসেল আঁকড়ে বসে না থাকুক নায়িকাদের নায়ককে খাওয়াবার একটা দুর্জয় লোভ তাঁর অনেক বইতে দেখতে পাই।

মেয়েদের যে খাইয়ে একটা অপরিসীম তৃপ্তি হয় সেকথা পুরুষ মানুষ বুঝতে পারবে না।

তাহলে বলুন শরৎবাবু আপনাদের মনের কথা আবিষ্কার করেছেন, যা আপনারা নারী হয়ে এতদিন উপলব্ধি করতে পারেন নি।

শুধু একথা কেন, মানুষের অবচেতন মনের অনেক সুপ্ত কথাই তিনি দেশের সম্মুখে সাহিত্যের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন।

তা মিথ্যে নয়। সেদিন একটা বইতে দেখলুম একজন বিখ্যাত সমালোচক বলেছেন: শুধু ভারতীয় সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যেও শরৎচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

আমারও তো তাই মনে হয়। অবশ্য হাল আমলের এক শ্রেণীর তথা-কথিত উন্নাসিক শরৎচন্দ্রকে নস্যাৎ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। শরৎ সাহিত্যের চাহিদা এখনও অপ্রতিহত।

যদি কিছু সত্য এর ভেতর থেকে থাকে তবে তা এমনি বাঁচবে। টবের চারা গাছ করে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজন দেখি নে।

হাল আমলে যে সাহিত্য সৃষ্ট হচ্ছে তাকে বড়জোর কাগজের ফুল বলা চলে ; সত্যিকারের ফুল বলা চলে না।

কেন জীবনের মূল্যবোধ রূপায়ণে হালের সাহিত্যিকের খুবই সজাগ দৃষ্টি।

বলুন—রিয়ালিষ্টিক আর্টের অজুহাতে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। এর চাইতে ওঁরা খুব বেশী এগুতে পারেন নি।

মানুষের জীবনবোধ রূপায়ণে যে গভীর ও ব্যাপক সামগ্রিক দৃষ্টি ও অনুভূতির প্রয়োজন তা' থেকে এঁদের অধিকাংশই বঞ্চিত। এঁরা কলম ধরেন প্রয়োজনের খাতিরে কলমের খাতিরে নয়। জীবন ও মানুষ হয়ে পড়ে ম্রিয়মান, প্রাণহীন।

আপনি দেখছি এ-বিষয়ে যথেষ্ট ভেবেছেন।

ভাবতে আর পারলুম কোথায়? কিন্তু আর নয়, এবার আমি হেঁসেল দেখি গে।

শুধু হেঁসেল দেখলে চলবে না। তাহলে আমার সঙ্গে দুটি ডালভাতও খেতে হবে।

তথাস্তু। কিন্তু এবারে আমাকে যেতে দিন।

যেতে দেব বৈ কি। কিন্তু আপনার ওই কথাটার তো উত্তর দিলেন না।

কি কথা আবার? বলুন দেখি?

ওই যে বলছিলেন মেয়েদের খাইয়ে তৃপ্তি—সেই সম্বন্ধেই। মেয়েদের কি সকল মানুষকে খাইয়েই তৃপ্তি—না বিশেষ বিশেষ মানুষকে খাইয়ে তৃপ্তি।

মুস্কিলে ফেললেন দেখছি। জানেন ছেলেদের সব কথা শুনতে নেই।

এ-যেন একটি ছোট্ট শিশুকে আপনি ফাঁকি দিচ্ছেন। কথা এড়িয়ে যাবার একটা অজুহাত।

আপনি কি একটি ছোট্ট শিশুর চাইতে বেশী বুদ্ধি রাখেন?

এতবড় অভিযোগের কারণটা কি একবার শুনতে পাই?

আর সকলকে ফাঁকি দিতে পারলেও নারীর চোখকে ফাকি দেওয়া বড় সহজ নয়, জেনে রাখুন।

কোথাও একটা গুরুতর অঘটন ঘটেছে দেখছি।

বোধ হয়। আর সেই অঘটনের ফাঁক দিয়েই আপাতদৃষ্টিতে জোয়ার

মানুষটির দুর্বলতাটুকু ধরা পড়েছে। এখন আর কথা নয়। এবারে আক্কি চললুম।

আহার পর্ব সমাধা হবার পর অমিতাভ ও প্রান্তিকার মধ্যে নানান বিষয়ে আলোচনা চলতে লাগলো। প্রান্তিকার সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনায় একটি বলিষ্ঠ ও সরল মনের পরিচয় পেয়ে অমিতাভ বিশেষ তৃপ্তি পায়। প্রান্তিকা শিক্ষিতা নারী। অথচ কি সুন্দর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে যেন এক অপরূপ নিরহংকার মানবী প্রেম ও সৌন্দর্যের জয়গানে সমগ্র পরিবেশকে এক অপূর্ব শ্রী'র স্পর্শে সঞ্জীবিত করেছে। বিশেষ সময়ের বিশেষ মুহূর্তে প্রান্তিকাকে অমিতাভের ভাল লাগলো।

কথা চলেছিল দেশের বেকার সমস্যা এবং শহর ও গ্রামে বাস করা নিয়ে।

প্রান্তিকাই বলছিল : সবাই যদি শহরে বাস করতে চায় তাহলে গ্রামের অবস্থা কি হবে বলুন ?

কিন্তু গ্রামগুলো যতদিন পর্যন্ত আধুনিক যন্ত্রযুগের সুখ সুবিধে না দিতে পারবে, ততদিন শিক্ষিত লোকের পক্ষে গ্রামে বাস করা কষ্টকর ব্যাপার।

এ-কিন্তু আপনার স্বার্থপরের মত কথা হলো। যতদিন পর্যন্ত না দেশের সকলে উন্নত হবে, ততদিন শিক্ষিত লোকদের কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে একটু ত্যাগ স্বীকার করে দেশের লোকদের শিক্ষিত করে নিন—যন্ত্রযুগের স্বাচ্ছন্দ্য আপনি আসবে।

সত্যি কথা বলতে গেলে এ-একদিনে সম্ভব নয়। অন্ততঃ আমাদের জীবদ্দশায় ত দেখতে পাব না। তারপর কৃষি আঁকড়ে পাড়াগায় পড়ে থেকে সার্থকতা কি জানি নে। জমির ওপর আসবে ডিমিনিসিং রিটার্ণ। উন্নততর ব্যবস্থাও শীগ্‌গীরই যে সম্ভব হবে তা-ও তো নয়।

তাহলে কি দেশ ফুল-ফ্লেজেড্ শিল্প প্রধান হোক্ এই চান।

এ-তো বহুদিনের পুরাণো প্রশ্ন। দেশ কৃষি প্রধান হবে—কি শিল্প প্রধান হবে? মানুষের সুষ্ঠু আয়ের পথ চাই। তার আনন্দের উপকরণ চাই। বহুবিধ ফ্যাক্টরস্ অপেক্ষমান। অর্থনীতির গভীর তত্ত্বে আমি ডুব দিতে চাই নে। সাদামাঠা কথায় সুন্দর আয়ের পথ আর সুন্দর জীবন চাই।

কি দিয়ে কি হবে জানতে চান না?

তা জেনে আমার লাভ। আমার চাই এটুকুই যথেষ্ট। মানুষের যদি সুন্দর আয়ের পথ থাকে তাহলে মানুষ তার জীবনের সীমাহীন সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য উপলব্ধি করে যথার্থ মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারে এবং সেটাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা চাই ; কিন্তু তা' কি সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব!

কেন সম্ভব নয় বলুন?

কারণ সে-আবহাওয়া আমরা এখনও প্রস্তুত করে উঠতে পারি নি।

তাহলে এখন আমাদের করণীয় কি?

নিজেদের যথাসাধ্য দেশ গড়বার কাজে উপযুক্ত করে তোলা আর সেই সঙ্গে যদি রাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়া যায়, তবে তো সোনায় সোহাগা।

সত্যি সত্যি কল্যাণকর রাষ্ট্রের সুখস্বপ্ন দেখছেন দেখছি।

তা আর মিথ্যে কি। আমাদের সকলকেই পরিশ্রমী হতে হবে। কাজ করতে হবে। তবে তো ভাল ফল পাব।

কিন্তু কাজের চাইতে আমাদের সকলেরই কথাটা বেশী হয়ে যাচ্ছে না— বিশেষ করে নেতাদের?

তা বারোয়ারী কাজে কথা একটু বেশী হবে বৈ কি!

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট না হলেই বাঁচি। অপেক্ষা করতে আমি রাজী আছি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলেই হয়।

আমাদের স্বভাবের একটি প্রচণ্ড দোষ কি জানেন—আমরা নিজেরা গড়তে জানি আর না জানি গড়া জিনিসকে আমরা ভাঙতে জানি, দলন করতে পারি, চটকাতে পারি, অনাবশ্যক সমালোচনা করতে পারি। এই মহৎ দোষগুলো বর্জন করতে না পারলে জাতি হিসেবে আমাদের খুব উঁচুদরের মানুষ বলে প্রতিপন্ন করা চলবে না।

যে দেশে একদিন রামায়ণ মহাভারত রচিত হয়েছিল সে দেশের সংস্কৃতি কি করে ধ্বংস পেলো আমি অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। সমস্ত দিন অশেষ পরিশ্রম করে খাওয়ালেন দাওয়ালেন—গল্পগাছা করে আনন্দ দিলেন—আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রান্তিকা মনে মনে বললে : ধন্যবাদ। কিন্তু মুখে বললে অন্যরকম : ধন্যবাদটুকু না দিলে বুঝি চলতো না?

না, না যাঁর যেটুকু প্রাপ্য তাঁকে অবশ্য তা দেওয়া উচিত। আর আপনি আমার জন্য এত কষ্ট করলেন, আমি কিছু বলব না।

এমন সময় টেলীগ্রাম পিওন একটি টেলী নিয়ে এলো।

প্রান্তিকাও উৎসুক দৃষ্টিতে অমিতাভের দিকে তাকিয়ে থাকে। টেলীগ্রাম দেখলেই মনে হয় যেন কোন অশুভ খবর। প্রান্তিকাই বললে : কি খবর? কোন কিছু অশুভ কি?

অমিতাভ বলে : না তেমন কিছু অশুভ নয়। আমাকে আগামীকালই কোলকাতা যেতে হবে। আমার এক বন্ধুর পিতা খুবই অসুস্থ।

তা' বন্ধুর পিতা অসুস্থ তো আপনাকে কোলকাতা যেতে হবে কেন?

খুবই অন্তরঙ্গতা কিনা—সে জন্যই যেতে হবে।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছে অমিতাভ আর প্রান্তিকা। ঈষাণ কোণে কালো মেঘ বাতাসের বেগে অজানার উদ্দেশ্যে ধেয়ে চলেছে। তাপহীন, রৌদ্রহীন, মেঘলা আকাশের নীচ দিয়ে দুটি প্রাণী নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। মনে মনে কথা কওয়া বুঝি সবচেয়ে ভাল। তুমি তলিয়ে যাও গভীর হতে গভীরে—তোমাকে কেউ প্রশ্ন করবে না—কৈফিয়ৎ চাইবে না। তুমি আপন মনে কথা কও।

প্রান্তিকা বললে : আপনি আবার চলে যাচ্ছেন? এই তো সেদিন জামসেদপুর থেকে এলেন। আপনি যেন একটি কমেট। পুরুষ মানুষের কি মজা!

অমিতাভ হেসে জবাব দেয় : নারী পুরুষের তুল্য অধিকার আমাদের সংবিধানের গোড়ার কথা। তবু মিছেমিছি আপনারা মন খারাপ করেন কেন, জানি না!

আপনারা শুধু সংবিধানের কথাটুকুই দেখলেন। নারীর হৃদয়ের গোপন কথাটি শুনলেন না। জানেন তো চোখ থাকলেই চোখে দেখা যায় না। মন দিলেই মন পাওয়া যায় না।

ঠিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি নে।

ইচ্ছে করে বুঝতে না চাইলে অনেক জিনিস বোঝা যায় না।

কি রকম?

খুবই সহজ কথা। কাগজে কলমে নারী-পুরুষকে সংবিধানে সমান করলেই কি সমান হওয়া যায়। নারীর স্বপক্ষে প্রকৃতির কত বিধিনিষেধ।

তা অস্বীকার করিনে।

যাক্ গে, কি কথা বলতে গিয়ে কি কথা বলছি। যতসব বাজে কথা।

সংসারে অধিকাংশ কথাই তো বাজে। কাজের কথা কতটুকু?

সে আর মিথ্যে কি! তবু এই বাজে কথার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের জীবনের এমন অনেক বড় বড় প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়—যে সব জিনিসের সমাধান সমস্ত জীবনের গভীর গবেষণায়ও নিষ্পত্তি হয় না।

তা হয়ত অসত্য নয় প্রান্তিকা দেবী। তাই সেদিন কাগজে দেখলুম একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলেছেন: বাংলার মাটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিচিত্র সব প্রতিভার যে বিস্ময়কর স্ফূরণ লক্ষ্য করা গেছে তার কার্য কারণ পরম্পরা ম্যানেহাইম পদ্ধতি, মার্কস বাদ বা অন্য কোন পূর্বতন তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যাত হওয়া অসম্ভব তার জন্য প্রয়োজন নিত্য নতুন যে সব তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হচ্ছে তারই আলোকে নতুন কোন তত্ত্বের উদ্ভাবন।

আপনি দেখছি আরও গভীরে চলে গেছেন। আমি এতটা গভীরে প্রবেশ করিনি। ব্যক্তি জীবনের ঊর্ধে যে মানব জীবন আপনি বোধকরি তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

আসলে কোন কিছু নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি নে। কথার পৃষ্ঠে সময়োচিত কথা বলে যাওয়াই আমার কাজ।

কথা সাহিত্যিকদের কথা ছাড়া আর কি কাজ থাকবে, বলুন?

মস্ত বড় এ্যালিগেশনস্ দিলেন।

আপনারা হৃদয়কে উপেক্ষা করে কথার গুরুত্ব দেন বেশী। আসল জীবনের চাইতে টেকনিক্ আপনাদের কাছে প্রিয়। ফলে বাস্তব উপেক্ষিত এবং কল্পনা অভিনন্দিত হয়।

সাহিত্যিকের জীবনে উপলব্ধি হচ্ছে সাহিত্যিকের মর্ম কথা।

আমার বাবা বলতেন: কথা সাহিত্যের মত অবাস্তব ও অপ্রাকৃত জিনিস আমি কখনও পড়ি না। হরিহরপুর গ্রামে হরিহরবাবু এক মস্ত

বড় ধনী জমিদার ছিলেন। হরিহরপুরও কোনদিন ছিল না আর হরিহরবাবুও ছিলেন না। সবই কল্পিত। সুতরাং এর চাইতে ইতিহাস পাঠ শ্রেয়ঃ।

ইতিহাস ইতিহাস। উপন্যাস উপন্যাস। প্রবন্ধ প্রবন্ধ। একের ভেতরে অপরকে খুঁজতে গেলেই অনর্থ ঘটে। যেমন একের ইচ্ছে অপরের ওপর চাপাতে গেলে বিপদ।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বকুলবনের পাশ দিয়ে চলেছে। সারি সারি বকুল গাছ কাব্যিক ঢঙে মাথা উঁচু করে নিশ্চুপ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা যায় কোন রুচি সম্পন্ন ধনীব্যক্তি বিশেষ যত্নের সঙ্গে এই মনোরম পরিবেশটিকে একদা লালন করেছিলেন, যার ফলে বৃহৎ বনস্পতি আজও সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের বাঁকা চাঁদ গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে পথিককে বিভ্রান্ত করে, উদাস করে, নিতান্ত নীরস মানুষকেও ক্ষণিকের জন্য উন্মনা করে তোলে।

প্রান্তিকার এসব পথ জানা পথ। অমিতাভও জানে। দুজনেই কথার মোহে একথা সেকথা বলতে বলতে কখন এপথে এসে পড়েছিল খেয়াল ছিল না।

দুজনেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কেউ কোন কথা বলে না। গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের ঘন নীল যবনিকা হাতছানি দিয়ে ডাকে। কথা নেই, কথা গেছে হারিয়ে। দূরের স্বপ্নমাখা আবেশ মনের কথা বলে মনে মনে। হয়ত শিশির ঝরা সন্ধ্যায় বকুল গাছের আচমকা শিহরণ ওদের মাথায় ঝরা বকুলের উৎসব রচনা করেছিল। ওরা বোধহয় মনে মনে ভেবেছিল প্রকৃতির অভিনন্দন। কিন্তু কেউ কোন কথা বলেনি।

প্রান্তিকা ভাবছিল: আসন্ন রোমঞ্চকর দিনের সূচনা।

আর অমিতাভ ভাবছিল: অতীতের সুরভিত দিনের কোন একটি বিশেষ স্মরণীয় দিনের একটি দিন।

এমনি মানুষের জীবন। অনেক কথা মনে মনে বলা হয়। তাকে প্রকাশ করা চলে না। দুজনেই মনে মনে বলে।

কথা কোন পক্ষই বলে না।

এ-ও না। ও-ও না।

তবে ওই সুন্দর পরিবেশে প্রান্তিকার একটি হাতের ওপর অমিতাভের হাতের মৃদু চাপ পড়েছিল।

প্রান্তিকা বলেছিল : মনে থাকবে এই দিনটিকে।

অমিতাভ বলেছিল : সুন্দর দিনের কথা কার না মনে থাকে। দিনটিকে আমি শিল্পের রঙে ধরে রাখবার চেষ্টা করবো।

প্রান্তিকা বললে : আমি তাই নিয়ে খুশী থাকবো।

নয়

অমিতাভ আর অমিত ইলীনাদের কোলকাতার বাসায় বসে কথা বলছিল।

আজ দুদিন হয় সে অমিতের টেলী পেয়ে কোলকাতায় এসেছে।

সোমনাথবাবু কিছুটা সুস্থ। বর্তমানে ইলীনার কড়া শাসনে আছে। একটি ঘরকে 'এয়ার কণ্ডিশানড্' করা হয়েছে। আজকাল হাল আমলের ছোট প্ল্যাণ্ট অনেক বাড়িতেই দেখতে পাওয়া যায়! তাছাড়া এ্যাটম্ এক্সপেরিমেণ্টের জন্য ঋতুর যে তারতম্য তা-ও উপেক্ষা করবার নয়। এ-বছরে কোলকাতার তাপমাত্রা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে সময় সময় অসহনীয় মনে হয়। এক হয় পাহাড়ে গিয়ে থাকলে চলে। কিন্তু পাহাড় আবার সোমনাথবাবুর সহ্য হয় না। সুখ সুবিধার সবকিছু উপকরণ বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের করায়াত্ত হয়েছে এবং সেসব জিনিস সোমনাথবাবুর বাড়িতে আছে। একটি সুরুচি সম্পন্ন পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোকের যা কাম্য তা তাদের আছে। যেমন : একটি সুন্দর বাড়ি, একটি গাড়ী, একটি ফোন, একটি রেডিওগ্রাম আর সিলেকটেড্ পারিবারিক বন্ধুবান্ধব ও গৃহ লাইব্রেরী। এবং সকলের ওপর একটি সুন্দর আয়ের পথ। সোমনাথবাবুর পেনসন ও ব্যাংকে জমা টাকার সুদ। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার সংসার।

অমিত অমিতাভকে উদ্দেশ করে বলে : তাহলে বিয়েতে তোর বাধাটা কোথায়?

বাধা ঠিক নয়।

তবে?

পৃথিবীটাকে বুঝবার জন্য আর একটু সময় চাইছিলাম। গতানুগতিক প্রথায় সংসার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর দশটা লোকের মত হাঁপিয়ে উঠে হায় হায় করব। এটা ভাল কথা নয়। যে ভুল অতীতে আমার বয়োজেষ্ঠ্যরা করে গেছেন সে ভুলে যদি আমরাও ডুবে মরি তবে আমাদের আধুনিক শিক্ষার মূল্য আর থাকে না।

ইলীনাকে তুই ভালবাসিস্ ?

হাঁ, তা বাসি বৈ কি ?

ইলীনার মত মেয়ের জন্য সমাজে সুটারসও তো কম নয়—সে কথা তুই জানিস্ ?

তা জানি।

তবে এ ধরণের একস্‌পেরিমেণ্ট করতে গিয়ে যদি ওর মন শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসে তখন।

তাহলে অবশ্যি ভাবনার কথা। মনের ওপর তো কারও হাত নেই।

এ-কথা জেনেও মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছিস্ কেন ? না ভেবেছিস্ তোর মত হীরের টুকরো পাত্র পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

না, তা ভাববো কেন ? তবে মেয়েদের প্রেমের ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে ধরণের নইলে এত সব হীরের টুকরো ছেলে থাকতে আমার প্রতিই বা ওর আকর্ষণ জন্মাবে কেন ?

আকর্ষণ যে শুধু তোর প্রতিই না অন্য কারও প'র আছে সেকথা কি তুই নিশ্চয় জানিস্। যদি বলি অনেককেই তার ভাল লাগে এবং তাদের মধ্যে তুই-ও একজন।

কেন, তোকেও ভাল লাগে বলে আভাস দিয়েছে না কি ?

সেকথা বলে একটা বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটাই—তুই কি আমাকে এতই নির্বোধ ভেবেছিস্ ?

না, বন্ধু হিসেবে জিগগেস করছি।

মূর্খ—প্রেমের ব্যাপার কেউ কাকেও বলে না—বলতে নেই ; এটা হচ্ছে গোপন অন্তরের একটা পরিচ্ছেদ। এখানে কিছু রাখা ঢাকা চাই। তুই তোর কল্পনাতে অনেক কিছু ভেবে নিতে পারিস্, আমি আপত্তি করব না। হয়ত তোর কল্পনা হোঁচট খাবে, হয়ত ভুল এসটিমেশন্ করবি—তা হোক্। অন্তরের ব্যাপার নিয়ে লোকের কাছে কৃপা ভিক্ষা করায় কোন কৃতিত্ব নেই।

তবে তুই আমাকে ঘাটাচ্ছিস কেন ?

কারণটা খুবই সুস্পষ্ট। ইলীনাকে আমি ভালবাসি এবং জানি সে তোকে ভালবাসে। কাজেই মেয়েটা যাতে ভালবাসার মানুষকে পেয়ে মন প্রাণ সার্থক করে তুলতে পারে—সেটাই কামনা করি।

বলছিল্ ইলীনা তোকে ভালবাসে এবং এ ও জানিস্ সে আমাকে ভালবাসে। ব্যাপারটা কি রকম একটু গোলমেলে হয়ে দাঁড়ালো না?

গোলমালের আবার কি হলোরে বাপু? স্বামী হিসেবে তোকেই সে চায় আমাকে নয়। আমার ভালবাসা নিন্দা স্তুতি এবং লাভ লোকসানের ঊর্ধে।

একেবারে সিড্‌নি কারটন।

ঠাট্টা করিস আর যাই করিস ভুল বুঝিস্ নে।

প্রেমের ব্যাপারে মানুষের কত ভুল বুঝাবুঝি হয়। নাটক নভেলে কত দেখলুম। আর নিজেও তো মানব চরিত্র নিযে ঘাঁটাঘাঁটি করছি।

মানবচরিত্রের কতটুকু দেখেছিস বা বুঝেছিস্—তুই—ই জানিস্—তা-ও যদি বুঝতুম কোর্টে আমার মত তোর যাতায়ত থাকতো—তাহলে নয় বুঝতুম—বহু চরিত্রের সংস্পর্শে এসে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চযের সুযোগ ঘটেছে।

কোর্টে ঘোরাফেরা করলেই কি আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়? তোর ধারনাগুলো কিছুটা নতুন ধরনের। চোখ থাকলেই কি চোখে দেখা যায়?

বুঝতে পেরেছি মস্ত বড পণ্ডিত হয়েছিস। বিধানসভার মত এঁড়ে তর্ক জুড়ে বসেছিস। বিজি ওভার নাথিং। কিন্তু তোর সঙ্গে ঝগড়া করবার আমার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই। সরল মনে তোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়াই করতে চেয়েছিলাম।

বোঝাপড়া করতে আমিও অনিচ্ছুক নই। ইলীনাকে আমারও কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য ছিল। যাক্ সে কথা আমি যথাসময়ে তাকে জিগগেস করে নেবো।

বেশ তো নিস্ না। তাতে আর রাগের কি আছে?

আর যাই করিস্ বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটাস্ নি। আমাকে তোদের পারিবারিক বন্ধু বলেই—মেনে নিস্।

তথাস্তু। আমার কোন আপত্তি নেই।

এমন সময় ওদের মাঝখানে ইলীনা এসে উপস্থিত হয়। বলে: এ কি দুই বন্ধুতে মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন? ঝগড়া হলো না কি?

অমিত বলে: কি করে বুঝলে?

ইলীনা বলে: মেয়েরা বুঝতে পারে। জেলাসি নয় তো?

অমিত বলে: যদি বলি তাই।

তাহলে বলব আমার নারী জীবন সার্থক। যে নারী পুরুষের হৃদয়ে তুফান তুলতে পারে না—তার নারী জন্ম বৃথা। জেলাসি—সে তো আরও চমৎকার ব্যাপার। রোমান্সের গন্ধ আছে তাতে।

তুমি বলছ কি ইলীনা? তোমার মনোভাব দেখছি ভারতীয় চিন্তাধারার পরিপন্থী। তোমাকে একনিষ্ঠ হতে হবে।

একনিষ্ঠ হবার প্রশ্ন। সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন—এসব জিনিস আসে বিয়ের পরে। বিয়ের আগে একটু দীর্ঘ ল্যাটিচুড্ দিতে হবে। তখন রোমান্সের বন্যায় একটু হাবুডুবু খেতে না দিলে তরুণ-তরুণীর মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হবে। মনে রেখো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছ তোমরা।

রোমানস্ মানে কি বোঝ?

রোমানস্ কথার মানে করা চলে না। ওটা বুঝে নিতে হয়। কলেজী আমলে এনসাইক্লোপেডিয়া অফ্ ব্রিটেনিকার ভাষ্য দিয়ে রোমানস্ কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেছি এবং তাতে রোমানস্ কথার আনন্দের অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। তাই এখন আর মানের কথা ভাবি নে। ওটা যেন আমাদেরই কথা। উপলব্ধি করতে হয়।

যাহোক্ একটি ভাল কথা শোনালে। তুমি ধন্যবাদের পাত্রী।

এই বলে অমিত অমিতাভকে জিগগেস করে: তোর কি মত অমিতাভ? চুপ করে রইলি যে?

অমিতাভ বিনয়ের অবতার হয়ে বলে: আমি তোদের কথা রেলিস্ করে শুনছি। ভেরি ইন্টারেষ্টিং। ইলীনা ঠিকই বলেছে। সকলের আগে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করবার প্রয়োজন আছে। ছেলে মেয়ে উভয়েরই।

ইলীনা অমিতকে লক্ষ্য করে বলে: ব্যাপার তো বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না। বাছাধন যেন কোথায় ডুবেডুবে জল খাচ্ছেন।

না, না—তুমি অমিতাভকে ভুল বুঝ না ইলীনা। ও একান্ত ভাবে তোমারই জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

রাইট ও।—বললে অমিতাভ।

নটি বয়। সমাজ সংস্কারের ফাঁকে ফাঁকে প্রেম করে বেড়াও। রয়টার আমাকে খবর জোগান দেয়।—কতকটা আন্দাজেই ঢিল ছুঁড়লে ইলীনা।

পাঁচদোনা গ্রামে রয়টারের প্রতিনিধি আছে বলে তো জানি নে।

তুমি বুঝি তোমার গ্রামের সব লোককে জান, চেনো?

তা কতকটা চিনি বৈ কি। বিশেষ করে গ্রামের ইনটেলেক্‌চুয়ালসদের তো চিনি-ই।

থিংস্ আর নট হোয়াট দে সীম্। গ্রামে যাদের মূর্খ ভাব তাদের মধ্যে আমার ইনটেলেকচুয়াল প্রতিনিধি আছে।

তোমার প্রতিনিধিরা সেখানে কি করেন? বললে অমিতাভ।

যাঁদের ওপর নজর রাখা প্রয়োজন, তাঁদের ওপর নজর রাখেন। যথাসময়ে, স্বস্থানে রিপোর্ট পাঠায়।

কথা শুনে অমিতাভ চেয়ারে একটু ঘুরে ফিরে বসে। বলে: তাই তো?

এই 'তাই তো তাইতো ভাব' যখন, তখন কিন্তুর একটা ক্লু আছে নিশ্চয়ই।

অমিত বলে: এবারে আমার ওঠা প্রয়োজন ইলীনা। আমি বরং পাশের ঘরে যাই।

কেন? কেন?

মনে হচ্ছে তোমরা ব্যক্তিগত মান অভিমানের দ্বন্দ্বের ভেতর এসে পড়েছ। এখানে তৃতীয় পক্ষের অবস্থিতি সমীচীন নয়।

আমি দুঃখিত অমিত। তোমরা গল্প কর। আমি আর এক রাউণ্ড কফি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

সমস্ত দেহ-বল্লরীতে একটা হাসির ঝলক তুলে খুশীতে উপচে পড়া মন নিয়ে ইলীনা কফির তদারকে বেরিয়ে যায়।

অমিতাভ বললে: দিলি তো ইলীনাকে তাড়িয়ে।

অমিত বলে: কেন, খারাপটা কি করেছি? বেশী ঘাটালে ধরা পড়ে যেতি। ইলীনাকে সাধারণ মেয়ে ভাবিস্ নে। সত্যি করে বল দেখি একটা অজ্ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পড়ে আছিস কেন?

নিরিবিলি পছন্দ করি বলে।

শুধু নিরিবিলি? আর কোন আকর্ষণ নেই? তা নিরিবিলি জায়গা তো পৃথিবীতে আরও অনেক আছে।

নিরিবিলি জায়গা হয়ত আরও অনেক থাকতে পারে—কিন্তু পিতৃভূমির একটা স্বতন্ত্র আকর্ষণ আছে;

পিতৃভূমি? না মাতৃভূমি?

যা বলিস্ আমার মতে একই কথা। জর্মান কায়দা বলতে পারিস্ ।

দেখ অমিতাভ,—আমি তোকে একটি কথা বলি !

বল্।

পুরুষের চাহিদায় যে এত বৈচিত্র্য তার শেষ নেই। নারীকে তারা কামনা করে নিত্যি নতুন রূপে।

একথা আর বুঝিয়ে তোকে ভাষ্য করবার প্রয়োজন নেই।

যথা।

যেমনি একটি নারী-তোমার করায়ত্ত হলো, অমনি তুমি আর একটি নারীর সন্ধানে তোমার মন প্রাণ নিয়োজিত করলে—এমনি স্বভাব পুরুষের। কিন্তু মেয়েরা পুরুষের মত অত অসিলেটিং নয়। তারা যদি সুন্দর বর ও ঘর পায়, তবে তারা একনিষ্ঠ-হয়। পুরুষের মত এত চঞ্চল নয়।

তুই দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। তুই লিখিস্ বলে ভাবিস্ মানবচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান তোরই একেচেটে। আর কেউ কিছু জানে না। তোর এ-ধারণা জন্মালো কি করে? সবাই কি কলম ধরে রে—কলম ধরে না। কিন্তু তোদের কলমের লেখা পড়ে শুধু হাসে—কিছু বলে না।

একেবারে ব্যক্তিগত আক্রমণ সুরু করলে যে। মনে হয় আমার ওপরে খুবই ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে আছিস। এ-যেন অতিমামস জগতের কাতর-গোঙানি। স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী। বল-ডানসের কথা তিনি না জানতে পারেন; কিন্তু তোরা সবাই জানতিস।

ওসব পুরাণো দিনের পুরাণো কথা থাক্ অমিতাভ—আমি চুপ করছি, আর ব্যস্ত হস্ নি।

কথা যখন উঠলই তখন শেষ করা উচিত।

আর উচিত অনুচিতে প্রয়োজন নেই ভাই। ওই যে ইলীনা আসছে।

তিন কাপ কফি নিয়ে তিনজনে পরমানন্দে পুনরায় আলোচনায় বসে যায়।

আনন্দ কর, আনন্দ কর—ইট্, ড্রিংক এণ্ড বি মেরি।—বললে ইলীনা।

অমিত বলে: মানুষের জীবনে সাফল্য না আসতে পারে—কিন্তু আদর্শ যদি মহৎ হয়, তবেই সে মানুষ পূজা পায়—উদাহরণ ইতালীর ম্যাৎসিনা। যদি ধর গান্ধীজির জীবিতবস্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না আসতো—তাই বলে কি গান্ধীজি তাঁর উদ্দেশ্য ও কৃতকর্মের জন্য সর্বত্র শ্রদ্ধা পেতেন না? পেতেন।

কি বলতে চাইছ অমিত, স্পষ্ট করে বল?

বলছিলুম এই যে পার্ক ষ্ট্রীটের ললিতকলামন্দিরমের ইনফ্লুয়েনসিয়াল ডিরেক্টার শ্রীঅমিতাভ তাঁদের কাজে সফল হতে পারলেন না, তাতে কি এসে যায়? ওঁদের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল সে-বিষয়ে ত কেন ভুল নেই। কাজই—ফলের দিকে না তাকিয়ে ওঁদের উদ্দেশ্যকে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পারি।

শ্রদ্ধা জানাতে না করছে কে

না না কেউ করেনি; তবে শ্রীঅমিতাভ বিফল মনোরথ হবে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে আবার একটা নতুন একসপেরিমেন্ট নিয়ে মেতে উঠবে—এটা ভাল লাগে না। আমাদের উদ্দেশ্যে কনটুনিয়াটি না থাকলে আমরা আর সাফল্যের আশা করতে পারি না।

সে কথা আমি মানি অমিত। তবে দলীয় খণ্ড খণ্ড মতবাদ আমাদের মহৎ কাজের প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় এইটেই দুঃখের। কোন গঠনমূলক কাজ এত পদে পদে বাধা পেলে কাজ এগুতে পারে না। দলীয় স্বার্থবোধের জন্মদাতা যদি গণতন্ত্র হয় তবে তা বড় দুঃখের।

একবার ব্রিটনের গণতন্ত্রের দিকে তাকাও—তাঁদের নিষ্ঠার তুলনা নেই। দেশে যখন বিপদ ঘনিয়ে আসে তখন তাঁরা সব দল এক হয়ে যায়। সকলের সমবেত প্রচেষ্টা হয় দেশকে রক্ষা করা। দেশের মঙ্গলের কাছে দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ বৃহত্তর মঙ্গলের মধ্যে অবগাহন করে আত্মশুদ্ধির মন্ত্রে দীক্ষা পায়। কারো কোন অভিযোগ নেই। এমনি সুন্দর ডিসিপ্লিন সেখানে।

কিন্তু আবার তাকিয়ে দেখ ফরাসী শহর প্যারীনগরীর দিকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে গরীয়ান, একদা ফ্যাশনের রাজা প্যারিস—মন্ত্রীসভার রদবদলে শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানকেও হার মানায়। সেখানে গণতন্ত্রের এমন ভয়াবহ রূপ কেন?

ব্রিটনের ডিসিপ্লিন—আদর্শ ডিসিপ্লিন—বললে অমিতাভ। তুলনাহীন। দেশের বিপদের দিনে তাঁরা সবকিছু বৈষম্য ভুলে গিয়ে হাতে হাত মিলায়। আদর্শ দেশাত্মবোধ। সকল দেশেরই এর থেকে শিক্ষা পাওয়া উচিত।

ইলীনা বলে: দুঃখ করো না। ভারতবর্ষ ইংরেজ সরকারের অধীনে দুশো

বছরের রাজত্বে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুটা ডিসিপ্লিনের অংশীদার হতে পারবে দেখে নিও।

অমিত বলে: ভারতবাসী অনুকরণ প্রিয় জাতি, অনুকরণ করতে ওস্তাদ। তবে ভালটুকু অনুকরণ করবে কিনা জানি না।

অমিতাভ: ভালর সঙ্গে থাকতে গেলে মন্দ মানুষকেও একটু ভাল হয়ে থাকতে হয়।—কথাটি বলে একটু ইলীনার দিকে কটাক্ষ করে।

ইলীনা অমিতকে উদ্দেশ করে বলে: দেখছ অমিত—অমিতাভ আমাকে ঠাট্টা করছে। ভালর সঙ্গে থাকতে গেলে মন্দ মানুষকেও ভাল হয়ে থাকতে হয়। না হয় আমরা মন্দই আছি। তাই বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা।

চটছ কেন? একটু তো কটাক্ষ আছেই।—বললে অমিতাভ।

অমিত বলে: আবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। তুচ্ছ মান-অভিমানের প্রশ্ন। প্রেমিক প্রেমিকার কাছে বসে দুদণ্ড কথা কওয়াই মুস্কিল। তাহলে আমি উঠি।

ইলীনা বলে: আমি পুনরায় দুঃখিত। ক্ষমা করো।

অমিত: ক্ষমার প্রশ্ন নয় ইলীনা। দোষ আমারই। আমি তৃতীয় পক্ষ তোমাদের আসর জুড়ে বসে থাকলে তোমাদেরই বা ভাল লাগবে কেন? এবারে আমার প্রস্থান করা উচিত।

না, না অমিত—লক্ষ্মীটি এমন করো না। মনে কর দেখি আমাদের সেই সব সান্ধ্য আসরের কথা: ব্যারিষ্টার তরুণ সিংহ, অধ্যাপক নীরেন লাহিড়ী, এফ্, আর, সি, এস্ ডাক্তার অন্নদা মুখার্জি সবাই মিলে কেমন আসর জমিয়ে তুলতেন। ওরা অনেকেই আজ এখানে নেই। তাছাড়া বাবার অসুখ। ওসব আলোচনায় সত্যি সত্যি অনেককিছু আনন্দ ছিল। আজকালকার দিনগুলি কি রকম যেন 'ডাল ফিল' করি।

অমিত বলে: তুমি তো বাপু আলোচনায় খুব কমই অংশ গ্রহণ করতে।

ইলীনা: তা করতুম বটে; কিন্তু আমি শুনতুম। আর বিশেষ করে ওই আবহাওয়াটাকে আমি ভালবাসতুম। শুনেছ বোধহয় তরুণ ও ডাক্তার মুখার্জি বিদেশী মহিলা বিয়ে করেছেন।

অমিতাভ লাফিয়ে উঠে বলে: কোথায় আমি তো শুনিনি?

ইলীনা : দেশের যাঁরা কৃতী সন্তান তাঁরা যদি এমন করে বাইরের মেয়েদের বিয়ে করেন তাহলে দেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ আশা রইল কি ?

অমিতাভ বলে : হায়রে হৃদয় তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু
পথ প্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

অমিত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে বলে : 'মঙ্গলশঙ্খ, সন্ধ্যার দীপালোক, প্রেয়সীর অশ্রুচোখ,—আমাদের জন্য নয় বন্ধু।

ইলীনা বলে : অমিত, তোমার এটা বাড়াবাড়ি। আজকালকার ছেলেদের নিজেকে আণ্ডার এস্‌টিমেট্‌ করা একটা ফ্যাশন্‌। তুমি ইচ্ছে করলেই অনেক ভাল মেয়ে পেতে পার। 'প্রেয়সীর অশ্রুচোখে'র জন্য তোমার ভাবনা! দেশ-বিদেশের মেয়েরা তোমার প্রেয়সী হবার জন্য লালায়িত। এক কথায় পুরুষ-সমাজে তুমি একটি দুর্লভ রত্ন বিশেষ। তোমার রুচি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, তোমার দায়িত্ববোধ অতুলনীয়—সে আমি জানি। একটি নারী উচ্ছল চঞ্চলতা পছন্দ করলেও তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় চায় পূর্ণ দায়িত্বশীল ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সহচর।

অমিতাভ বলে : শোন অমিত। মেয়েদের নিজের মুখ থেকেই তোমার কমপ্লিমেণ্টস্‌ শুনে আমার হিংসে হচ্ছে। মনে হয় আমি যদি অমিত হতুম তবে কি মজাই না হতো ?

অমিত বলে : তাহলে অমিতাভ এসো, অবস্থাটা পালটা পালটি করে নি।

ইলীনা বলে : একের সঙ্গে অপরের অবস্থার যদি পালটা পালটি করা চলতো তবে বোধহয় পৃথিবীতে দুঃখ বলে কোন জিনিস থাকতো না। রূপহীনা রূপের সঙ্গে রূপ বদল করতো। অর্থহীন অর্থবানের সঙ্গে ভাগ্য বদল করে মজা লুটতো। এক্সচেঞ্জের যদি এই রকমের ব্যবস্থা থাকতো তবে পশ্চিমী শক্তি-জোটের মত সকল স্তরের লোকের ওপর ঠাণ্ডা লড়াই আর চলতো না।

অমিতাভ বলে : ঠিকই বলেছ ইলীনা। রাস্তায় একটি সুন্দর মানুষ দেখে —ইচ্ছে হলো সুন্দর মানুষ হতে, সুন্দর হয়ে গেলাম। কি মজাই না হতো তাহলে ? কিন্তু আমার কুৎসিৎ রূপ তো আর বদলাবার নয়। আমি যতদিন

বাঁচবো আমার বাইরের খাঁচায় এই কুৎসিৎ অবয়ব নিত্য আত্মার সঙ্গে সঙ্গে চলবে—একে আর কোন ক্রমেই পালটানো চলবে না।

অমিত বলে : চলে যাও তোমাদের রামায়ণ মহাভারতের যুগে—অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারবে। আমার কি মনে হয় জান : এই যে 'এক্সচেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড'—স্বর্ণমান? রৌপ্যমান? এসব কিছু থাকবে না। আবাহমান-কালের জন্য যা থাকবে তা হচ্ছে—'বারটার সিসটেম' (বিনিময় প্রথা, জিনিস দিয়ে জিনিস নেওয়া)।

অমিতাভ বলে : ওসব অর্থনীতির কথা আর টেনে আনিস্ নে। মন দিয়ে মন নেওয়া যায় কি না—হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাওয়া যায় কি না—রূপ দিয়ে রূপ পাওয়া যায় কিনা সেটাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। কারণ আমাদের শিল্প হৃদয় নির্ভর।

অমিত বলে : তাহলে তোরা আকাশের চাঁদ, দখিনা পবন, উত্তর মেঘ—এসব নিয়েই বসে থাক্। মানুষের জীবনের বাস্তব দিকটা আর অনুধাবন করবার চেষ্টা করিস্ নে। মানুষের জীবনে আসল সমস্যা কোথায় এবং কি করে তার প্রতিকার করা চলে সে-বিষয়ে আর ভাববার কিছু নেই।

অমিতাভ বলে : তাহলে তুই আমাকে প্রচারমূলক সাহিত্য সৃষ্টি করতে বলছিস্।

অমিত বলে : তোর আর্টের কাজে কি লাগবে, তা আমি জানি নে! শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি, না আর্টের খাতিরে আর্ট? তবে এটুকু বুঝি শুধু কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা করলে চলবে না। যে কাব্যের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ নেই আজকের দিনে তা অচল। বহুবিধ সমস্যা আজ মানুষের জীবনে।

ইলীনা বলে : তোমরা তা হলে গল্প কর। আমি বাবাকে একটু দেখে আসি।

অমিত বলে : তুমি বাবাকে দেখতে যাও, কিন্তু আমিও এবারে উঠি। আজ তিন দিন যাবৎ বাড়ী যাই নি। সুতরাং আর বিলম্ব করা চলে না।

ইলীনা বলে : তাহলে সন্ধ্যের দিকে আসচো তো?

অমিত বলে : চেষ্টা করবো। তবে গ্যারান্টি দিতে পারছি নে। কম্পানি দুজনেই হয়। তিনজনে বাড়ে শুধু জনতা।

মুচকি হেসে অমিত চলে যায়।

ইলীনা যায় বাবাকে দেখতে।

অমিতাভ চুপ করে বসে আকাশ-পাতাল ভাবে।

ইলীনা নিষেধ করবার পর তাঁর সর্বপ্রথম অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি পোর্টফোলিও থেকে নিয়ে খুলে বসে। উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই বাজারে সে খান কয়েক ছেড়েছে। কিন্তু সেই উপন্যাসটি যা লিখতে গিয়ে ইলীনার কাছ থেকে অম্লমধুর বিদ্রূপ আর কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল তা আর আজও শেষ করা হয় নি। প্রথম প্রিয়ার প্রথম অনুরোধ তাকে যেন উপেক্ষা করা চলে না। তাকে মর্যাদা দিতেই হবে।

ইলীনা বলেছিল : চল্লিশ না পেরুলে উপন্যাসে হাত দিও না।

অমিতাভ বলেছিল : চল্লিশে ভাবাবেগ সব শুকিয়ে যায়। তখন আর উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হবে না।

স্মৃতি রোমন্থন করে অমিতাভ সুদূরে ভেসে চলে। এই যে রাশি রাশি কথাসাহিত্যর জন্ম আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই, তার মধ্যে ক'খানা বই দেশ ও সমাজের পক্ষে শুভ ও কল্যাণকর তা' আমাদের আজকের শিল্পী ও পাঠক উভয়েরই ভাববার সময় এসেছে। শিল্পীকে জীবন নিয়ে পরীক্ষা করতে হয়। জীবন বিশ্লেষনেই তাঁর সার্থকতা। জীবনদর্শন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবন পরীক্ষার নামে শিল্পী যে অদ্ভুত বীভৎস রস, অশ্লীল পরিবেশের ছবি এবং রিয়ালিষ্টিক আর্টের নামে যে নগ্নতা চরিত্র ও দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তা' দেখে সমস্ত শরীর মন বিষিয়ে ওঠে। প্রথমত দেশের ও দশের মঙ্গল কি করে আসবে তা ভাবতে হবে। বিশ্বপ্রেম কিছুটা পরে। কারণ 'চ্যারিটি বিগিনস্ এ্যাট হোম' ;

ইলীনার কথা মানতে গেলে, লেখা রেখে বর্তমানে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। কিন্তু তা কি কোন জাত শিল্পীর পক্ষে সম্ভব? ছাপার হরফে না-ই বা ছাপা হলো কিন্তু প্রকাশ তো তাকে করতেই হবে। শিল্পীর শুধু উপলব্ধিতেই চলে না। এক হতে পারে কোন কিছু সুসংবদ্ধভাবে লিখতে না চেষ্টা করে রোজকার ডায়েরীতে দৈনন্দিন প্রতিটি কথাটুকে রাখা—নচেৎ চল্লিশ বছর পরে সবকিছু হারিয়ে যাবে। শুধু স্মৃতি রোমন্থনে আর তখন কুলোবে না। কল্পিত ও বীভৎস রসের পরিবর্তে একটু বাস্তবধর্মী হতে হবে। আদর্শ হিসেবে কল্যাণ

ও মঙ্গলকে সামনে রাখতে হবে। আমাদের একটা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করতে হবে। আমরা উন্নাসিকও হব না আবার নেতিয়ে পড়া হাবাগঙ্গারামও হব না। একটা সামঞ্জস্য রেখে পথ চলতে হবে। কারণ শিল্পীর দায়িত্ব বড় সহজ নয়। মানব চরিত্রের বিচিত্র অনুভূতির কথা কল্যাণরসের জারকে পরিশোধন করে সাহিত্যের মাধ্যমে রূপ দিতে হবে। অনেক শিল্পী ভাবেন: চরিত্র তো একটা ইঙ্গিত। শুধু ওই টুকু মনে রাখো কেন? ওই ইঙ্গিতের অন্তরালে যে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা আছে তার সন্ধান রাখ কি? চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে বা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আমি শুধু কতগুলি মানব চরিত্রের বিচিত্র রহস্যের আশ্রয় নিয়েছি। তুমি দৃষ্টিভঙ্গী আরও প্রসারিত কর। সংকীর্ণতা পরিহার কর। দেখবে: শিল্পীর জীবনের প্রতি যে বৃহত্তর আবেদন তা' তোমার হৃদয়ে স্বর তুলবে, ধ্বনি দেবে। জীবনকে কেন্দ্র করেই শিল্পীর পথ চলা। শুধু অনুরোধ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হও। নামের মোহে চমক লাগাবার জন্য অদ্ভুত কিছুর আশ্রয় নিও না।

যে সাহিত্য পাঠে শুধু উগ্র শিরা-উপশিরার কম্পন জন্মায়, সে সাহিত্য আমাদের সযত্নে পরিহার করা উচিত। তাই বলে সাহিত্য যে শুধু আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন বা নীতি উপদেশপূর্ণ হবে তা-ও নয়। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চলবে না। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে হবে।

প্রথমতঃ আমাদের ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন। যথার্থ শিক্ষা ব্যতীত আমাদের জীবনপথে হাজারো প্রতিবন্ধক। যে দুর্নীতি ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই তা থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষাই আমাদের একমাত্র পথ। অপরে মন্দ সুতরাং আমারই বা ভাল হয়ে লাভ কি। এটা কাজের কথা নয়। অপরে মন্দ ঠিকই কিন্তু আমি ভাল হব, সৎ হব, মহৎ হব। এই মনোভাব যখন শিক্ষার ভেতর দিয়ে জীবনে অনুপ্রাণিত হবে তখনই শিক্ষার প্রকৃত অর্থ আমাদের জীবনে অনুভূত হবে। তিনি ঘুষ নেন, কাজেই আমি নেবো না কেন? তিনি অশ্লীল লিখে নাম কিনেছেন, সুতরাং আমিই বা লিখব না কেন? জীবনের প্রতি সেই গুড সেনস্ ডেভালপ্ করতে না পারলে জাতির কল্যাণ নেই। লেখক শুধু প্রশ্নই করে যাবেন, উত্তর দেবেন না, সমাধানের ভার নেবেন না—তা-ও তো ঠিক নয়। আধুনিক পাঠক বোকা নন। আজকের দিনে তাঁরা খুবই সচেতন

সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও শিল্পীর মুখ থেকে যদি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সমাধানেরও একটা ইঙ্গিত পান তবে বুদ্ধিমান পাঠক তার নিজের বিচার বুদ্ধির সঙ্গে লেখকের বিদগ্ধ মতামত যাচাই করে নিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হবার সুযোগ পায়। কাজেই হাল আমলের আধুনিক সাহিত্যিকদের এ-প্রশ্ন ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। জেমস্ জয়েস. ভার্জিনিয়া উলফ্, বার্ণাড শ, আমাদের শরৎচন্দ্র অনেক প্রশ্ন তুলেছেন—কিন্তু সঠিক সমাধান এঁরা কেউ দেন নি। পাঠককে এইসব সামাজিক ও নৈতিক গলদ দেখিয়ে দেওয়া গেল। এখন পাঠক তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নেবেন। শুভ—সেনস্ ডেভালপ্ করে অগ্রসর হওয়া উচিত। কবির ভাষায় আমাদের শপথ হবে ঃ

'বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলংক তিলক।

'মনে দুর্বলতা, মুখে মিথ্যা আর চিন্তায় আবিলতা'—এই নিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন। সাহিত্য যদি মানব জীবনের ছবি হয় তবে শিল্পীর রূপায়ণের ভার হবে আরও গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পীর এই গুরুকর্তব্য সম্পাদন জাতির নিকট কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে। অতএব শিল্পীকে অতি সাবধানে পথ চলতে হবে। উপনিষদের দেশের লোকের এত চঞ্চল হতে নেই। একদা এই ভারতবর্ষেই উচ্চারিত হয়েছিল ঃ 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থু।'

অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসে নতুন আর একটি লাইনও সংযোজন হলো না। দক্ষিণের এলোমেলো হাওয়া চিন্তার সঙ্গে জট পাকিয়ে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে অমিতাভ।

এমন সময় একটি বেয়ারা এসে খবর জানায় সাহেব সেলাম দিয়েছে অর্থাৎ সোমনাথ ডাকছেন।

পাণ্ডুলিপিটি ব্যাগের ভেতর পুরে, যথাস্থানে রেখে, সোমনাথের ঘরে দেখা করতে যায়।

'এয়ার কণ্ডিশনড্' ঘরে সোমনাথ প্রকাণ্ড একটি ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছিলেন। হাতে একটি দৈনিক সংবাদপত্র ছিল। কাজেই ইলীনা আর একটি চেয়ারে বাবার পাশে গা ঘেঁষে বসেছিল।

অমিতাভ প্রবেশ করতেই সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে বলেঃ এসো এসো, অমিতাভ। বসো, এই চেয়ারটিতে বসো।

অমিতাভ স্মিত হাস্যে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

সোমনাথ বলেঃ অমিতাভ—তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। তোমার সঙ্গেই আমার কথা আছে। তুমি তো সবই জান। তবু আবার বলি। বুড়ো হয়েছি, বয়েসও হয়েছে। আর বোধহয় বেশীদিন বাঁচবো না। কারণ যে রোগ ধরেছে তাতে আর কোন চিকিৎসে নেই।

কি যে বলছেন! এতো ঘাবড়াবার কি আছে? অসুখ হয়েছে সেরে যাবে।

না অমিতাভ, আমাকে বলতে দাও। ইলীনার ছেলেবেলায় ইলীনার মা মারা যান। ইলীনাকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষ করেছি। নিজের জীবনে যে দোষ ক্রুটী ঘটে গেছে তার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে আমার বরাবরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ইলীনা পৃথিবীকে তার জীবনের প্রতিকণা দিয়ে সম্ভোগ করুক এইটেই আমার ইচ্ছে। শিক্ষা ও রুচির ক্ষেত্রে ওর জুড়ি মেলা ভার—সেকথা যে সঙ্গে যে মিশেছে সে-ই জানে।

ইলীনা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে অমিতাভের দিকে তাকিয়ে বাবাকে উদ্দেশ করে বলেঃ বাবা, তুমি মিছেমিছি কেন এত বকে চলেছ? তুমি তো এক্ষুণি ক্লান্ত হয়ে পড়বে?

অমিতাভও বলেঃ সত্যিই তো?

সোমনাথ বলেঃ না, না—আমি ক্লান্ত হবো না। সব কথা না বলা পর্যন্ত —আমার বিশ্রাম নেই।

ইলীনা বলেঃ কি আর এমন কথা আছে? কেন তুমি এতো উত্তেজিত হচ্ছ?

সোমনাথ উত্তেজিত হয়েই বলেঃ কেন, আমার উত্তেজনা কোথায় দেখছিস্, বল্? ইলীনা, তুই মেয়ের বাপ হোস্ নি—কাজেই বাপের ব্যথা কোথায় তুই বুঝবি নে।

অমিতাভ পুনরায় অনুরোধ করে বলে : আপনি অযথা এত উত্তেজিত হবেন না।

সোমনাথ এবার হাসিমুখেই বলে : বুঝলে অমিতাভ, মেয়েরা যতই স্বাধীন হোক্—তারা কখনও স্বাধীন হতে পারে না। তাদের অবলম্বন চাই।

অমিতাভ বলে : সেকথা তো একশোবার সত্যি। সংক্ষেপে বলুন, আপনি কি বলতে চান?

প্রসন্নবদনেই সহাস্যে সোমনাথ উত্তর দেয় : তুমি তো সবই জান অমিতাভ। আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই তুমি ইলীনাকে গ্রহণ করেছ। তাহলেই আমার শান্তি।

অমিতাভ বলে : এ-কি কথা বলছেন আপনি? ইলীনাকে গ্রহণ করব কি-না সে-সম্বন্ধে আবার নতুন কোন প্রশ্ন, দ্বিধা বা সংশয় কি করে জন্মলাভ করবে—জানি না। আপনি এসব চিন্তা ছেড়ে দিন।

সোমনাথ : না আমার বর্তমানের চিন্তা তোমার ও ইলীনার দুটি হাত একত্রে মিলিয়ে দেওয়া। অমিতাভ কাছে এসো, ইলীনা কাছে আয়।—এই বলে অমিতাভের হাতের মধ্যে ইলীনার হাত দুটি তুলে দেয়।

অমিতাভ-ইলীনা বহু উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার মত সোমনাথকে প্রণাম করে।

সোমনাথ পূর্বকথার জের ধরে বলে : এবারে আমার ছুটি। তোমরা যাও গল্প কর গে। আমি এবারে একটু বিশ্রাম করি।

অমিতাভ আর ইলীনা হাসতে হাসতে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ইলীনা বলে : কি গো মহাশয়, বড় যে বিয়ে করব না বলে গো ধরেছিলে—কিন্তু এখন?

অমিতাভ বলে : ঠিকই, কিন্তু বিয়েটা কি শৈব মতে হলো, না শাক্ত মতে হলো?

ইলীনা : ক্রুট্। হিন্দু বিয়েটা স্যাক্রামেণ্ট, অন্য ধর্মের বিয়ের মত চুক্তিপত্রের প্রয়োজন হয় না। 'শেষ প্রশ্নে'র উদ্ধৃতি করতে লজ্জা করে না।

অমিতাভ বলে : তাহলে কবির ভাষায় উপসংহার করি : 'পশু পক্ষীরা প্রকৃতির কারখানা থেকে বেরিয়েছে তৈরী জিনিস। কিন্তু মানুষ কাঁচা মালমসলা। স্বয়ং মানুষের উপর ভার তাকে গড়ে তোলা'।

ইলীনা : তাহলে উপন্যাসের কি এখানেই ইতি করলে ?

অমিতাভ বলে : শেষ করবার সত্যিকারের কোন টেকনিক্ আছে কিনা আমার জানা নেই। যাঁরা বলেন যেখানে শেষ হলো সেখানে কেন শেষ হলো ? এ-প্রশ্নেরও কোন জবাব নেই। লজিক দিয়ে জীবনের অনেক প্রশ্নেরই কোন উত্তর মেলে না। সুতরাং এ-সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভাল।

ইলীনা অমিতাভের হাতে একটু মৃদু চাপ দিয়ে বলে : একটি কথার জাহাজ কিন্তু দেখো সবই যেন ফাঁকা বুলির আওয়াজ না হয় !

অমিতাভ বলে : তথাস্তু। এ-বই আর 'ক্যারি' করে লাভ নেই।

এই লেখকের

বিংশশতাব্দী

তখন ও এখন

একটি ফুল দুটি নায়ক

শিশির সেন লিখিত 'বিংশশতাব্দী' উপন্যাস সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত—

AMRITA BAZAR PATRIKA বলেন :

Mr Sen is ultra-modern in outlook and he is to a baffling extent fertilized by the age he lives in. The story-element serves merely as a peg to hang numerous thoughts of the writer on numerous topics. * * * The inconsequentiality of the plot is the reflection of an age characterized by inconsequentiality. The peculiar ferment of the age is shown to be working in all the characters. They are all groping about moved by an urge, issuing from they know not whence. It is never the intention of the author to charm us by an enthralling story, no, he wants to bring to us new valuations and new illuminations.

This provocative and stimulating volume will please all thinking people.

যুগান্তর বলেন :—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব অতুলনীয়। যে সাহিত্য সমাজ-কল্যাণের সহায়ক হয়, উহা সর্বত্র আদর লাভ করিয়া থাকে। আজিকার দিনে যে সমস্ত অন্তঃসারশূন্য তরল সাহিত্য বাজার ভরিয়া তুলিয়াছে আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহা হইতে স্বতন্ত্র—আপন স্বকীয়তায় সাহিত্যের আসরে মর্যাদার আসন দাবী করিতে পারে। লেখক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্তমান যুগের নরনারীর মনোবিশ্লেষণে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। মনের ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনার সংঘাত লিপি চাতুর্যে অনুপম

হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমাজ ব্যবস্থার যে অংশের প্রতি লেখক পাঠক গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন উহা পাঠকের চিন্তার পরিসর বৃদ্ধি করিবে। সমস্যাচ্ছন্ন সমাজের বহুধা বন্ধন পীড়িত নরনারীর মনের খেলা গল্পের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানিতে লেখকের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি সর্বত্র আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

সুসাহিত্যিক **অন্নদাশঙ্কর রায়** বলেন: আপনার বিংশশতাব্দী পড়ে শেষ করেছি। আপনি গল্প জমাতে জানেন। এটা সম্ভব জাত উপন্যাসিকের পক্ষেই। সুতরাং আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আপনার পাত্র-পাত্রীর প্রতি আপনার sympathy বা দরদ আছে। এটাও একটা দুর্লভ গুণ। তারপর আপনার ideas আছে। সাধারণতঃ ঔপন্যাসিকেরা ওর থেকে বঞ্চিত। আমি ideas থাকা পছন্দ করি। সবচেয়ে বড় কথা জীবনের সঙ্গে আপনার চাক্ষুষ পরিচয় আছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন: বিংশশতাব্দীর···সমস্যা ইহার পটভূমিকা লেখকের ভাষা ঝরঝরে। গল্প বলিবারও শক্তি আছে।····

প্রবাসী বলেন:···বিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণী মনের সাক্ষাৎ লেখক পাইয়াছেন।···

বঙ্গশ্রী বলেন:—শিশিরবাবু প্রধানতঃ মনোবিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ। 'বিংশশতাব্দী'র যে সময়ে প্রকাশ, তখন মহাযুদ্ধের অগ্নি-দাবানল চারিদিকে। কোন একটি মানুষও কোন ক্ষেত্রে স্থির নয়। এই অস্থিরতার মধ্যে দিয়াই মানুষ গড্ডলিকার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ইহার উপরে ভিত্তি করিয়া 'বিংশশতাব্দী' রচিত। লেখকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী কাহিনীকে সার্থক রূপদান করিয়াছে।

ছোটগল্প 'তখন ও এখন' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

The Republic বলেন: It is certainly very clear that the author has had the courage to attempt to X-Ray the deep-seated social rot that is corroding the intelligentsia of this country. What appeals to us most is his burning sincerity and the absence of all artificial attempts to camouflage the emotional confusion that the venture has landed him into.

Literature of a period when the decadent is rapidly fulfilling its destined decay has the rhythm of destruction. Sisir Sen has successfully caught that rhythm and infused in his stories a healthy provocation. Thakhan-O-Ekhon is a volume to be commended to our modern youth.

সত্যযুগ বলেন: এই গ্রন্থে সংকলিত প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি সময়োচিত সমস্যাবলী লইয়া গুরুগম্ভীর আলোচনা করা হইয়াছে। সেই কারণে গল্পগুলি পড়িবার সময় ভীষণ ভাবিত হইয়া উঠিতে হয়, মস্তিস্ক উত্তেজিত হইয়া ওঠে, তর্কের প্রসঙ্গে গল্পের খেই পর্যন্ত হারাইয়া যায়। আধুনিক বাংলা গল্পের মধ্যে শিক্ষনীয় কিছু থাকে না বলিয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চন করেন তাঁহাদের আমরা এই বইখানি পড়িয়া দেখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। অবশ্য লেখকের সঙ্গে পাঠকের দ্বিমত ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পাঠকের মুখ চাহিয়া তো আর কোন সৎসাহিত্যিক লেখনী চালনা করিতে পারেন না? লেখক সৎবুদ্ধি প্রণোদিত প্রত্যেকটি গল্পে তার ভূরি প্রমাণ মিলবে।...বিনা দ্বিধায় বইটি ছোট বড় সকলের হাতে তুলিয়া দেওয়া চলে।

বঙ্গশ্রী বলেন: প্রতিটি গল্পই আত্মস্বকীয়তায় উজ্জ্বল।......

যুগান্তর: শ্রান্ত জীবনের গুরুভার হালকা করিয়া লইবার পক্ষে বইখানি উপভোগ্য।...

আনন্দবাজার বলেন: গল্পগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে।...

পরিবেষক বলেন: লেখক বাংলা সাহিত্যে পরিচয় পাবার যোগ্যতা রাখেন।